রবিবাসর

(প্রফুল্লকুমার স্মৃতিগ্রন্থ—১)

—সম্পাদনা—

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., পি-এইচ-ডি
সর্বাধ্যক্ষ : রবিবাসর

সহকারী—শ্রীসন্তোষকুমার দে
সম্পাদক : রবিবাসর

সূচীপত্র

রবিবাসরের গৌরব

স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার

প্রফুল্লকুমার স্মরণে
রবিবাসরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

এই ভঙ্গ বঙ্গদেশে আছে অমলিন
একটি প্রফুল্ল নাম, যা চিরনবীন,
যা চিব প্রশান্তিপ্রদ, যা চিরভাস্বর
শাশ্বত প্রভায দৃপ্ত, যা অবিনশ্বর
ভগবৎ প্রেমে তৃপ্ত। 'আনন্দ বাজার'
অভ্রভেদী উচ্চচূড় মন্দির যাঁহার
কীর্তির স্বুবর্ণচ্ছটা, সাধনার ধন,
'দেশ' আর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, দর্পণ-
সম প্রতিবিম্বে যাহা দেশের হৃদয়,
তাঁহারই অতুল কীর্তি ঘোষে বিশ্বময়।
নির্ভীক, উদাত্তকণ্ঠ, শানিত-লেখনী,
প্রয়োজনে দুর্নিবার,—যেখানে যখনি
বেদনা বেজেছে বুকে শাসনেব নামে
অত্যাচার হতে দেখে, বন্যাসম নামে
তাঁহার প্রবল বাণী, বন্ধন শৃঙ্খলে
ভাসাইয়া নেয়, যেন তৃণসম দলে
পদতলে। আর যবে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর
ভবিষ্যৎ ভাবি তিনি উদ্বেল সিন্ধুর
উদাত্ত আহ্বানে ডাকি বলেন জাতিকে
— সে আরেক রূপ!

সেই দরদী সাথীকে

রবিবাসরের কত ঘরোয়া আসরে
দেখেছি একান্ত ভাবে। এণ্ডির চাদরে
কাঁধ ঢাকা, — ধুতি, সাদা পাঞ্জাবী পরণে
কালো সাধারণ জুতা মণ্ডিত চরণে,
ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখে স্নিগ্ধ হাসি,
পরিচিত মূর্তিখানি। বসেছেন আসি
সকলের সনে একাসনে, হৃষ্ট চিতে।
বিনয়ের প্রতিমূর্তি। হাসিতে হাসিতে
বলেছেন কত কথা।

বর্মন ষ্ট্রীটের
সম্পাদকীয় দপ্তরে, পাই নাই টের
বজ্রসম দৃঢ় যিনি কুসুমকোমল
কেমন করে যে হন, সেই কৌতূহল
মোহনলাল ষ্ট্রীটে তাঁর আবাসেও গিয়ে
নানা আলোচনা তুলে এসেছি মিটিয়ে!
যে অন্তর নিরন্তর গৌরাঙ্গলীলায়
ভগবৎ প্রেমে ভরপুর, তা বিলায়
বৈষ্ণব সাধনসাধ্য মাধুরী সুবাস,
তাই তাঁর অমলিন আনন্দ-আভাস
শ্রান্ত মনে শান্তি দিত, দিত আশীর্বাদ
অমেয় মাধুর্য ভরা অমৃত প্রসাদ।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন আসে বারে বারে,
দিনান্তের ক্লান্ত রবি ডুবে অন্ধকারে।
বর্ষ বিদায়ের সেই বিষণ্ণ বেলায়
আমাদের মন পুনঃ করে হায় হায়।

এমন দিনেই তাঁর হল তিরোধান
সাধক সাধনা শেষে করেন প্রয়াণ
সাধনা-উচিত ধামে, সেথা দিব্য লোকে
মিলেছে বৈষ্ণব সঙ্গ গভীর পুলকে।

সত্যই সার্থকনামা প্রফুল্লকুমার,
স্মরণেও স্পর্শ পাই তোমার ভূমার।
তুমি নাই মরদেহে, তবু আছ মনে,
অগণিত মানুষের সশ্রদ্ধ স্মরণে।
হে বৈষ্ণব-চূড়ামণি। সাহিত্য সাধক
সাংবাদিক কুলশ্রেষ্ঠ, পবিত্র পাবক
প্রজ্বলিত রেখে গেছ, — 'আনন্দ বাজার',
নিরানন্দ এ জাতির প্রেরণা সোচ্চার।

তোমারে প্রণাম করি শ্রদ্ধানত চিতে,
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি পবিত্র বেদিতে।

—শ্রীসন্তোষকুমার দে

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে কবি শ্রীনরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩৭৪ সালের প্রফুল্লকুমার-স্মরণ সভায় পঠিত।
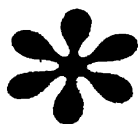
নিবেদন

ঈশ্বরের অপার করুণায় 'রবিবাসর' চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করতে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা সকল পূর্বসূরীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

রবিবাসরে পঠিত বিবিধ রচনা নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, লেখকদের নিজ নিজ গ্রন্থেও স্থান পায়। কিন্তু রবিবাসরের নিজস্ব কোন সংকলন গ্রন্থ ছিলনা। আমাদের পরম উৎসাহী বন্ধু, সাংবাদিক এবং সম্পাদক-শ্রেষ্ঠ স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের ইচ্ছা ছিল রবিবাসরের একটি সংকলন নিয়মিত প্রকাশ করা। কিন্তু নানা অসুবিধায় এত কাল তা করা সম্ভব হয়নি। চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে প্রকাশিত এই প্রথম সংকলন গ্রন্থখানি আমরা তাই প্রফুল্লকুমারের পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গ করছি। সুখের বিষয়, তাঁর সুযোগ্য পুত্র, আনন্দবাজার পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক শ্রীমান অশোককুমার-ও রবিবাসরে আছেন। তাঁর হাতে এই গ্রন্থখানি তুলে দিতে পেরে আমরা গভীর তৃপ্তি অনুভব করছি।

মোট পঞ্চাশটি রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। সবই রবিবাসরে পঠিত বা গীত। রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংকেত-লিপিতে লিখে কবিগুরুকে দেখিয়ে নিয়েছিলেন। সন্তোষকুমার দে লিখিত 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থ হতে এই মূল্যবান রচনাটি তুলে দেওয়া হল।

পাঠকদের ভালো লাগলে অনুরূপ সংকলন গ্রন্থ ভবিষ্যতেও প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।

৩১ সৃদার্ন এভেনিউ
কলিকাতা-২৯
১ জানুয়ারি, ১৯৬৯

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সর্বাধ্যক্ষ : রবিবাসর

পরিব্রাজক জলধর দাদা

(যতীন্দ্র কুমার সেন-অঙ্কিত রঙিন ব্যঙ্গ চিত্র অনুসরণে)

আমাদের রবিবাসর

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সর্বাধ্যক্ষ—'রবিবাসর'

রবিবাসর নামটির মধ্যেই একটি প্রশস্ত অবসরের স্নিগ্ধ গুঞ্জন, একটি আরাম ও মুক্তির উদার ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। স্বতঃই মনে হয়, যেন এই মিলন কেন্দ্রটি আমাদের মনকে আধুনিক যুগের উত্তপ্ত পরিবেশ থেকে নিয়ে গিয়ে উহার প্রতি একটি নিভৃত আশ্রয়ের আমন্ত্রণ প্রসারিত করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের বৈঠকী মজলিসটি যেন অতীত এবং অধুনা অপ্রাপ্য ফরাস বিছানা ও বালিসের এলায়িত আলিঙ্গনকে আমাদের দেহমনের তৃপ্তির জন্য বিছিয়ে রেখেছে। হয়ত বাসরের মদির নিবিড়তা এর মধ্যে নাই, কিন্তু আসরের নিশ্চিন্ততা বহু পরিমাণেই আছে। দাম্পত্য প্রণয়ের তপ্ত ইক্ষুচর্বণের পরিবর্তে আছে সৌহার্দ্যের অনাবিল প্রীতি, দারুণ গ্রীষ্মে ডাবের জলের সুশীতল আতিথেয়তা। পিরীতি সাগরের দুঃখবায়ু-বীজিত, অস্বস্তি-কণ্টকিত জোয়ার-ভাটার বদলে আছে সমপ্রাণতার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। বাসর কক্ষের চারিদিকে যে একটি আনন্দিত পরিবার পরিবেশের বিস্তীর্ণ বহিরঙ্গন প্রসারিত থাকে, দাম্পত্যমিলনের কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত যে একটি উল্লাসবৃত্ত নিজ পরিধির সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিল্লোলকে একটি বিন্দুতে সংহত করে, আমাদের রবিবাসর সেই মিলনমুখর মহাসঙ্গমের একটি শাখানদী। যেখানে পরম দ্বৈতের অদ্বৈতভাব সিদ্ধরসরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে যে বহু হ'তে একের দ্বিত্বের মাধ্যমে পরিণতি রবিবাসর সেই লীলাপরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সে বাসর না হলেও বাসরের পুষ্পসুরভিত হাওয়ায় অভিস্নাত।

এই বাঁধনছেঁড়া, মোহটুটান আত্মকেন্দ্রিকতার যুগে পরিবার হতে আরম্ভ করে কোন বৃহত্তর সংস্থার প্রতি একান্ত মমত্ববোধ দুর্লভ হয়ে পড়েছে। মোহমুদ্গরের সেই বহু উদ্ধৃত বাণী 'কা তে কান্তা কুন্তে

পুত্রঃ' এই বৈরাগ্যবিমুখ, ভোগমত্ত যুগেও মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। আমরা দার্শনিক না হয়েও, শঙ্করাচার্যের সংসার বিরাগের দীক্ষা গ্রহণ না করেও, শুধু অধিকারস্পৃহার আতিশয্যেই বৈরাগ্যপন্থী হয়েছি। সব ভোগবস্তু নিজের করতে গিয়ে সবই হারাতে বসেছি। আজ পরিবার থেকে রাজনীতি, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী থেকে সাহিত্যিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সমস্ত প্রতিষ্ঠানই আমাদের মিলন-প্রয়াসকে বিড়ম্বিত করে অণু-পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হতে চলেছে। কাউকে আর নিজের মনে করতে পারছি না, অন্তরের কোন প্রীতি-সম্পদ আর কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে স্বস্তি পাচ্ছিনা। আমরা যেন অন্তরে বাহিরে এক বিরাট বিপর্যয়ের ঘূর্নিচক্রে আবর্তিত হচ্ছি, কোথাও কোন স্থির আশ্রয় মিলছে না। সর্বত্রই একটা নিরবচ্ছিন্ন বিশ্লেষক্রিয়া আমাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। এই বৌদ্ধ শূন্য-বাদের নিরঙ্কুশ প্রাদুর্ভাবের যুগে 'রবিবাসর'-ই একমাত্র আশ্চর্য ব্যতিক্রম, এই ঘূর্ণ্যমান মানস জগতের একমাত্র স্থির বিন্দুরূপে প্রতীয়মান। এখানে আমাদের হৃদয় এক অবিচল আশ্রয় পেয়েছে। এর প্রতি আমাদের নিষ্ঠা ও প্রীতি একান্তভাবে সমর্পিত হয়েও বিশ্বাসভঙ্গের নিদারুণ আঘাত, অপাত্রন্যস্ত প্রণয়ের মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করেনি। এখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ, পারিবারিক মনোমালিন্য, সামাজিক মতান্তর, রাজনৈতিক দল ছাড়াছাড়ি কোন ক্ষতচিহ্ন রেখে যায় নি। এখানে মৃত্যুই সম্পর্কচ্ছেদের একমাত্র কারণ। এখানে কোন দল নাই, কোন জোটবদ্ধ প্রতিযোগিতা নাই, কোন ঈর্ষ্যাদ্বেষবিরোধের বিষনিঃশ্বাস নাই, কোন শ্রেষ্ঠত্ব-হীনত্বের গোপন দ্বন্দ্ব মনের তলায় সুড়ঙ্গ খনন করে না। মনে হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অতীত এ কোন্ দিব্য রাজ্যে আমরা হঠাৎ এসে পড়েছি। এখানে যেন উনিশ শতকের গাঢ়, অবিমিশ্র সাহিত্যরস-সাধনা, তার সমস্ত একনিষ্ঠ, চিত্তবিক্ষেপ-হীন মুগ্ধতা নিয়ে, আধুনিক যুগের উচ্চকিত উত্তেজনা ও উচ্চকণ্ঠ অপ্রাসঙ্গিকতার উর্ধ্বে থেকে স্থির প্রশান্তিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে একটা সত্য জ্বলন্তভাবে আমাদের চোখে পড়ে। এর একমাত্র হেতু হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের অনুচিত প্রাধান্য, এমনকি একাধিপত্য। রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা না গেলেও এর প্রয়োগক্ষেত্র সর্বতোভাবে সীমিত রাখা তুল্যরূপে আবশ্যিক। রাজনীতি নিজ স্বভাবক্ষেত্রে আবদ্ধ না থেকে যদি সমাজমনের সর্বত্র, সমাজসম্পর্কের প্রতিটি স্তরে প্রধান শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে সমাজের বিকার ও ধ্বংসোন্মুখতা প্রকট হতে বাধ্য। জীবন সম্পর্কের কয়েকটি পবিত্র পীঠভূমি আছে যেখানে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, অহিতকরও বটে। পরিবারজীবন, আত্মীয় বর্গের স্নেহপরিবেশ, বিদ্যামন্দিরের ছাত্র-শিক্ষকের প্রীতিমধুর ভাববিনিময়ের ব্যাপার, সাহিত্য-সাধনার উদার উদ্যোগভূমি রাজনীতির অধিকার সীমাবহির্ভূত। এই সমস্ত হৃদয়াবেগের স্নিগ্ধ সরস শ্যামশষ্পদেশে রাজনীতির উষর তাপদগ্ধ মরু বালুকার ঝটিকাপ্রবাহ জীবনের উৎসমূলে যে রসনির্ঝর তাকে শুকিয়ে দেয। রাজনীতির প্রতিষ্ঠাই হল দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ প্রতিযোগিতার উত্তপ্ত আবহাওয়ায়। তার আকাশ-বাতাসে উগ্র মতবিরোধ ও স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার উন্মত্ত রণহুঙ্কার মুখরিত। এখানে স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের উৎকট সংঘাত, পরস্পরবিরোধী দাবীর উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভ, জয়লাভের দুর্জয় মৃত্যুপণ সঙ্কল্প, জীবনের অন্যান্য সুকুমার বৃত্তিসমূহকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়েছে। এখানে কেবল 'আমার দাবী মানতে হবে', 'আমার দলকে দেশশাসনের কর্তৃত্ব সমর্পণ করতে হবে' এইরূপ স্পর্ধা-প্রতিস্পর্ধার বাণী সমস্ত কোমলতার হৃদয়াবেগকে উৎসাদিত করে অসপত্ন ঔদ্ধত্যে নিনাদিত। হয়ত দেশ-শাসনের প্রয়োজনকে সর্বাগ্রগণ্য অধিকার দিতে হবে, কিন্তু আন্যান্য জীবন-সাধনাকেও ন্যায্য মর্যাদা না দিলে জীবনের ভারসাম্য ও সুষ্ঠু বিকাশ বিঘ্নিত হবে। পারিবারিক জীবনের স্নেহমধুর সম্পর্কবৃত্তে অধিকার ও কর্তব্যের প্রশ্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিচার্য নয়, রাজনৈতিক

আচরণবিধি এখানে প্রযোজ্য নয়। যেখানে স্নেহভক্তির অনিবার্য উৎসাহের সমস্ত সম্পর্ক-ধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হবে, কোন সংবিধানের নির্দেশ সেখানে অবান্তর। ছাত্র-শিক্ষকের প্রীতি-সম্বন্ধে যদি রাজনৈতিক বিধিবিধানের লৌহশাসনকে আবাহন করতে হয়, তবে সে সম্পর্কের উদার মাধুর্য অপচিত হতে বাধ্য ও জীবনও সেই পরিমাণে রিক্ত হবে। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক অধিকার সাম্যকে আমল দিলে যে ঐকান্তিক আত্মনিবেদন ও স্থির প্রত্যয় এই সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ তাকে নির্বাসন দিয়ে সাধনাসূত্রে জট পাকান হবে। সাহিত্য-উপভোগের ব্যাপারেও রাজনীতির অনুশাসন শুধু অপ্রাসঙ্গিক নয়, সাহিত্যচর্চার স্বভাবধর্ম-বিরোধী। সাহিত্যের মিলন ক্ষেত্রে অন্তরের প্রসন্নতা, সৌন্দর্যসাধনার সমপ্রাণতা কূটনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হলেই ওর সুস্থ পরিবেশ কলুষিত হয়। এখানে স্থানলাভের জন্য যদি ভোটযুদ্ধের প্যাঁচ কসাকসির শরণাপন্ন হতে হয়, যদি পদাধিকারের জন্য শক্তিপরীক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়, তবে সারস্বত কুঞ্জের চিরবসন্ত প্রতিযোগিতার প্রখর গ্রীষ্মতাপে শুষ্ক জীর্ণ হয়ে পড়ে। বৈষ্ণবের মহাতীর্থ চিরনবীন বৃন্দাবনধামই সাহিত্য রসচর্চার যথার্থ প্রতীক্। আত্মাভিমানমত্ত, অহঙ্কারস্ফীত কোন কংসদূতের এখানে প্রবেশাধিকার নাই। ছদ্মবেশিনী বিষকন্যা পূতনাও এই মন্ত্রপূত প্রেমরাজ্যে অমৃতস্রাবিনী মাতৃস্তন্যবাহিনী জীবধাত্রীতে রূপান্তরিত হয়। সাহিত্যরসের অমৃতকলস যদি বিপরীত প্রক্রিয়ায় ঈর্ষ্যাবিদ্বেষবাহী বিষকুম্ভে পরিণত হয় তবে সাহিত্যচর্চায় আমূল বিপর্যয় ঘটে তা স্বীকার করতেই হয়।

রাজনীতির ভূতে পাওয়া এই আধুনিক যুগের সমস্ত সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'রবিবাসর' এক অনন্য ব্যতিক্রম। এই সংস্থার পরিচালনায় ও কর্মসূচীতে রাজনীতি-প্রভাবের লেশমাত্র চিহ্ন অনুপস্থিত। এখানে কোন জটিল সংবিধান, কোন প্রশাসনিক বিধি-বিধান, বৎসরান্তে নির্বাচন যুদ্ধের আয়োজন, শক্তিপরীক্ষার ব্যূহরচনা প্রভৃতি রাজনৈতিক জীবনের কোন উপসর্গই ছায়াপাত করে নি।

ইহার মধ্যে কোন দলিল-দস্তাবেজ, কোন লিখিত অনুশাসন, কোন বিধি-নিষেধের অবশ্যপালনীয় নির্দেশ, কোন কর্মসূচী গ্রন্থন, কোন নির্দিষ্ট কর্মধারার বাধ্যতামূলক অনুসরণ সাহিত্য রসউপভোগের পথে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করেনি। এই প্রতিষ্ঠানের অধিদেবতার চরণ কমলকে কোন নিয়মশৃঙ্খলার নিগড়ে আবদ্ধ করা হয়নি। মনের স্বভাব প্রসন্নতা, সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা, আনন্দ পরিবেশনের সহজ প্রবণতা, মিলনের অনিবার্য আবেগ এর প্রাণশক্তির একমাত্র উৎস। এখানে একজন সভাপতি ও সম্পাদক মাত্র বর্তমান। কিন্তু তাঁদের কারুর উপর আফিস চালানোর দায়িত্ব নাই। অবশ্য সম্পাদক এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র, কিন্তু তিনি কাজ করেন নিজ অন্তরের উৎসাহে, নিজ সেবামনোভাবের উচ্ছ্বাসে, নিজ সাহিত্যপ্রীতির অনুপ্রেরণায়, কারুর নির্দেশে নয়। কোনও অফিসী কায়দার জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে নয়। একখানা করে মিটিং-এর নোটিশ দেওয়াতেই তাঁর বাঁধা ধরা কর্তব্য নিঃশেষিত। তাঁর আসল কাজ হল নেপথ্যের অন্তরালে সদস্যদের অধিবেশন আমন্ত্রণে রাজি করানতে। যেমন প্রদীপ জ্বালানোর অন্তরালে সল্‌তে পাকানোর ইতিহাস অনুল্লিখিত থাকে, যেমন সুগৃহিনীর উপাদেয় ভোজ্য পরিবেশনের পরিচ্ছন্নতার পিছনে রান্নাঘরের আয়োজনব্যস্ততা ও উপকরণ সংগ্রহের কাহিনী অলিখিত থাকে, তেমনি আমাদের সম্পাদকের সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থার পূর্ববর্তী স্তরে যে কর্মপটুতার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে, তার সম্বন্ধে আমরা ফলপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অজ্ঞই থেকে যাই। এমন একটি সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান নিজ কর্মকুশলতার সূত্রগুলি আড়ালে রেখেই নিজ পরিপূর্ণতার পরোক্ষ পরিচয় দেয়। আর সভাপতি সব সময় অনুভব করেন যে যে-প্রীতিপদ্মের উপর তাঁর কোমল আসনটি বিছান, তা পঞ্চাশটি সদস্যের হৃদয় কোরকনিঃসৃত, কেন্দ্রাভিমুখী পাপড়িগুচ্ছের উপর দৃঢ়বিধৃত। তিনি যেন রবিবাসরের সমস্ত সদস্যের সাহিত্যরসউপভোগের একান্ত আকৃতির মিলিত প্রতীক—সকলের আনন্দরসের যৌথ আধারই তাঁর পরিচয়, তাঁর নিজের কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক পরিচয় গৌণ বা

উপেক্ষনীয়। রবিবাসরের প্রতিটি সদস্যই নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করতে পারেন – "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"। গণতন্ত্রের কোন সর্ত পালন না করে গণতান্ত্রিক অধিকার সাম্যের চূড়ান্ত ফলভোগী হওয়া, গাছে চড়ার ক্লেশ স্বীকার না করে তার উচ্চতম শাখায় সঞ্চিত মধুরতম রসের আস্বাদন করা রবিবাসরের সদস্যদের এক বিরল সৌভাগ্য।

রবিবাসরের যে-কোন অধিবেশনে উপস্থিত থেকে যিনি সাহিত্য-রসচর্চ্চায় যোগ দিয়েছেন তিনিই এর রসনারুচিকর ভোজ্যদ্রব্যের স্বাদ ও গন্ধে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। এর সদস্যদের মধ্যে হয়ত দিগ্বিজয়ী সাহিত্যরথীর সংখ্যাধিক্য নাই। কিন্তু এঁরা যে সকলেই সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যের যথার্থ সমজদার ও এঁরা সমবেত হয়ে যে একটি বিশুদ্ধ প্রীতিস্নিগ্ধ ও আনন্দময় সাহিত্যপরিবেশ রচনা করে থাকেন, এঁদের সাহিত্যিক সমপ্রাণতা ও সহৃদয়তা যে সমস্ত গোষ্ঠীকে এক নিবিড় আত্মীয়তাবন্ধনে যুক্ত করে থাকে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এঁদের অনেকেরই সৃষ্টি মৌলিক সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল; সূক্ষ্ম অনুভূতির ও রসচেতনার পরিচয়বাহী। অনেকেরই লেখায় নব দিগন্তের বাতায়ন ঈষৎ উন্মুক্ত হয়ে নূতন বিস্ময়ের চকিত দর্শন ঘটে, জীবনের অনাস্বাদিত রস হঠাৎ মনকে আবিষ্ট করে তোলে। এঁদের জীবনকে নূতন দৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত করার স্বকীয়তা আছে, প্রায় কারু রচনাতেই কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের অনুকরণ, বা কোন বহু প্রচলিত ভঙ্গীর প্রতিধ্বনি অনুভবগম্য হয় না। সবাই নিজ নিজ মানস সঞ্চয়ের মূলধন নিয়েই কারবার করে থাকেন, ঋণকরা ঐশ্বর্যের চোখ ধাঁধাঁনো জাঁকজমকে অন্তরের রিক্ততাকে ঢাকবার কোন ব্যর্থ প্রয়াস করেন না। এঁদের গদ্যরচনা গুরুগম্ভীর নয়, কৌতুকসরস, মননশীল, কিন্তু অতিভারাক্রান্ত নয়। এঁদের আবেদন মস্তিকের কাছে ততটা নয়, যতটা হৃদয়ের কাছে। কেউ কেউ বা হয়ত আমাদের সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের শ্লেষস্নিগ্ধ, প্রসন্ন-মধুর কান্তা-সম্মিত রসালাপের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে নিয়ে যান। কেউ বা

সপ্তসিন্ধুর নাবিকের মত আমাদের নূতন নূতন ভাবসমুদ্রের উপকূলে পৌঁছে দিয়ে আমাদের মনের প্রসার বাড়িয়ে দেন। রবিবাসরের সদস্যদের কবিকৃতি যেমন স্বাদে বিচিত্র, তেমনি অঙ্গবিন্যাসে নব নব ভঙ্গীতে প্রসাধিত, কিন্তু সকলের মধ্যেই প্রকৃত কাব্যসৌরভ অন্তঃসঞ্চিত থেকে তাঁদের দিব্য প্রেরণার পরিচয় দেয়। এই গদ্য-কবিতা ও বুদ্ধিসর্বস্বতার যুগেও যে কবিদৃষ্টি তার নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে ফেলেনি তার প্রমাণ এই সঙ্কলনে সংগৃহীত কবিতাগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিলবে। এই ক্যানাল কাটার যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও অর্জুনহস্তনিক্ষিপ্ত যে অমোঘ শর বসুন্ধরার গভীর স্তরসঞ্চিত ভোগবতী রসনির্ঝরের নির্মল উৎস ভীষ্মের পিপাসা-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করেছিল সেই মন্ত্রসিদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগ আধুনিক যুগের কবিরাও যে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন নাই তার নিদর্শন এখনও অ-মিল নয়। এঁদের হয়ত বিদেশ থেকে জয়মাল্য জিনে আনার মত প্রতিভা-গৌরব নাই, কিন্তু এঁরা সকলেই যে আপন আপন মানস-উদ্যানে বিকশিত কুসুম উপচারে সারস্বত-অর্ঘ্যথালা সাজাবার অধিকারী তা নিঃসন্দেহ।

অবশ্য রবিবাসরের এই মন্ত্রোচ্চারক বাণীপূজকের দল হয়ত সদস্যবৃন্দের মধ্যে সংখ্যালঘু হতে পারেন। অধিকাংশই নীরব ও নিষ্ক্রিয় থেকে শুধু শ্রদ্ধাশীল ও উৎসুক রসগ্রাহী শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত থাকেন কিন্তু সাহিত্যপূজার অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টিতে এঁদের অবদান মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। সাহিত্য যদি সহৃদয় হৃদয়সংবেদ্য হয়, সাহিত্যভোজে যদি রসপরিবেশন ও রসভোক্তার প্রায় সমতুল্য মর্যাদা স্বীকৃত হয়, তবে এঁদেরও পরোক্ষ সহযোগিতা রসাপ্লুত চিত্তে স্মরণীয়। সাহিত্যানন্দের তরঙ্গহিল্লোল যদি সহানুভূতিশীল শ্রোতার হৃদয়তটে প্রহত হয়ে শ্রুতিমধুরতা অর্জন করে, প্রেরণার বায়ুপ্রবাহ যদি চিত্তপল্লবের সংস্পর্শে এসে সঙ্গীতময় মর্মরধ্বনিতে বেজে ওঠে, তবে রবিবাসরের নীরব সদস্যেরাও এর আবহ সৃষ্টিতে এক অপরিহার্য অংশ গ্রহণ করেন। মধুচক্রের সবটাই মধুরসে পূর্ণ থাকে না, মোমে

গড়া শূন্য রন্ধ্রগুলিই এই মধুর আধাররূপে কাজ করে। তেমনি যাঁরা মধুসঞ্চয়ের এই শূন্যস্থানগুলি যোগান দেন তাঁরাও মধু-পরিবেশনের কৃতিত্বের অধিকারী।

এই সংস্থার সাহিত্যরসচর্চার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। তা হল এই সাহিত্যিক গোষ্ঠী যুগপ্রভাব নিরপেক্ষভাবে নিজ নিজ স্বাধীন প্রেরণায় তাঁদের রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। সাময়িকতার আবিল হাওয়ায় যা কিছু ধুলোবালি, যা কিছু ক্ষণিক সম্মোহের বাষ্পঘনিমা সঞ্চরণ করে সবই নির্বিচারে এঁদের রচনায় স্থান পায় না। বাজারে চলিত রেশনের কাঁকর মেশানো ভেজাল মালে এঁদের সারস্বত ভোগের উপচার রচিত হয় না। জনতার বিক্ষোভ, উচ্চকণ্ঠ দাবী, অশালীন চীৎকার ধ্বনি, এমন কি দেশব্যাপী অভাব-অভিযোগের তীক্ষ্ণ আস্ফালন, দৈহিক ক্ষুধার অসহ্য আর্তনাদ, বস্তু-জগতের এই স্থূল কর্কশ কোলাহল এঁদের সারস্বত বীণার সুরকে রূঢ় ভাবে খণ্ডিত করে না। বাইরের রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সবই এঁদের অনুভূতির সূক্ষ্ম যন্ত্রে শোধিত সংস্কৃত হয়ে, ভাব ও রসে রূপান্তরিত হয়ে লেখকদের মনোরাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়, ও কল্যাণসুন্দরের বেদীমূলে অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়। আধুনিক যুগে লেখা হলেও তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যের উৎকট রচনারীতি বা পূর্ব নিরূপিত মেজাজের স্ট্যাম্প এই লেখাকে শ্রেণীচিহ্নিত করে না। যুগযন্ত্রণার, জীবন সংগ্রামের দুর্বিষহতা, মনের চিরস্থায়ী তিক্ততা, সৃষ্টিবিধানের প্রতি অবিমিশ্র অনাস্থা, সদাপ্রধূমিত ক্ষোভ ও বিদ্রোহের চাপা আঁচ প্রভৃতি সুপরিচিত বিকার লক্ষণগুলি এই প্রসন্ন জীবনস্বীকৃতিমূলক সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যুগসুলভ চিত্তদাহকে এঁরা কোন্ অভয়মন্ত্রে প্রতিরোধ করেছেন। যূথমনের অভিভব থেকে রসচেতনার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। দলের সমবেত কোলাহলে নিজ কণ্ঠ-স্বরের স্বতন্ত্র সুরটিকে বিলুপ্ত হতে দেননি তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। লেখক মনের আভিজাত্য এঁরা পবিত্র হোমশিখার মত অসংখ্য কলকারখানার উৎক্ষিপ্ত ধূম্ররাশির মধ্যেও চিরপ্রদীপ্ত রেখেছেন।

সর্বোপরি রবিবাসরের সদস্যদের মধ্যে সাহিত্যসাধনায় যেমন, জীবনচর্যায়ও তেমনি একই প্রকারের শুভ্রশুচি রুচির নির্মলতা ও অন্তরের উদার দাক্ষিণ্য আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণতঃ সাহিত্যিকদের মধ্যে একটু ঈর্ষ্যা-প্রবণতা ও অপর লেখকের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাকে একটু লঘু করার চেষ্টা, কিঞ্চিৎ রসাল পরনিন্দা ও পরচর্চাপ্রবণতা চাঁদে কলঙ্কের মত তাঁদের উজ্জ্বলতাকে কিছুটা ম্লান করে। সাহিত্যের মজলিসে চা বা কফির সঙ্গে চানাচুরের মত এই প্রসঙ্গ সাহিত্যালোচনার উপভোগ্যতা বাড়ায়। পরিমিত মাত্রায় সাহিত্য হতে সাহিত্যিকের ব্যক্তি জীবনে এই অনুপ্রবেশ দূষণীয় নয়। বরং সাহিত্যের রসাস্বাদনের সহায়ক হতে পারে। কিন্তু রবিবাসরে আমার সুদীর্ঘ সংযোগকালের মধ্যে আমি সদস্যদের আচরণে মহৎ হৃদয়ের এই সামান্য দুর্বলতার লেশমাত্র পরিচয়ও পাই নি। এঁদের প্রশংসা এত প্রাণখোলা, মুক্তকণ্ঠ ও প্রচুর-উচ্ছ্বসিত, এত সরল ও বক্রোক্তিবর্জিত, যে সময় সময় তা বরং আতিশয্যের ধার ঘেঁসে যায়। এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রীতিরসে উদ্বেল, মৃদু পরিহাসে স্নিগ্ধ ও সহজ আত্মীয়তার হৃদয়তাপে কবোষ্ণ। একের প্রতিষ্ঠায় সকলের অনাবিল আনন্দ। সকলে যেন বন্ধুর সৌভাগ্য একযোগে বেঁটে নিয়ে আস্বাদন করতে উন্মুখ। আমি কখনও পরোক্ষেও কারুর সম্বন্ধে কোন বিরূপ ইঙ্গিতের আভাসমাত্র শুনিনি। কেউ দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সম্বন্ধে আন্তরিক উদ্বেগ, তাঁর খবর নেবার আগ্রহ সকলের কণ্ঠেই ধ্বনিত। আমাদের অভিনন্দন বা প্রশস্তি-অধিবেশনগুলিই সবচেয়ে অন্তর-মাধুর্যে আপ্লুত হয়ে ওঠে। স্বতঃই মনে হয়-যে আমাদের এই আদিম স্বর্গরাজ্যে কোন শয়তানের সর্পদূত প্রবেশ করতে পারে নি। যিনি অভিনন্দনগ্রাহী তাঁর মন থেকে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সব যোগ্যতা-অযোগ্যতার সংশয়-সন্দেহ ভালবাসার উচ্ছল স্রোতে ভেসে চলে যায়। তিনি নিজেকে গুণে নয়, স্নেহাকর্ষণে ধন্য মনে করে সমস্ত আত্মসমীক্ষার সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়ে যান। এমনি ভাবে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়-যে

তাঁর বিবেক ঘুমিয়ে পড়ে। রবিবাসরের এই যে অভিজ্ঞতা, এই যে প্রফুল্ল জীবনের অভিনন্দন লাভ—এ আমার ন্যায় জীবন-সায়াহ্নে উপনীত পারের যাত্রীর পক্ষে এক অমূল্য পাথেয়। ললাটে এই জীবনস্বীকৃতির জ্যোতির্ময় তিলক পরেই জীবনের নিকট প্রসন্ন চিত্তে বিদায় নেওয়া যায়। মরণের আঁধার গুহায় নিরুদ্দেশ প্রবেশ সহজসাধ্য হয়।

তাই জীবনের অদম্য জয়যাত্রার প্রতীকরূপে রবিবাসর জীবন দেবতার অক্ষয় প্রসাদ। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের সবার প্রিয়, আমাদের আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে আমাদের সত্তার অঙ্গীভূত।
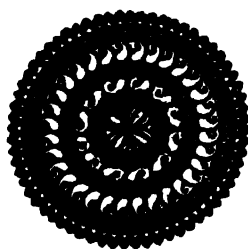
রবিবাসরে কবির ভাষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমি তোমাদের রবিবাসরের এই অধিবেশনে উপস্থিত হবার আহ্বান পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, প্রীতি লাভ করেছি। তোমাদের দেখে যেমন মুগ্ধ হচ্ছি, তেমনি তোমাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছি এই রবিবাসরের মধ্যে দিয়ে। আমার সম্বন্ধে বরাবর দুর্লভতার একটা অভিযোগ চলে এসেছে। তার বিরুদ্ধে আমার যা কিছু বলবার আছে তা বলছি। আমি অন্তরের ভিতরে খুবই জানি, সত্য বলে জানি-যে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের মূলে রয়েছে এমন একটা দুর্বলতা, যে দুর্বলতা ছেলেবেলা থেকেই আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে। আজকালকার মত যখন আমার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েনি, পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে যখন আমার কোন কারবার ছিলনা, খ্যাতির বিড়ম্বনা ছিলনা, তখনও আমি আপনাকে দশজনের সম্মুখে, লোকসমাজের কাছে ধরা দিতে পারিনি। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ আমাকে জনসমাজের কাছ থেকে দূরে রেখে দিয়েছে। এজন্য আমাকে দায়ী করলে চলবে না। আমি ছেলেবেলায় যে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি, সেখানে বাইরের সঙ্গে আমার যোগ ছিল অতি অল্প। আমি আপনার মনের মধ্যে নানা কল্পনার ছবি এঁকে চলতুম, বাইরের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব ছিল না বলে সে সময়ে যে আমার মনের মধ্যে খুব একটা অতৃপ্তি ছিল এমন কথা আজ আর মনে পড়ে না। বাইরের চেয়ে আমি অন্তরের মধ্যেই নিজেকে বিশেষ করে অনুভব করার আনন্দ সেই ছেলেবেলাতেই পেয়েছিলাম।

তারপর যখন স্কুলে পড়তে গেলুম, তখন আমি আপনাকে আমার সেই নির্জনতায় থাকবার অভ্যাস থেকে মুক্ত করতে পারিনি।

কেমন যেন একটা বাধো বাধো ঠেকতো। সেখানেও আপনার মনে নীরবে বসে থাকতুম, আপনার মনের ভেতরেই নানা সমস্যার বাধা জেগে উঠত। আপনাকে একলা,—অত্যন্ত একলা বলেই মনে করেছি। এজন্য স্কুলের আসা যাওয়ার মধ্যে দিয়েও আমার সঙ্গে কোন ছেলের ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এ জন্যই আমার বাল্যবন্ধু নেই। আমার বন্ধুত্বের কোন বালাইই নেই। স্কুলের ভিতর গিয়েছি বটে, তবু হাঁস যেমন জলের ভিতর গা ভাসিয়ে যায়, জলে ডুব দিলেও তার গায়ে জল লাগে না, তেমনি আমার গায়ে জল লাগেনি।

বাল্যের সেই যে অভ্যাস তার হাত থেকে একেবারে মুক্তি পেয়েছি এমন কথা যদিও বলতে পারিনা, তবে আমি যে দুর্লভ এমন কথাও আজ সহজ ভাবে মেনে নিতে পারি না। আজ আমার খুবই ইচ্ছা হয়, তোমাদের সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা করি, কিন্তু এ বয়সে শারীরিক দুর্বলতার জন্যে, অপটুতার জন্যে, সে ইচ্ছা পূর্ণ করবার স্নুযোগ হয়ে ওঠে না।

আমাদের ছেলেবেলায় যখন আমরা অতি বালক বয়সে সাহিত্যচর্চা করতে আরম্ভ করেছিলাম, তখন বাংলা সাহিত্যের এত প্রসার ছিলনা, এত বিস্তার ছিলনা, এত পথ ছিল না। আজ আমাদের সাহিত্য আপনার গুণে খ্যাতির বিস্তার করেছে, নিত্য নূতন নূতন আনন্দের রসসত্র সৃষ্টি করেছে এবং সে রসধারা অন্তরে প্রবেশ করে নানা ভাবে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও কুসুমিত হয়ে উঠছে। তখন তা হত না।

সে সময়ে সাধারণ ভাবে চলত সাহিত্য-চর্চা। সে সময়ে যাঁরা খ্যাতিমান সাহিত্যিক ছিলেন তাঁরা সব মিলিত হতেন। নানা আলোচনা হত সেখানে। বক্তৃতা হত, প্রবন্ধ পাঠ হত, সব সময়েই-যে সাহিত্যের আলোচনা হত তা নয়, আর সকলেই-যে সাহিত্যিক ছিলেন তাও নয়। তবে তাঁরা অনেকেই ছিলেন সাহিত্য-রসিক। নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। বয়স্কেরা সেই সভায় কেন জানি আমাকেও ডাকতেন তাঁদের আলাপ আলোচনা শুনতে।

তাঁরাও আমাকে স্নেহ করতেন। একথা মনে করতেন না-যে আমি বালক।

তারপর যখন বয়স বাড়তে লাগল, একটু নাম ও যশ হতে লাগল, তখনও আমার তরুণ মন রাজধানীর কোলাহলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইল না। আমি বরাবরই নির্জনতাকে ভালোবাসি, সেখানে আমি সম্পূর্ণ ভাবে আপনাকে পাই, অন্তরে ও দেহে একটা সরসতা জেগে ওঠে। আমাদের জলধর দাদা জানেন,—পদ্মানদীর তীরে শিলাইদহে, নগরের সব রকমের কোলাহল হতে দূরে থাকতেম একান্ত একাকী। বাইরের কোন আকর্ষণ ছিল না। কোন কিছুতেই আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে পারত না। সেখানকার নদীর জল, সেখানকার তরুলতার শ্যামলতা—আকাশ ও বাতাস, আমার সেই নির্জন বাসকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলেছিল। দেহে ও মনে নির্জনতার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পরিপূর্ণভাবে অন্তরের মধ্যে অনুভব করতেম। মনের ভিতরে যে ভাব ও কল্পনা জেগে উঠত, তাকে ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতেম। এই ভাবে শিলাইদহে আমার রচনা অজস্র ভাবে পৃথিবীর আলোর কাছে প্রকাশ পেয়েছিল।

আমার এইরূপ নির্জন বাসের অভ্যাসের দরুণ আমি আপনাকে জনসমাজের কাছ থেকে যে অনেকটা দূরে এনে ফেলেছি সে-কথা অনেকটা সত্য হলেও, আমি আপনাকে সকলের কাছে দুর্লভ বলে এখন আর মনে করি না। তোমরা যদি মনে কর, আমার আত্মাভিমানের জন্য মেলা হয়না, তা হলে তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। এর চেয়ে আমার প্রতি আর বেশি কিছু অবিচার হতে পারে না। আমার কাছে, যাদের সহজ যোগ্যতা থাকে, তারা অনায়াসে এসে মেলামেশা করেন। কাজের ক্ষতি করেন, মনে করে নেন, আমার অখণ্ড অবসর। অবশ্যি আমাকে নিতান্ত যাদের প্রয়োজন, তাদের কাছে আমি কোন কালেই তো দুর্লভ নই। তবে এখন দেহ আমাকে অনেক আকাঙ্খা ও ইচ্ছা থেকে বিরতি দিতে

চায়। তাই অনেক সময় মনের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করবার সুযোগ করে উঠতে পারি না।

আজ আমি যদি আবার যৌবন ফিরে পেতুম, অল্পবয়স্ক হতুম, সহজ হত তাহলে ছাত্রবৃন্দ ও তরুণবয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশা করবার। তাহলে আমি তাদের সঙ্গে সমভূমিতে এসে দাঁড়াতেম। তাদের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে সামনা-সামনি মুখোমুখি হয়ে কথা কইতুম। তাদের আলাপ ও আলোচনায় ভাবের বিনিময়ে আনন্দ ও উৎসাহ পূর্ণভাবে উপভোগ করতেম। যারা কবি, যারা লেখক, সেই সকল তরুণ মনের সহিত হত আমার মিলন। কিন্তু সে সুযোগ ও শক্তি হতে যে এখন বঞ্চিত হয়েছি! কাজেই তোমাদের দুর্লভতার জন্য অভিযোগ করবার তো কিছু নেই। তবু যখনই সুবোগ পাই তখনই আমি ছুটে আসি তরুণ বয়স্কদের সঙ্গে যোগ দিতে, তা'দিগকে উৎসাহিত করতে।

আমার লেখার ভিতর দিয়ে যে সকল তরুণ সাহিত্যিকের পরিচয় ঘটেছে এবং যাদের লেখার সহিত আমারও পরিচয় হয়েছে, অথচ প্রত্যক্ষভাবে আত্মীয়তা ঘটে ওঠেনি, যদি সম্ভব হত, যদি কলকাতায় থাকতেম, তবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেম। তাদের তরুণ মনে কতখানি উৎসাহ, কতখানি সংকল্প ও দৃঢ়তা জেগে উঠেছে, কী উৎসাহ ও উত্তেজনা নিয়ে তারা সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন সে সবই অনুভব করতে পারতেম। যদি তাদের সঙ্গে সহজভাবে যোগ হত, তা'দিগকে যেমন উৎসাহিত করে আনন্দিত হতেম তেমনি প্রত্যক্ষভাবে আমিও উপকৃত হতেম তাদের চেয়ে অনেক বেশি।

রচনা করার পক্ষে নির্জনতার অবকাশ যেমন সুবিধাজনক, তেমনি তাতে যে অসুবিধা নেই তাও নয়। এ কথা সত্য যে নির্জনতার মধ্যে শুধু পাওয়া যায় নিতান্ত নিজেকে, সাধনার চির-নিষ্ঠার মূল্য সেখানে আছে, মেনে নিতে পারি। সেখানে কোন আবিলতা থাকে না, সেখানে কোন চিত্তবিক্ষেপ হওয়ার কারণ ঘটে

না, কোন প্রকার চঞ্চলতা ও কোলাহলের কারণ ঘটে না। আমার অভ্যাসের মধ্যে ঐটিই বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

তবে এ কথা সত্য-যে, সমাজের কাছ থেকে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করলে, কোন বয়সেই মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মাবার সুযোগ ঘটে না। নানা লোকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যে যে একটা শিক্ষা আছে, তার ভিতর হতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে থাকলে সম্ভব হয় না। সমাজকে জানতে হলে, বুঝতে হলে, তার উন্নতির পথ কোন্ দিকে কোন্ পথে, তার সন্ধান নিতে হলে চাই পরিচয়, অন্তরের পরিচয়, সমাজের সত্যিকার নাড়ীজ্ঞান। এই নাড়ীজ্ঞান লাভ হয় শুধু মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে এবং সেই অন্তরের পরিচয় হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সাহায্যে। এই মানব মনের পরিচয়ের ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সে হল সত্যিকার অন্তরের পরিচয়। এই পরিচয়ের দ্বারা, এই সহযোগিতার দ্বারা জনসমাজের কি সঙ্কল্প তা জানতে পেরে ভবিষ্যৎকে যারা তৈরী করবে, জাগিয়ে তুলবে, উন্নতির পথ দেখিয়ে দেবে, কালের উপযোগী বাণী প্রচার করবে, তারা পায় পথের সন্ধান। কাজেই জনসমাজের কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে তো চল্‌বে না। তাদের মানুষকে চিনতে হবে মানুষের ভিতর দিয়ে মেলামেশা করে। আমার মত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে তো চলবে না। আমি সুদীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে অভ্যাসের মধ্যে যে প্রধান ত্রুটি করেছি, সে অভিজ্ঞতার দ্বারা যে-সত্যকে উপলব্ধি করেছি, আজ তোমাদের কাছে সেই কথাই বল্লেম। আমার সহজ বুদ্ধি বলে দিচ্ছে, মানুষকে সমাজকে ভালোবাসতে হবে। সকলে এক হয়ে এক মনে না চললে আমাদের ব্যর্থতাই শুধু এগিয়ে আসবে, সফলতা আসবে না। এ কথা যেন আমাদের অন্তরে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আমরা যেন একথা বিস্মৃত না হই।

রবিবাসরের এই-যে মিলন, এই যে তোমরা সব তরুণ সাহিত্যিক ও বন্ধুরা মিলিত হয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা। বাংলা

দেশে এক সময়ে যে সজীবতা, শ্যামলতা, উৎসাহ ও আনন্দের রূপ আপনাকে হাস্যময়ী মূর্তিতে প্রকাশিত করেছিল, সর্বদিকে ও সর্বভাবে আনন্দ ও সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছিল, আজ আর তা নেই। আজ যেন এই দেশ মরুভূমির মত। শ্যামলতা নেই, সজীবতা নেই। বাঙলা দেশের সর্বত্র এযেন দুঃখের পর্ব ফুটে উঠেছে। এই দুঃখকে আমরা বহন করেই চলেছি। আমাদের এই দুঃখকে দূর করে আবার সামাজিকতায় মধুর মিলন সৃষ্টি করে আনতে হবে, সরসতা ও সজীবতায় অন্তরে অন্তরে আনন্দসত্র সৃষ্টি করতে হবে. দিন দিন তাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে! পৃথিবীতে সব কিছুই বেঁচে থাকে না ; সভা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান সবই যে চিরকাল বেঁচে থাকবে সে ভবিষ্যৎবাণী কেউ করতে পারেনা। আমরা ছেলেবেলায় যে কত সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হতে দেখেছি, তার ঠিকানা নেই। কত সভা, সমিতি, লাইব্রেরী, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে দেখেছি, কিন্তু সে সব এখন কোথায়? কাজেই কি থাকবে না-থাকবে সে ভাবনা ভেবে কোন ফল নেই।

যতদিন তোমাদের এই 'রবিবাসর' বেঁচে থাকবে ততদিন তোমরা এর ভিতর দিয়ে দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করবে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে দেবে। কাকেও নিরাশ হতে দেবে না—অলস হতে দেবে না, দেশের কাজকে ও সমাজের কল্যাণকে বড় করে লোকে দেখতে পারে এমন একটা প্রেরণা তোমরা সমাজের বুকে, দেশের বুকে ছড়িয়ে দেবে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের যেমন একটা উত্তেজনা থাকে, সেটা যেমন সত্য, তেমনই আর একটা সজীব আন্দোলন চিরন্তন ভাবে 'বেঁচে থাকে, সেটা হচ্ছে সাহিত্য। রাষ্ট্র, সাহিত্য ও সমাজের কল্যাণের ব্রত সামাজিক মানুষকে গ্রহণ করতে হয়,—তার সঙ্গে যোগ রাখতে হয়, সে যোগ হতে আপনাকে বঞ্চিত করে কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। এ জন্য তোমাদের অন্তরের সবলতার সহিত দেশকে চারিদিক দিয়ে প্রাচুর্যের সহিত, দাক্ষিণ্যের সহিত, দিতে হবে

অনেক কিছু। এই দেওয়ার সুযোগ হতে তোমরা নিজেকে বঞ্চিত কোরো না। এ কথাটাই তোমাদের কাছে আমার বিশেষ করে বলবার ছিল।

আমার জীবনে আমি যা কিছু করেছি, যা কিছু দিয়েছি সর্বসাধারণ যদি তা গ্রহণ করে থাকে, তার চেয়ে আর আনন্দ বেশি কি হতে পারে! আব যদি গ্রহণ না করেও থাকে তাতেও তো বলবার বেশি কিছু নেই। অনেক দিন লেগেছে আমার দেশবাসীকে আমার সাধনার ফল অনুভব করতে। আমার মনের ভিতর হতে কত সময়ে কত প্রশ্ন, কত সন্দেহ, কত বেদনা-যে জেগে উঠেছে তার অবধি নেই। আবার সকলের অন্তরেব শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি ও ভালোবাসা নানা ছোট ছোট ঘটনা উপলক্ষ্য করে যে ভাবে নিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে, তাতেও আমি মুগ্ধ হয়েছি, আনন্দে অভিভূত হয়েছি। মানুষেব মন মানুষের কাছ থেকে দরদ, অনুকম্পা ও নগদ বিদায় চায। দূরের কালেব উপর বরাত দিয়ে থাকার চেয়ে হাতে হাতে যা পাওয়া যায, তাই সে চায। সে চায প্রীতি, অনুকম্পা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এ জীবনেই পেতে। খ্যাতি বলো, প্রতিপত্তি বলো, সবই যদি এখানেই সে লাভ করতে পারে—সে আনন্দ ও প্রীতিই যে তার পরম লাভ। এমন লেখক কেউ পৃথিবীতে নেই, আমি স্পর্দ্ধা করে বলছি না, যে চায়না তার নিজের খ্যাতি-প্রতিপত্তি এ জীবনেই লাভ করতে। এই যে জনসমাজের কাছ থেকে যশের পুরস্কার লাভ, সে হচ্ছে সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতা। অর্থের দিক দিয়ে সার্থকতা কয়জনের জীবনেই বা আসে? বৈজ্ঞানিক যে আবিষ্কার করেন, যে সত্য প্রচার করেন, তার সত্যাসত্যের বিচার হতে সময়ের প্রয়োজন হয়। নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তার সার্থকতা আসে। সে হয়ত অনেক সময় যুগের পর যুগ চলে যায়। সাহিত্যের সম্বন্ধে অনেক সময়েই এ কথা খাটে না।

আমার আর কিছু কথা নেই। মনে রেখ, সাহিত্যসাধনা বড় কঠোর সাধনা। রস-রচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে, সাহিত্যের সেবায়

আপনাকে নিযোজিত করতে হলে, কঠিন আবরণের ভিতর দিয়ে চলতে হবে, অঙ্কুর যেমন কঠিন আঁঠির ভেতর থেকে আপনাকে সরস করে, সুন্দর করে, ধরণীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি কঠোর সাধনা তোমাদের করতে হবে, তবে তো সে সাধনা সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে, পুষ্পে পল্লবে বিকশিত হয়ে উঠবে। আমি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করি, তোমাদের মধ্যে যেন সেই সাধনার শক্তি জেগে ওঠে।

আমার কোন অভিমান নেই, মনে বেদনা নেই, আমার কোন নালিশ নেই কারো কাছে। তোমরা আমাকে ভালবেসে যা কিছু এনে দিচ্চ—সেই প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা, সে সব আমার জীবনের শেষ দিকের পথের পাথেয়। তোমরা আমাকে মনে করে ভালোবেসে আহ্বান করেছ, তাইতে আমি ধরা দিয়েছি। তোমাদের ভক্তির ও স্নেহের যে অর্ঘ্যডালা, সেই ভালোবাসাই আমার পরম লাভ। আমি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করি, নমস্কার করি, কল্যাণ কামনা করি। তোমরা 'রবিবাসরের' সকল সভ্যবৃন্দ মঙ্গলবাণী গ্রহণ করো, এই হচ্ছে আমার শেষ কথা। আর কিছু আমার বলবার নেই।

(৩রা শ্রাবণ, ১৩৪৩ তারিখে সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অশ্বিনী দত্ত রোডের গৃহে অনুষ্ঠিত রবিবাসরে কবির ভাষণ। সন্তোষকুমার দে প্রণীত 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ হতে গৃহীত)

রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্রদেব

রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ সম্পর্কে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সম্পাদক, কবি ও কথা-সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার দে ইতিপূর্বে একখানি তথ্যবহুল ছোট্ট বই* লিখে রবিবাসরের সকল সদস্যগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তথাপি রবিবাসর ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সবচেয়ে পুরাতন সদস্যরূপে যুক্ত আছি বলে রবিবাসরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের কাহিনী সংক্ষেপে কিছু লিখে দেবার জন্য সন্তোষ ভায়া আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমিও আনন্দের সঙ্গেই এ কাজের ভার নিয়েছি।

রবিবাসরের জন্ম হয় বাংলা ১৩৩৬ সালের এক সন্ধ্যায় সুসাহিত্যিক সুবোধ দত্তের ভবানীপুরস্থ বাসায়। জলধরদাদার আগ্রহেই এই সাহিত্যিক সমাবেশটি গড়ে উঠেছিল। স্থির হয়েছিল প্রতি রবিবারে সন্ধ্যায় এর অধিবেশন হবে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে। এই কারণেই প্রতিষ্ঠানটির নাম-করণও হয়েছিল "রবিবাসর"। এটি অনেকটা ইংরাজী 'রোটারি' ক্লাবের মতোই।

পাঁচজন গণ্যমান্য সাহিত্যিক আপনার বাড়ী পদার্পণ করলে আপনার তো একটা সামাজিক কৃত্য আছে অতিথি সৎকার। তাঁদের সকলকে একটু চা-জল খাবার দিয়ে অপ্যায়িত করা। দেখা গেল প্রতি রবিবার বৈঠকের অসুবিধা আছে। কেননা, রবিবারটা ছুটির বার। সেদিন গৃহস্থদের অনেক কাজ সারবার বায়না থাকে। সকলে সব রবিবার আসতে পারেন না। তখন স্থির হল যে ১৫দিন অন্তর মাসে দুবার মাত্র রবিবাসরের অধিবেশন হবে সদস্যদেরই বাড়ী

* রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ

বাড়ী ঘুরে। এ প্রতিষ্ঠানের কোনও স্থায়ী আস্তানা নেই। সম্পাদকের ঠিকানাতেই এর হদিশ মেলে।

রবিবাসর প্রতিষ্ঠার পর আরও একটা অসুবিধা দেখা দিল। সাহিত্যিকদের অবস্থাতো সেদিন আজকের মতো এমন সচ্ছল ছিলনা। তাঁদের অনেকেরই গৃহে এমন স্থান ছিল না যেখানে অনেকে এসে বসতে পারেন। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যই স্থির হয়েছিল যে রবিবাসরের সদস্যসংখ্যা ৫ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। চাঁদা নির্দিষ্ঠ হয়েছিল মাসে 'আট আনা' বা বছরে ৬৲ টাকা মাত্র। কিন্তু দেশের আয় ব্যয়ের সমতা ক্ষুন্ন হয়ে ব্যয়ের মাত্রা দিন দিন উচ্চগ্রামে পৌছানোর ফলে রবিবাসরের সদস্যদের চাঁদা এখন বার্ষিক বারোটাকা নির্দিষ্ট হযেছে। তবে, যে সদস্যের বাড়ী যেবার রবিবাসরের অধিবেশন হয সেবার তাঁর বাৎসরিক চাঁদা বারোটাকা মকুব করা হয়। কারণ, রবিবাসরের প্রতি আসরেই পঞ্চাশজন সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ ৩০।৩৫ জন প্রায়ই উপস্থিত হন। এঁদের সকলকেই চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করতে হয়। এর খরচ আছে।

'রবিবাসর' কেবল মাত্র কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়েই গঠিত হয়নি। এঁর মধ্যে শিল্পীরাও আছেন। একাধিক সাংবাদিক সহ অল্প কয়েকজন সাহিত্যিকদের অনুরাগী বন্ধুরাও আছেন।

এইভাবে গত ৩৯ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি তার গৌরবজনক অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে। রবিবাসরে বহুদিন মহিলা লেখিকাদের সদস্যপদে গ্রহণ করা হয়নি। তার কারণএ - নয়, যে তাঁরা আসতে চাননি। বরং রবিবাসরের সদস্য হবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। কবি রাধারানী দেবীকে জলধরদা নিজের কন্যার মতই স্নেহ করতেন। দাদা একবার প্রস্তাব করলেন যে রবিবাসর যখন সাহিত্যিকদের আসর, তখন রাধারানীকে রবিবাসরের সদস্যা করে নেওয়া হোক।

শরৎচন্দ্রও রাধারানীকে সহোদরাধিক ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁকে রবিবাসরের সদস্যা করতে তিনি সম্মত হ'লেন না! তিনি বললেন 'রাধু'কে যদি আমরা নিই তাহলে অন্যান্য লেখিকাদেরও নিতে হবে। তাতে মুস্কিল হবে এই যে 'রবিবাসরে' এসে সাহিত্যিকেরা আর প্রাণ খুলে আড্ডা দিতে পারবেন না। মেয়েরা উপস্থিত থাকলে হয়ত লঘু হাস্য পরিহাস প্রকাশে বাধা বোধ হবে অনেকের। রাধারানী বললেন, আচ্ছা বেশ, এ সম্বন্ধে গুরুদেবের মতামত নেওয়া হোক।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ একবার কলকাতায় আসতে শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে রবিবাসরে মেয়েদের নেওয়া যেতে পারে কিনা এ আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন,—রবিবাসরটা তোমাদের একটি সুগভীর 'সাহিত্য সভা' না 'সাহিত্যিক-দের আড্ডা?

শরৎচন্দ্র কবিকে বুঝিয়েছিলেন—'রবিবাসর' ঠিক 'সাহিত্য সভা' নয়। কাব্য ও সাহিত্যের আলোচনা অবশ্য প্রতিবাসরেই হয়, কিন্তু আড্ডাই প্রধান। মেয়েরা থাকলে আমাদের পক্ষে একটু সতর্ক ও আড়ষ্ট হয়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে। আড্ডার অবাধ স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব হবে।

একপক্ষের এই ধরণের আপত্তির কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ রায় দিয়েছিলেন,—তোমাদের এ আড্ডায় মহিলাদের না থাকাই ভালো। কারণ তাঁরাও তোমাদের মজলিশে উপস্থিত থাকতে অসুবিধা বোধ করতে পারেন।

শরৎচন্দ্র কবির এ অভিমত রাধারানীকে শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কাউকে বোল না রাধু! এই রবিবার কবি কলকাতায় থাকবেন এবং এবার রবিবাসর ডাকার পালা আমার পড়েছে বলে আমি কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি রবিবাসরে আমার বাড়ী পদধূলি দেবার জন্য। কবি রাজী হয়েছেন আসতে। তোমাকে এসে কবির সমাদরের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে।

বড় বৌ (হিরণ্ময়ী দেবী) অথবা ছোট'বৌ (প্রকাশের স্ত্রী) এসব তো কখনো করেনি। ওঁরা কিছুই জানেন না, তোমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।

রাধারানী শরৎদাকে 'বড়দা' বলতেন। তাঁর অনুরোধে সকালে উঠেই শরৎদার বাড়ী চলে গেলেন এবং সারাদিন সেখানে থেকে সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন করে দিয়ে অপরাহ্ণে বাড়ী ফিরে আসেন। আসবার সময় শরৎদা বলেন,--রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরে আজ এই প্রথম আসছেন। রাধু তুমি চট্ ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে চলে এসো। কবিকে অভ্যর্থনা করবে কে? তুমিই আমার ভরসা। রাধারানী এর কোনও উত্তর দেননি। শরৎচন্দ্রের মতে রবিবাসরে মেয়েদের যোগ দেওয়া উচিত নয় সেই কথা স্মরণ করে কবিগুরু আসছেন জেনেও তিনি আর যাননি।

১৩৪৩ সাল রবিবাসরের পক্ষে এক স্মরণীয় গৌরবময় বৎসর। এই বৎসর ৩রা শ্রাবণ অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অশ্বিনী দত্ত রোডের নূতন বাড়ীতে রবিবাসরের সপ্তম বর্ষের 'সপ্তম অধিবেশন' আহুত হয়েছিল। কিন্তু কবির আদেশ অনুসারে কাউকে জানানো হয়নি যে সেদিন শরৎচন্দ্রের গৃহে রবিবাসরের অধিবেশনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আসবেন। একই আকাশে এদিন চন্দ্র-সূর্যের উদয় হবে। অবশ্য অল্প কয়েকজন শরৎচন্দ্রের বিশেষ অন্তরঙ্গ মাত্র এ সুসংবাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ ও সম্পাদক পর্যন্ত এ খবর জানতেন না। পাছে তাঁরা ঘোষণা করে বসেন তাই বলা হয়নি। কবি আসছেন তা না জানলেও কিন্তু শরৎচন্দ্রের আহ্বানে তাঁর নবনির্মিত কলিকাতার বাসভবনে রবিবাসরের এই অধিবেশনে সেদিন সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের তুলনায় সর্বাধিক সদস্য এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সর্বজনপ্রিয় লেখক সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্রকে রবিবাসরের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিলেন বাংলা দেশের সার্বজনীন জলধরদা আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে এলেন এর মধ্যে অপরাজেয়

কথাশিল্পী শরৎদা। রবিবাসরের এ এক পরম সৌভাগ্য! 'রবিবাসর' নামটি আর একদিক দিয়ে সেদিন যেন সার্থক হ'য়ে উঠেছিল।

সর্বাধ্যক্ষরূপে জলধরদা রবিবাসরের পক্ষ থেকে কবিকে যথাযোগ্য স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। কবিও তাঁর যথোচিত প্রতিভাষণ দিলেন এবং সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে রবিবাসরের অধিনায়ক' পদ গ্রহণে সম্মত হলেন। কবির ইচ্ছানুসাবে সেদিন তাঁকে শঙ্খধ্বনি ও দীপারতি দ্বারা পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়নি বটে কিন্তু কবির আগমনে সেদিন উপস্থিত সকল সদস্যের মনেই আনন্দেব শঙ্খ বেজেছিল, পরিতৃপ্ত দু'টি চোখে প্রীতির দীপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধার পুষ্পমাল্য কবির চবণে লুটিযে পড়েছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলার তদানিন্তন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পী সমালোচক ও সম্পাদকগণের এই মিলিত প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আত্মীযতাব সম্বন্ধ স্থাপনে মনে মনে আগ্রহী ছিলেন এবং রবিবাসরের সঙ্গে তাঁব যোগাযোগ স্থাপিত হওযায তিনি যে খুশী হযে উঠেছিলেন এটা বেশ বোঝা গিযেছিল। কবি শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতায় এলেই রবিবাসরের খোঁজ খবর নিতেন এবং সেই সময়ের মধ্যে কোথাও রবিবাসরের অধিবেশন থাকলে কবি সানন্দে এসে যোগ দিতেন।

শরৎচন্দ্রের ষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১১ই আশ্বিন ১৩৪৩ সালে রবিবাসর একটি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জামাতা শ্রীমান সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর দমদমস্থ উদ্যানবাটিকা 'অলকা পুরে'। কবিগুরুর একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সে বাসরে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি, কিন্তু শরৎচন্দ্রকে তিনি আশীর্বাদ করে পাঠিয়েছিলেন।

রবিবাসরের পরবর্তী অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন ২৫শে আশ্বিন ১৩৪৩ সালে 'উদয়ন' পত্রিকার সম্পাদক 'সাহিত্যবন্ধু' অনিল কুমার দে তাঁর বেলিয়াঘাটাস্থ উদ্যান 'প্রফুল্ল কাননে'। সৌভাগ্যক্রমে কবি এবার কলকাতায় থাকায় রবিবাসরের সেই

অধিবেশনে সানন্দে উপস্থিত হয়েছিলেন। গতবারের ত্রুটি সংশোধন করতে শরৎচন্দ্রের ষষ্ঠিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কবিগুরু তাঁর উদ্দেশে একটি নাতি দীর্ঘ অভিভাষণ লিখে এনে পাঠ করেছিলেন।

রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধরদা কবিগুরুকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানাবার পর কবি তার সরস প্রত্যুত্তর দিয়ে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে রচিত তাঁর আশীর্বাণী পাঠ করে শোনালেন। রবিবাসরের আসরে শরৎচন্দ্রের ষষ্ঠিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষের উৎসব যেন আবার নূতন করে দ্বিতীয় বার 'মহা' সমারোহে সম্পন্ন হ'ল। কবিকে নিজেদের মধ্যে একান্তভাবে পেয়ে সকলেই সেদিন বিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন।

রবিবাসরের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ যে রবিবাসরকে প্রীতির চক্ষে দেখেছিলেন তার নিঃসন্দেহ পরিচয় পাওয়া গেল যখন শান্তিনিকেতন থেকে অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরকে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন বোলপুরে যাবার জন্য। রবিবাসরের সদস্যদের মতে সে কি উল্লাস উতরোল! সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ওই ১৩৪৩ সালের ৩০শে ফাল্গুন রবিবার শান্তিনিকেতনে রবিবাসরের অধিবেশন কবির নির্দেশ অনুসারে সকালের দিকেই হবে স্থির হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল—আগের দিন শনিবার অপরাহ্নের ট্রেনে যাত্রাকরে সন্ধ্যায় সেখানে পৌছে সেখানেই নৈশভোজ ও রাত্রিবাস। সকালে বাসরের অধিবেশন। পরে মধ্যাহ্ন ভোজন ও অপরাহ্নের ট্রেনে গৃহে ফেরা। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর আশ্রমে রবিবাসরের যে ঐতিহাসিক অধিবেশন হয়েছিল তার বৈচিত্র্য ও আনন্দ সমারোহের তুলনা দুর্লভ বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। আমরা চল্লিশজন যাত্রী ট্রেনের একখানি কামরা রিজার্ভ করে বোলপুরে রওনা হয়েছিলুম। সেই কামরাটি সেখানে পৌছবার পর কেটে রাখা হল—পরদিন অপরাহ্নের ট্রেনে সংযুক্ত করে দেবার জন্য। এ সব ব্যবস্থাই কবির আদেশে সুসম্পন্ন হয়েছিল যাতে রবিবাসরের সদস্যদের শান্তিনিকেতনে যাতায়াতের কোনও অসুবিধা না হয়। কবির ব্যক্তিগত, সহায়ক ও নিষ্ঠাবান কর্মী এবং আমাদের অনেকেরই

স্বাগতম্

শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

(গান)

স্বাগতম আজি সুস্বাগতম
সমবেত সুধীবৃন্দ,
রবিবাসরের সাহিত্য-আসরে
লহগো প্রীতি-আনন্দ।

দ্বৈতকণ্ঠে আবাহন গীতে
জানাই প্রণতি ভকতি-চিতে,
এসগো অতিথি করগো আরতি
বঙ্গবাণীর ছন্দ ॥

রবিবাসরের অনেক অধিবেশনে বিখ্যাত গায়ক সঙ্গীতরত্ন শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁর এই স্বরচিত স্বাগত-সঙ্গীতটি তাঁর পত্নী কিন্নরকণ্ঠী শ্রীমতী এষা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গান করে রবিবাসরের অধিবেশনকে স্বাগত জানিয়েছেন।

পুরাতন বন্ধু শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরীর উপর অতিথি পরিচর্যার ভার অর্পিত হয়েছিল। তিনি আমাদের সকলকেই নিজ নিজ শয্যা ও মশারি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য লিখেছিলেন।

শনিবার রাত্রে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে সেখানেই আমরা নৈশভোজ ও রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে কবিসন্দর্শনে 'উদয়ন' যাত্রা করি। "শান্তিনিকেতন" বাঙালীর তীর্থ স্বরূপ। ধূলাপায়ে বিগ্রহ প্রণাম আমাদের প্রথা হলেও বয়োবৃদ্ধ কবিকে রাত্রে গিয়ে উৎপীড়িত না করে প্রভাতেই দর্শন করা হবে স্থির হয়েছিল। কবি কিন্তু জেগে থেকে আমরা এসেছি কিনা খবর নিয়েছিলেন।

প্রাতরাশের পর আমরা সদলে রওনা হলুম উদয়ন অভিমুখে। কবি অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের আগেই শয্যাত্যাগ করেন। তিনি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। প্রণাম ও পরিচয়ের পর 'রবিবাসরের' অধিবেশন শুরু হল পূর্বনির্ধারিত সময় সকাল আটটায়। রবিবাসরের সদস্যগণের সঙ্গে সেদিন আশ্রমের ছেলে মেয়েরা, বিশ্বভারতীর অধ্যাপকগণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরাও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। পরিচয় হল অনেকের সঙ্গে। ছাত্র ছাত্রীরা 'শুভকর্মপথে' গানটি গেয়ে সভার উদ্বোধন করলেন। রবিবাসরের পক্ষ থেকে সর্বাধ্যক্ষ জলধরদা কবির প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার পর অধ্যাপক কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং রবিবাসরের সভাকবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন। তারপর কবিগুরু তাঁর অপূর্ব ভাষণে রবিবাসরের সকল সদস্যকেই আনন্দে অভিভূত করে দিলেন। শুধু একটিমাত্র আক্ষেপ, অসুস্থ হয়ে পড়ায় শরৎচন্দ্র আমাদের সঙ্গী হতে পারেন নি।

কবির ভাষণের পর সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আলোচনা হ'ল। নামের আগে নিজেই নিজেকে 'শ্রী' মণ্ডিত করা উচিত কিনা, পত্র লেখবার সময় গুরুজন, বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদের এ কালে কি পাঠ লেখা যথোপযুক্ত হয়, কতকগুলি ইংরেজী শব্দের

অনুবাদে আমরা বাংলায় 'বাধ্যতামূলক', 'কৃষ্টি' প্রভৃতি কতকগুলি কদর্য কথা ব্যবহার করি এগুলি সমীচিন কিনা, বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলির বাংলা পরিভাষা যা' চালানো হচ্ছে সেগুলি সঙ্গত কিনা,—ইত্যাদি নানা আলোচনা ও তার মাঝে মাঝে হাস্যপরিহাসও আসরটিকে বেশ জমিয়ে তুলেছিল।

সকাল সাড়ে দশটার পর বাসর শেষ হল। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সমবেত সকলের একটি গ্রূপ ফটো নেওয়া হল। তারপর যারা এই প্রথম আশ্রমে এসেছেন তাঁদের শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখিয়ে আনা হল। তাঁরা বিশ্বকবির বিরাট কর্মসাধনার বিস্ময়কর পরিচয় প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে ফিরে এলেন। সুধাকান্তভায়া তাড়া দিলেন—স্নানাদি সেরে নিন, 'মধ্যাহ্ন ভোজ' প্রস্তুত।

বেলা একটার পর আমরা মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য এসে হাজির হলুম উদয়নের সেই প্রশস্ত হলঘরটিতেই। সে ঘরের চেহারা তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আসরের পরিবর্তে সারি সারি পংক্তি ভোজের আসনপাতা। আসনের সম্মুখে আল্পনা চিত্রিত-নক্সার উপর ভোজ্য পাত্রগুলি সজ্জিত। হলের মধ্যস্থলেও আলিম্পন চিত্রের উপর পুষ্পস্তবক শোভিত পূর্ণ কলস। ধূপের সুরভিতে স্থানটি সুবাস সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। আমরা আসন গ্রহণ করবার পর কবি এসে একখানি চেয়ারে বসে অতিথিদের আহারের তদারক শুরু করলেন! কবির পুত্রবধ্ প্রতিমা দেবী পরিবারের অন্যান্য বালিকাদের নিয়ে অতিথিদের 'চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়' পরিবেশন করছিলেন। ভোজের বিপুল আয়োজন করেছিলেন কবি। আমিষ ও নিরামিষ বিবিধ সুস্বাদু ভোজ্যের সঙ্গে কবিগুরুর সরস টিপ্পনি আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। কবি তাঁর দীর্ঘ শ্মশ্রুতে হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন— 'আমার ঘরে আজ চল্লিশ জন দস্যু হানা দিয়েছে।'

হাস্য পরিহাসের মধ্যে ভোজন পর্ব শেষ করে বেলা তিনটা নাগাদ কবির চরণে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে স্টেশনে এলাম এবং

আমাদের সেই রিজার্ভ কামরায় উঠে যে যার ঘরে ফিরে এলাম শান্তিনিকেতনের কবিগুরুর আতিথ্য-স্মৃতি অন্তরে চিরন্তন করে নিয়ে। বক্তব্য শেষ করবার আগে একটি কথা বলি; শান্তিনিকেতনে রবিবাসরের অধিবেশনের পর রবিবাসরে 'মহিলা সদস্য' নেবার অনুমতি রবিবাসরের অধিনায়ক কবিগুরু আমাদের দিয়েছিলেন। আজ একাধিক মহিলা শিল্পী ও সাহিত্যিক সদস্য হয়ে রবিবাসরের গৌরব বর্ধন করছেন।

* * *

'রবিবাসর' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ একটু টলমল করে উঠেছিল। জাপানী বোমার ভয়ে অনেকে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। অন্ন বস্ত্র দুর্মূল্য ও দুর্লভ। 'রবিবাসর' আর ডাকতে চাইছেন না কেউ তাঁদের বাড়িতে। তখন রবিবাসরের স্রষ্টা সর্বাধ্যক্ষ জলধরদা ঘোষণা করলেন—যতদিন না এই দুঃসময়ের কালাশৌচ কাটছে ততদিন আমার এই কুঁড়েতেই প্রতি পক্ষকালের ব্যবধানে 'রবি-বাসরের' অধিবেশন হবে। আমি সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি। কিন্তু জলযোগের ব্যবস্থা থাকবে প্রাচীন গ্রাম্য বিধি অনুসারে। আমি নদে-জেলার কুমারখালি গাঁয়ের লোক; আমি দেবো ভায়াদের গেঁয়ো জলখাবার। মুড়ি মুড়কি বাতাসা আর তেল জোটে তো দুটো বেগুনী ফুলুরি ভাজাও পাবে।

পরবর্তী রবিবাসরে আমন্ত্রিত হয়ে আমরা গেলুম দাদার বাড়িতে। জলধরদাদা তখন মেছুয়া বাজার স্ট্রীটের একটি বাড়িতে থাকেন। এখন সে রাস্তার নাম হয়েছে 'কেশব সেন ষ্ট্রীট'। দাদা যা বলেছিলেন তাই করলেন। কবিতা পাঠ, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা ও গান হয়ে যাবার পর সত্যিই এলো প্রত্যেকের কাছে আট কৌড়ের চেঁচাড়ির মতো ছোট ছোট চুপড়িতে ভর্তি করা গরম মুড়ি, কড়াই ভাজা; ছোলা ভাজা, চিনে বাদাম আর মাটির রেকাবিতে গরম গরম ভাজা বেগুনি,

ফুলুরি। মহানন্দে হৈ হৈ করে আমরা যখন মুড়ি বেগুনি খেতে শুরু করেছি, ওমা! দেখি যে কাঁচের প্লেটে সন্দেশ রসগোল্লাও এসে উপস্থিত হ'ল। আমরা অবাক হ'য়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, কেউ হয়ত' বলেই ফেললে, "একি দাদা! এ কথা তো ছিলনা?"
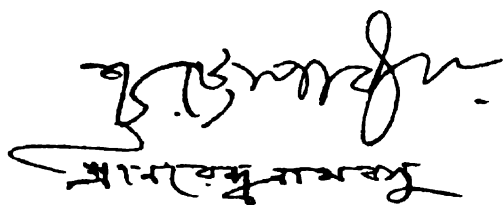
'দাদা' চোখ বুজে চুরুট টানতে টানতে বললেন, ওটার জন্য আমাকে দায়ী কোরনা তোমরা। আমি আমাদের সদস্যদের সর্বসম্মত প্রস্তাব অনুসারেই 'মুড়ি আর ফুলুরি'র ব্যবস্থাই করিছি। আর, ওটা যে পাচ্ছো ও তোমাদের 'ফাউ'! তোমাদের 'বৌদি' আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বললেন, 'এতগুলি গুণী জ্ঞানী ভদ্রসন্তান আমার বাড়িতে পায়ের ধূলো দেবেন, আর আমি তাঁদের 'কাঙালী -বিদেয়' করার মতো মুড়ি মুড়কি খাইয়ে বিদায় দেবো? তা' পারবো না।'

সুতরাং ওটা ভায়ারা রবিবাসরের পরিবেশন ব'লে ধোরোনা। 'রবিবাসর' দুঃস্থ সাহিত্যিকদের আসর। এখানে ভাই আহ্বায়কের যা জুটবে তাই দিয়েই সে অতিথি সৎকার করবে।

এমনি ক'রেই জলধরদাদা অতি দুর্দিনেও রবিবাসরকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

দুটি স্বাক্ষর

রবিবাসরের খাতায় উপরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর, তার নীচে তদানীন্তন সম্পাদক, পরে সভাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসুর স্বাক্ষর। সন্তোষকুমার দে লিখিত 'রবিবাসর, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রবিবাসর, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

সন্তোষকুমার দে

সম্পাদক—'রবিবাসর'

'রবিবাসর' বাংলাদেশের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সভা। বাংলাদেশের যে চারটি সাহিত্য সংস্থা ভারতসরকারের অনু:মোদন লাভ করেছে, 'রবিবাসর' তার অন্যতম। এর সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ জনে সীমাবদ্ধ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর 'অধিনায়ক' পদ গ্রহন করেছিলেন এবং আমরণ রবিবাসরের সংগে যুক্ত ছিলেন। রবিবাসরের সভাপতিকে 'সর্বাধ্যক্ষ' বলা হয়। এর একজন সম্পাদক এবং একজন অর্থসচিব আছেন। একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি এর বিশেষ কার্যাদি নির্বাহ করেন এবং সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবর্গের নির্দেশমত সম্পাদক বাসরের কার্যাদি পরিচালনা করেন। সচরাচর এক পক্ষ অন্তে রবিবার অপরাহ্ণে কোন সদস্যের আহ্বানে তাঁর গৃহে বা কোন পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে সভা বসে। সভার সদস্যগণ নিজরচনা পাঠ করেন এবং সে বিষয়ে আলোচনা হয়। সভার প্রধান পাঠকের নাম ও বিষয় পূর্বে স্থির করে আমন্ত্রণপত্রেই মুদ্রিত হয়। 'রবিবাসর'-সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা মাত্র বারো টাকা।

১৩৩৬ সালে 'মানসী ও মর্মবাণী' গোষ্ঠীর সুবোধ দত্ত মহাশয়ের ভবানীপুরের বাড়িতে 'রবিবাসর' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ১৩৭৫ সালে 'রবিবাসরের' ৩৯ বর্ষ চলছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাংলাদেশের জ্ঞানী, গুণী, সাহিত্যিক এবং চিত্র-শিল্পী বলতে যাঁদের কথা প্রথমেই মনে আসে তাঁদের মধ্যে অনেকেই কোন-না-কোন সময়ে 'রবিবাসরে'র সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তো

ছিলেনই, আরও ছিলেন রায় জলধর সেন বাহাদুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, কবি সুনির্মল বসু, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, রামকমল সিংহ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ). কবি গিরিজাকুমার বসু, কবি হেমেন্দ্রলাল রায়, কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ, শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, শিল্পী ফণীভূষণ গুপ্ত, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), কবি বসন্তকুমার চট্টো-পাধ্যায়, গুরুসদয় দত্ত, এস. ওয়াজেদ আলি, সাংবাদিক মৃণালকান্তি বসু, হাওড়ার পারিজাত সমাজের সভাপতি ব্যোমকেশ অধিকারী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি তিনকড়ি দত্ত, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'উদয়ন' পত্রিকার সম্পাদক অনিলকুমার দে, ঔপন্যাসিক চরণদাস ঘোষ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্ব রেলওয়ের প্রথম ভারতীয় জেনারেল ম্যানেজার প্রাবন্ধিক নিবারণ চন্দ্র ঘোষ (ও বি. ঈ.) প্রভৃতি পরলোকগত সাহিত্যিকবৃন্দ।

আবার শিল্পরসিক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, তারকনাথ রায়, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), ক্ষিতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পাদক—(মাস পয়লা') ননীমাধব চৌধুরী, বিনয় দত্ত, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়, নলিনীকান্ত সরকার, অপূর্বকুমার চন্দ, শিল্পী চিন্তামণি কর, কবি ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র, শিল্পী অমূল্যকুমার সেনগুপ্ত, শিল্পী শৈলজ মুখোপাধ্যায়, কথাশিল্পী আশিস গুপ্ত, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতিও ছিলেন।

স্যার যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি কালিদাস রায়, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাঠাকুর), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন, মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র, দেবেশ দাস, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, স্বামী অসীমানন্দ, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বহুবার 'রবিবাসরের' অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। ভারতে আগত বহু বিদেশী অতিথি, বিদেশের পি. ঈ. এন-সদস্য ও সাহিত্যরসিকেরাও সাগ্রহে রবিবাসরের অধিবেশনে নানা সময়ে যোগ দিয়েছেন।

রবিবাসরের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক, বাংলাদেশের সকল সাহিত্যিকের সার্বজনীন দাদা রায় জলধর সেন বাহাদুর মহাশয়। তিনি যে কেবল ঔপন্যাসিক ও ভ্রমণ কাহিনী রচনায় বা সাংবাদিকতায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাই নয়, সাহিত্যিক সমাজেও তিনি যে কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন তারই নিদর্শন স্বরূপ তাঁর ৭৮ বৎসরের জন্মদিনের উৎসব (১লা ফাল্গুন, ১৩৪৩) উপলক্ষ্যে কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের লেখা একটি কবিতা এখানে তুলে দিচ্ছি।

বয়োবৃদ্ধের অন্ত নাহিক ভবে,
দাদা তারা-নয় সবে।
সরল প্রাণের সুমধুর রসায়নে
না জানি কি যাদু উপজয় দরশনে,
সেইগুণে তুমি সকলের বরণীয়,
অজাত-বৈরী সুহৃদোত্তম প্রিয়,
সবাকর সুরে প্রাণটি তোমার বাঁধা,
সার্বজনীন দাদা।

সখের দলের সুশাসক অধিকারী,
বর্মা সিগারধারী।
আইন কানুন তোমার মুখের বাণী,
বিধি নিষেধের আর কিছু নাহি জানি।
ইচ্ছা তোমার, এষণা যে আমাদের,
সহজীয়া রীতি, নাহি কোন হেরফের।
পরান তোমার যেন দুধে ধোয়া, সাদা,
তাই এজমালি দাদা।

আঠাত্তরের চৌকাঠে আজি এলে,
ওই দুটি বাহু মেলে
ডাকিলে মোদের তোমার দেহলী পরে.
পঞ্চাশী দল ছুটে আসে তব ঘরে।
পয়লা চৈত্রে একি মৈত্রের মেলা
শ্রদ্ধা পরাগে অভিনব হোরি খেলা।
চরণে তোমার বাঙ্গলার ধূলি কাদা,
শিরে তুলি দাও দাদা।

(বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৪৩)

১৩৪৬ সালে জলধর সেনের মৃত্যুর পর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সর্বাধ্যক্ষ পদে বৃত হন এবং একুশ বৎসরকাল তিনিই সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৩৬৭ সালের ২৪ আশ্বিন খগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবিবাসরের সুদীর্ঘ কালের সর্বজনপরিচিত সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু ২৬শে কার্ত্তিক ১৩৬৭ তারিখে সর্বাধ্যক্ষ হন। তিনি দুই বৎসরের কিছু বেশী সময় সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। ৭ই বৈশাখ, ১৩৭০ সালে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাধ্যক্ষ পদে বৃত হন। এখনও তিনিই সর্বাধ্যক্ষ আছেন।

রবিবাসরের প্রথম সম্পাদক ছিলেন হাওড়ার নীলমণি চট্টোপাধ্যায়। তারপর হন ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
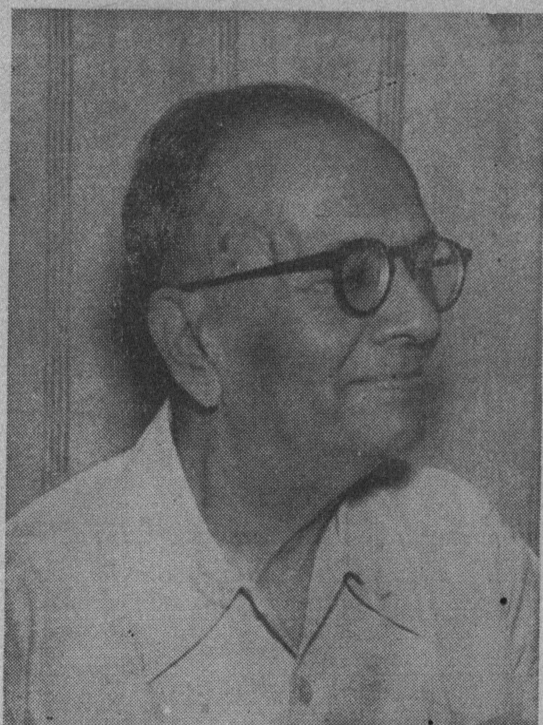
রবিবাসরের দ্বিতীয় সর্বাধ্যক্ষ

স্বর্গত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায়বাহাদুর

১৩৪৬ থেকে ১৩৬৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ একুশ বছর তিনি রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর কার্যকালে রবিবাসর অকল্পনীয় জনসম্বর্ধনা লাভ করে।
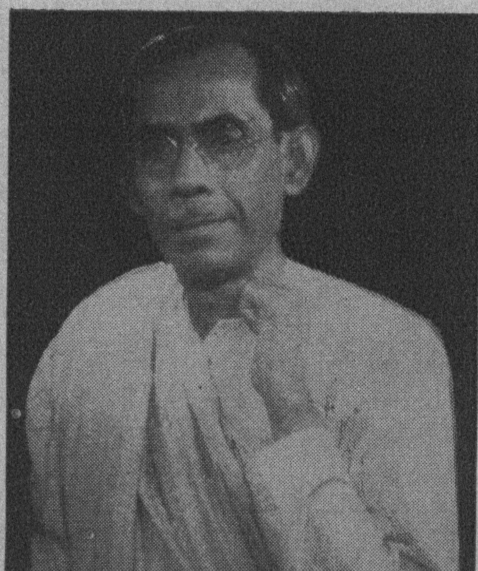
রবিবাসরের তৃতীয় সর্বাধ্যক্ষ
স্বর্গত নরেন্দ্র নাথ বসু

১৩৪১ থেকে ১৩৬৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তিনি রবিবাসরের সম্পাদক ছিলেন। তার পর দুই বৎসর সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন।
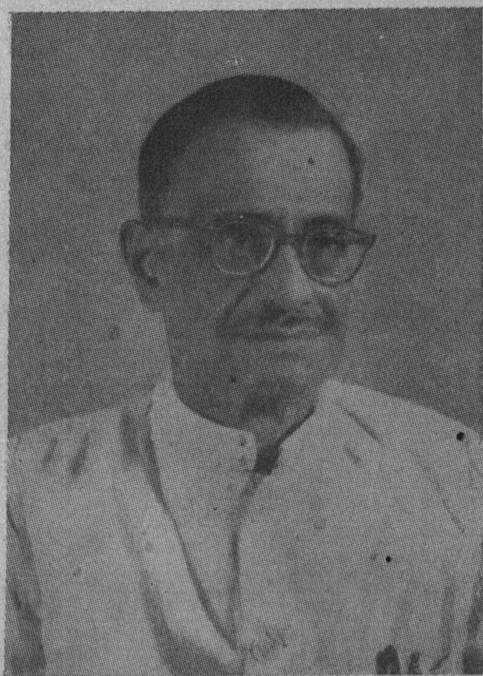
রবিবাসরের বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ
ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৭০ সাল থেকে তিনি সর্বাধ্যক্ষ পদে
অধিষ্ঠিত আছেন।
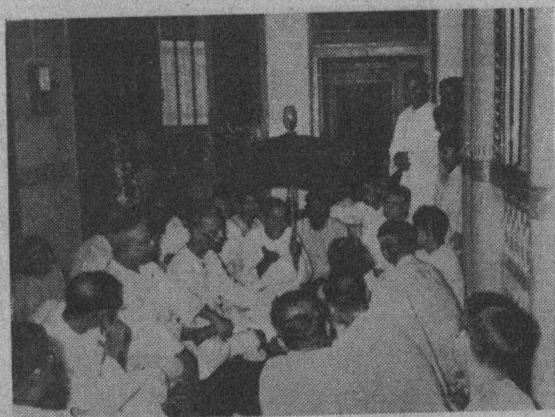
ছত্রপতি উপেন্দ্রনাথ

জোড়াসাঁকোয় প্রবোধচন্দ্র পালের গৃহে অনুষ্ঠিত রবিবাসরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনাসভায় তাঁকে একটি মূল্যবান ছত্র উপহার দেওয়া হয়। চিত্রে তাঁকে ছাতা মাথায় উপবিষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই সভায় কাশী থেকে ওস্তাদ গাইয়ে-বাজিয়ে আনানো হয়েছিল। সাহিত্যপ্রাণ প্রবোধচন্দ্র রবিবাসরের অনেক বিশেষ অধিবেশনই তাঁর গৃহে বা উদ্যানবাটিকায় ডেকেছেন।

কবি শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। পঞ্চম বর্ষ হতে সম্পাদক হন অধুনা-লুপ্ত 'বাঁশরী'-পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু। ১৩৬৭ সালে সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল তিনিই সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দশম বর্ষে তিনি কিছু কালের জন্য বোম্বাই ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতির নয় দশমাস সম্পাদক হয়েছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'রবিবাসর' যে সুদীর্ঘকাল সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলেছে তার পিছনে নরেন্দ্রনাথের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সেবা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সহকারী সম্পাদক হিসাবে সন্তোষকুমার দে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বারো বৎসরেরও বেশী যুক্ত ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলে তাঁর শূন্য স্থানে অস্থায়ী সম্পাদক হন সন্তোষকুমার দে। একমাস পরে স্থায়ী সম্পাদক নির্বাচিত হন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি তিনকড়ি দত্ত মহাশয়। এ সময়েও সহকারী সম্পাদক ছিলেন সন্তোষকুমার দে।

সহকারী সম্পাদক রূপে ঐতিহাসিক সুধীর কুমার মিত্র, অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং রসসাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষও বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছেন। ১৬ই আষাঢ়, ১৩৭০ সালে তিনকড়ি দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করবার পর ২২শে আষাঢ় ১৩৭০, সন্তোষকুমার দে সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং এখনও তিনিই সম্পাদক আছেন।

কবি দিব্যেন্দু লাহা অর্থসচিব হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। কার্য নির্বাহক সমিতিতে আছেন সর্বাধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক সন্তোষকুমার দে,. কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, কবি সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) এবং যতীন্দ্র মোহন মজুমদার।

রবিবাসর সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ সমিতির সভাপতি অশোক কুমার সরকার (সম্পাদক—আনন্দ বাজার পত্রিকা), এবং সদস্যগণ অধ্যাপক অজিতকৃষ্ণ বসু (অকৃব), কুমারেশ ঘোষ (সম্পাদক—

'যষ্টিমধু') এবং সম্পাদক—সন্তোষ কুমার দে। উপদেষ্টা—সর্বাধ্যক্ষ ডক্‌টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্তমান সদস্যগণ (১৩৭১ সালে)—কবি নরেন্দ্র দেব, শিল্পী যোগেশচন্দ্র রায় (শিল্পতীর্থ), প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র পাল, কবি দিব্যেন্দু লাহা, ডক্‌টর বিজন বিহারী ভট্টাচার্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক), অধ্যক্ষ খগেন্দ্র নাথ সেন, জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ (সম্পাদক—নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি), প্রভাত কুমার হালদার, কবি শ্রীকৃষ্ণ মিত্র, সুরেন নিয়োগী (সম্পাদক-সংহতি), যতীন্দ্রমোহন মজুমদার, বীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, কেশব চন্দ্র গুপ্ত, (এডভোকেট), চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (এম, পি,), ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্র, লেডী রানু মুখোপাধ্যায়, চারণ কবি হেমেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায, চাঁদ মোহন চক্রবর্তী, (এডভোকেট), সন্তোষ কুমার দে, নন্দ কিশোর ঘোষ (বার-অ্যাট্‌-ল), কবি সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায, অশোক কুমার সরকার (সম্পাদক—'আনন্দ বাজার পত্রিকা)'. কবি অনিল কুমার ভট্টাচার্য, কবিশেখর কৃষ্ণধন দে, ঐতিহাসিক অপূর্বরতন ভাদুড়ী, মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত), কুমারেশ ঘোষ (সম্পাদক—'যষ্টিমধু'), কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, বিভা সরকার (প্রাক্তন সম্পাদিকা—পি, ঈ, এন্—পশ্চিমবঙ্গ শাখা), ডাঃ শম্ভুচরণ পাল (সম্পাদক—'হাওড়া বার্তা'), কবি রমেন্দ্র নাথ মল্লিক (সম্পাদক — 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা') অধ্যাপক অজিতকৃষ্ণ বসু (অকৃব), প্রাণতোষ ঘটক (সম্পাদক—'মাসিক বসুমতী'), কবিকঙ্কণ হেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক—'বঙ্গীয় কবি পরিষদ'), অধ্যাপক কবি সৌরীন্দ্র কুমার দে, আশাপূর্ণা দেবী, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ), ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক—'ভারতবর্ষ'), ভবানী মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক—'বাণীবিতান'), স্থপতি কবি সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কবি জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (দেড়কড়ি শর্মা), কুমার বিনয়েন্দ্র দেব রায় মহাশয়

(কমিশনার—কলিকাতা করপোরেশন), অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (উপাচার্য, —রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বাংলা বিভাগ), এবং নাট্যকার মন্মথ রায়।

(২)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবিবাসর-এর একজন বিশেষ উৎসাহী সদস্য ছিলেন এবং তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম রবিবাসরের প্রতি আগ্রহী হন। এবার রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করি। বিস্তারিত বিবরণ এবং রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত ভাষণ দেন ও লিখিত বিষয় পাঠ এবং আবৃত্তি করেন তার পূর্ণ বিবরণ আমার লেখা 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' নামক পুস্তকখানিতে পাওয়া যাবে।

রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণগুলি কবিজীবনের বিবিধ তথ্যে পূর্ণ বলেই বিশেষ মূল্যবান। স্বর্গত ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঐ ভাষণ গুলি প্রথমে বাংলা সাংকেতিক লিপিতে লিঁখে নিয়ে পরে সম্পূর্ণ আকারে লিখে কবিকে দেখিয়ে নিয়েছিলেন এবং কবিকর্তৃক সংশোধিত ঐ মূল্যবান ভাষণগুলি এবং কবির লিখিত শরৎচন্দ্রের প্রতি অভিনন্দন সবই রবিবাসরের শ্রদ্ধেয় সদস্য, আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্বর্গত প্রফুল্ল কুমার সরকার মহাশয় সযত্নে আদ্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সুদীর্ঘকাল সেই মূল্যবান ভাষণগুলি দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল এবং স্বভাবতই রবীন্দ্ররচনাবলীতে সন্নিবিষ্ট হয়নি। পরে আমি 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ প্রণয়নকালে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক, রবিবাসরের বর্তমান সদস্য শ্রদ্ধেয় অশোককুমার সরকারের সহৃদয়তায় সেই ভাষণগুলি পুনরুদ্ধার করি। রবীন্দ্রানু-রাগীরা তাই 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকখানিতে ঐ সব ভাষণ, অভিনন্দনপত্র প্রভৃতি পেতে পারবেন।

এখানে রবিবাসরে কবি-প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

রবিবাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে, ৩রা শ্রাবণ ১৩৪৩ তারিখে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আহ্বানে, তাঁর পি ৫৬৬ অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট, কলিকাতা ঠিকানার বাসগৃহে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম রবিবাসরে যোগ দেন। এই দিনের আনন্দময় অধিবেশনের বিবরণ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার 'বিগত দিন' গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিখে গেছেন। বর্তমান গ্রন্থে কবি নরেন্দ্র দেব-ও এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতিকথা লিখেচেন।

কবিকে সেদিন শরৎচন্দ্র নিজের গাড়ি পাঠিয়ে জোড়াসাঁকো থেকে তাঁর বাড়িতে আনেন। কবির ইচ্ছানুসারে তাঁর আগমনবার্তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়, যাতে পথে বা বাড়ির সুমুখে পথচারীদের ভিড় জমে না যায়। এমন কি কবির নির্দেশে তাঁকে কোনরূপ মাল্যদান পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সাধারণ সদস্যদের মতই তাঁকেও সাধারণের মধ্যেই বসতে দিতে হয়েছিল।

কবি 'বলাকা' কাব্য হতে 'ছবি' ('তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা') কবিতাটি স্বকীয় বিশেষ ভঙ্গিতে সেদিন সভায় আবৃত্তি করেন এবং অতি আন্তরিকভাবে একটি সুদীর্ঘ ভাষণে তাঁর নিজের কথা বলেছিলেন। ভাষণটি ঘরোয়া ভাবে বলায় বড়ই মর্মস্পর্শী হয়েছিল। সেই ভাষণটি এই গ্রন্থে পৃথক ভাবে দেওয়া হল।

এই অধিবেশনেই কবি সানন্দে রবিবাসরের অধিনায়ক পদ গ্রহণেও সম্মতি দেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত রবিবাসরের সঙ্গে এই যোগসূত্র রেখেছিলেন।

এর পর দুইমাস অতীত হল। ২৫শে আশ্বিন ১৩৪৩ তারিখে রবিবাসরের বার্ষিক উদ্যান সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ আবার যোগ দেন। সেই অধিবেশনটি হয় 'উদয়ন' পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্যবন্ধু অনিল কুমার দে মহাশয়ের আহ্বানে তাঁর 'প্রফুল্লকানন' নামক বেলেঘাটায় অবস্থিত একটি বাগান বাড়িতে।

এই অধিবেশনের ঠিক পক্ষকালপূর্বে ১১ই আশ্বিন ১৩৪৩ তারিখের অধিবেশনটি বসেছিল 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে, তাঁর জামাতা সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের গৌরীপুর দমদমের 'অলকা' নামক বাগান বাড়িতে। সেটিও ছিল একটি বিশেষ অধিবেশন। শরৎচন্দ্রের ষাট বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় ঐ অধিবেশনে তাঁকে রবিবাসরের পক্ষ হতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনসভায় আসতে না পেরে আহ্বায়ক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিম্নোক্ত পত্রখানি লেখেন—

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

আজ তোমার চিঠি পেলুম। পর্শু তোমাদের অনুষ্ঠান। নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি। পর্শু এখানে কয়েকজন মাননীয় অতিথি আসবেন। যাবার জো নেই। নিজের জরুরি কাজে আমাকে ৮।৯ অক্টোবরের কাছাকাছি কলকাতায় যেতে হবে। তার পরবর্তী রবিবাসরে যদি তোমরা শরতের ষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক করো তবে আমি সশরীরে উপস্থিত থেকে তাঁর অভিনন্দনে যোগ দিতে পারি। পরে পরে দুদিন মাল্যদান করলে তো দোষ নেই। রবিবাসর একদিনেই নিঃশেষিত হবে না। পঞ্জিকাতে লিখচে ১১তারিখেও একটা রবিবারের সমাগম সম্ভাবনা আছে, সেদিন রবীন্দ্রের সমাগমও অসম্ভব হবে না।

ইতি ৯ই আশ্বিন ১৩৪৩

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বিচিত্রা 'কার্ত্তিক ১৩৪৩' পৃঃ ৪২১) সম্পাদকীয় মন্তব্য—'গত ১১ই আশ্বিন রবিবাসরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিচিত্রা সম্পাদককে লিখিত পত্র। রবিবাসরের পরবর্তী অধিবেশনও ১১ তারিখেই পড়িয়াছে, কিন্তু অক্টোবর মাসের ১১ই। উক্ত পত্রের শেষাংশে কবি এই যোগাযোগ লইয়াই কৌতুক করিয়াছেন।'

সম্বর্ধনা সভায় কবি আসতে না পারায় শরৎচন্দ্র মনে দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু কবি শরৎচন্দ্রের মনের ক্ষোভ দুঃখ সবই নিঃশেষে মুছে দিয়েছিলেন পরবর্তী অধিবেশনে তাঁর অমৃতভাষী অভিনন্দন বাণীতে।

কবির পূর্বোক্ত পত্র অনুসারে ব্যবস্থা করা হল। অধিবেশন বসল যথারীতি ঠিক একপক্ষকাল পরে —২৫শে আশ্বিন, রবিবাসরের বার্ষিক উদ্যান সম্মিলন, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এবার কবি শান্তিনিকেতন থেকে আগেই এসে জোড়াসাঁকোয় ছিলেন এবং ঐদিন বেলা ঠিক দশটায় প্রফুল্লকাননে উপস্থিত হলেন। সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন তখনই সভার কাজ সুরু করলেন এবং তাঁর ভাষণে প্রতিবর্ষে এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে রবিবাসরে পাওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন।

সর্বাধ্যক্ষের ভাষণ শেষ হওয়ার পর শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের কাছে ডেকে বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ অভিনন্দন পত্রটি সুললিত ভাষায় পড়লেন এবং নিজের হাতে শরৎচন্দ্রকে সেই অভিনন্দন পত্রটি উপহার দিলেন। শোনা যায়, আজীবন সেই অভিনন্দন পত্রখানি শরৎচন্দ্র নিজের কাছে সযত্নে রেখেছিলেন। এই সুদীর্ঘ অভিনন্দন পত্রখানি আমার 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আদ্যন্ত উদ্ধৃত হয়েছে।

লিখিত ভাষণের পর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন— তাঁর বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ে যেমন এক নতুন ভাবের প্লাবন দেখেছিলেন, তাঁর বৃদ্ধ বয়সে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়ে আবার সেইরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। শরৎচন্দ্র নিজের প্রতিভা বলেই বাংলাদেশের হৃদয় জয় করেছেন।

সেদিন বেলা বারোটার সময় কবি রবিবাসর থেকে বিদায় নেন।

ঐ বছর ৩০শে ফাল্গুন (১৩৪৩) শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরের অধিবেশন আহ্বান করেন। উত্তরায়ন ভবনে সকাল আটটায় অধিবেশন বসে। তার আগের দিন কলকাতা থেকে ৩৮জন

সদস্য একটি সংরক্ষিত কামরায় শান্তিনিকেতনে যান। কবির বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ও ঐ দিন একই গাড়িতে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন।

এই অধিবেশনটি নানাদিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে সদস্যগণকে আপ্যায়িত করেন তাও অতুলনীয়। পরিপূর্ণ বিরবণ 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'বিগত দিন' গ্রন্থে এবং 'বিচিত্রা-র পৃষ্ঠায়, নরেন্দ্রনাথ বসু 'বিচিত্রা' পত্রিকায়, ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় 'পুষ্পপাত্র' পত্রিকায় এবং তৎকালে আশ্রমবাসী অধ্যাপক মোহনলাল মিত্র তাঁর একটি প্রবন্ধে '(রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে) এই অধিবেশনটির কথা বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন।

এই অধিবেশনে সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন একটি চমৎকার ভাষণ দেন। কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা নিজ নিজ কবিতায় রবিবন্দনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে একটি সুদীর্ঘ ভাষণে আশ্রম সম্পর্কে তাঁর চিন্তা, চেষ্টা ও কর্মপদ্ধতির বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বলেন। রবীন্দ্রজীবনীর পক্ষে ঐ ভাষণটিও অত্যন্ত মূল্যবান। 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ঐ ভাষণটিও আদ্যন্ত দিয়েছি।

এর পর যতদিন রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন তাঁকে রবিবাসরের সম্পর্কে নিয়মিত জানানো হত। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তিনি তারপর আর কোনও অধিবেশনে যোগ দিতে আসতে পারেন নি। তবে আজীবন তিনি রবিবাসরের অধিনায়ক ছিলেন, তাঁর তিরোধানের পর এখনও রবিবাসরের স্বর্গত অধিনায়ক হিসাবে তাঁর নাম সগৌরবে উল্লিখিত হয়। ঐ শূন্যস্থানে আর কারো নাম গৃহীত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের দিন ২২শে শ্রাবণ হতে পূর্ণ একবৎসর কাল রবিবাসরের প্রতিটি অধিবেশনে কবির অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কেবল রবীন্দ্রনাথের বিষয়েই প্রবন্ধ ও কবিতাদি পঠিত ও আলোচিত

হয়েছিল এবং তাতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিবৎসরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে রবিবাসরের বিশেষ অধিবেশন হয় এবং ১৩৬৮ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীও যথোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছিল।

আজ রবীন্দ্রনাথ নেই, তাঁর অমর স্মৃতি রবিবাসর সগৌরবে বহন করছে। এমন কথাও মনে হয়, বুঝি 'রবি-বাসর' রবীন্দ্রনাথেরই বাসর। কবি যে কথা একদা রবিবাসরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন সেকথাও আমরা সশ্রদ্ধ অন্তরে স্মরণ করি—

"যতদিন তোমাদের এই 'রবিবাসর' বেঁচে থাকবে ততদিন তোমরা এর ভিতর দিয়ে দেশের মধ্যে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করবে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে দেবে।..."

(৩)

রবিবাসরে শরৎ চন্দ্রের একষষ্ঠিতম জন্মদিনের উৎসব গৌরীপুর দমদমে 'অলকা' উদ্যানবাটিতে ১১ই আশ্বিন ১৩৪৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ সম্বর্ধনা সভায় আহ্বায়ক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একটি গানে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানানো হয়। গানটি উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে সেদিন গেয়েছিলেন কুমারী মায়া বন্দোপাধ্যায়। গানটি এই—

(দেশ একতালা)

নন্দিত ভূমি-শরৎচন্দ্র
বন্দিত তুমি হে রূপকার!
মানব মনের গহন বনের
হে মহাসাধক কল্পনার।
চিত্তকাননে শেফালি করবী,
অপরূপ রূপে ফুটাইলে কবি,
নিকষ-নিবিড় তিমির গগনে
বিরচিলে ছবি চন্দ্রমার।
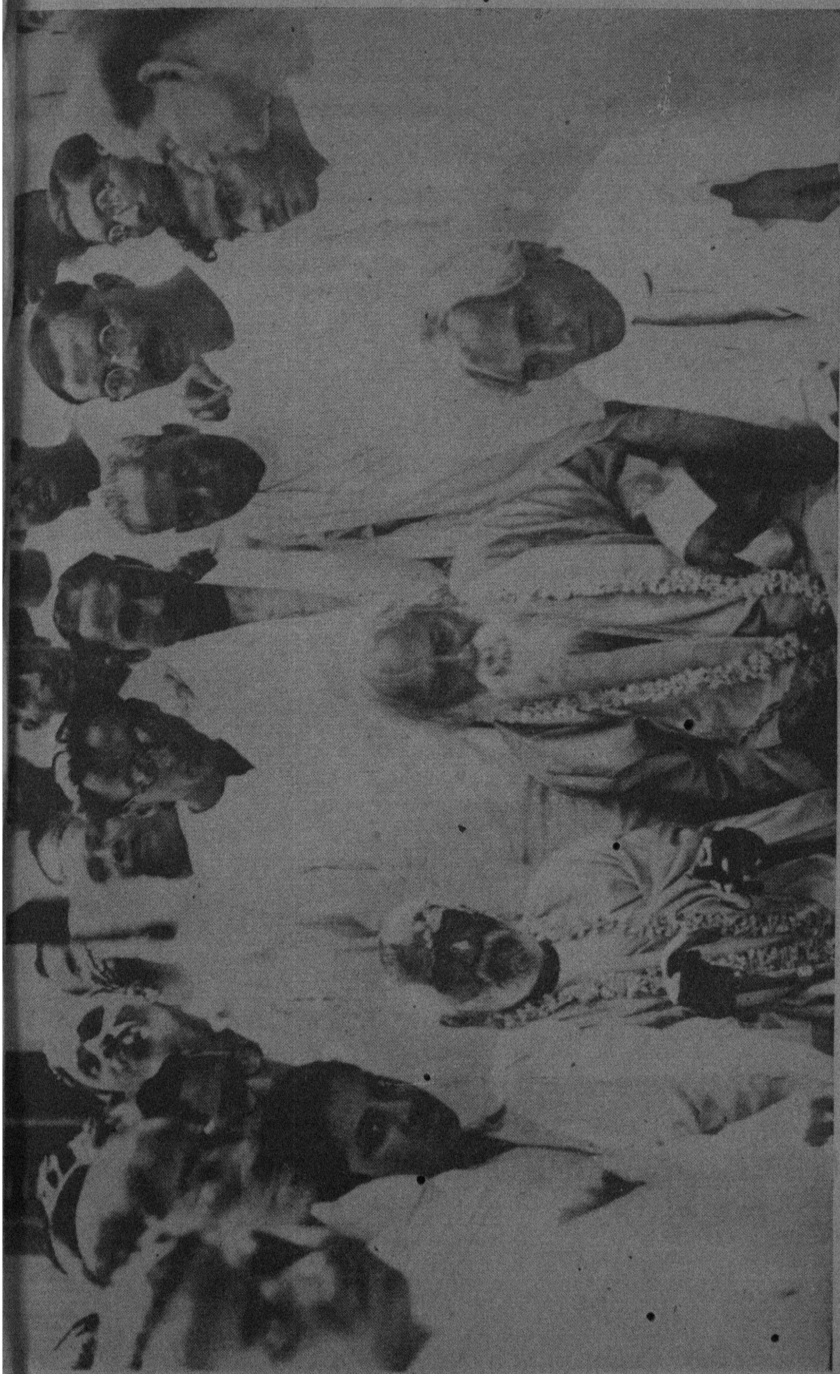
রবিবাসরে শরৎ-সম্বর্ধনায়—সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন, সর্বাধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের ঠিক পশ্চাতে আহ্বায়ক অনিলকুমার দে

পঙ্কের মাঝে ছিল্ যে মলিন
করিলে তাহারে পঙ্কজিনী,
তোমার প্রভায় পাপ মেঘ গায়
জাগিল সুপ্ত সৌদামিনী !
হে মরমী সখা বন্ধু সুজন,
লহগো মোদের এ প্রীতি পূজন
লহ প্রণয়ের মিলিত মনের
রবি-বাসরের নমস্কার ।

উপেন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি, মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি শরৎচন্দ্রকে দেখতে গেলে শরৎচন্দ্র তাঁকে এই গানটি একবার গেয়ে শোনাতে অনুরোধ করেন। উপেন্দ্রনাথ গানটি গাইতে লাগলে শরৎচন্দ্রের চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রুপাত হতে থাকে। গানটি এবং গায়ক উভয়েই তার কাছে এতই প্রিয় ছিল। কিন্তু কেবল নিকট আত্মীয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নন, রবিবাসরের অন্যান্য অনেক সদস্যই শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। কবি নরেন্দ্র দেব তাঁদের অন্যতম।

সেদিন রবিবাসরের পক্ষ হতে তৎকালীন সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু নিম্নোক্ত অভিনন্দনবাণী পাঠ করেন:

রবিবাসরের অন্যতম সদস্য বাংলার অনন্যসাধারণ কথাসাহিত্যিক
ডাঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়কে তাঁহার একষষ্টিতম জন্মদিনোৎসবে
রবিবাসরের সদস্যগণ প্রদত্ত
অভিনন্দন

হে প্রতিভাবান্!

বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে, তোমার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনই অপ্রত্যাশিত। চন্দ্রের বিভিন্ন কলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। কিন্তু, হে শরৎচন্দ্র! তোমার কোনো ক্রমবিকাশ আমরা দেখিনি। সাহিত্য-গগনে তুমি যেমন প্রথম উদয় হয়েছিলে,

তোমাকে আমরা একেবারেই ষোলকলায় সসম্পূর্ণ দেখেছি, দেখে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় তোমাকে আমাদের আনন্দ অভিনন্দন জানিয়েছি। আজ আবার তোমার এই একষষ্টিতম জন্মদিনে তুমি আমাদের সেই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

হে শক্তিমান!

তোমার রচিত সাহিত্য আমাদের শিখিয়েছে মানুষকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে, শিখিয়েছে বিপথগামীর বিভ্রান্তিতে সমবেদনা জানাতে। মন্দের যে সবটুকুই মন্দ নয়, কলঙ্কপঙ্কের মধ্যেও যে পঙ্কজিনীর উদ্ভব সম্ভব, তোমার আগে এমন করে এসত্য আর কেউ আমাদের জানায়নি। হে শরৎচন্দ্র! মানব মনস্তত্বের নিগূঢ় রহস্য তুমি আমাদের সম্মুখে মেলে ধরেছ, অবজ্ঞাতা নারীর অন্তররূপের বিস্ময়কর সন্ধান তুমিই আমাদের প্রথম দিয়েছ; তোমার কল্পনার অননুকরণীয় সংযম, তোমার ভাবঘন ভাষার অনির্বচনীয় ইঙ্গিত, তোমার রচনার আন্তরিকতার রমণীয় রাগ, আমাদের সাহিত্য-লক্ষ্মীর সৌন্দর্যকে মনোহর করে তুলেছে।

হে প্রিয়তম সুহৃদ!

রবিবাসরের সাহিত্য-বন্ধুসভায় তোমাকে আমাদের মধ্যে লাভ করে আমরা ধন্য হয়েছি। তোমার গৌরবে আমরা নিজেদেরও গৌরবান্বিত বোধ করি। তুমি শতায়ু হও এবং সুখে স্বাস্থ্যে আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন কর, আজকের শুভদিনে এই আমাদের সকলের আন্তরিক প্রার্থনা। তোমাকে নমস্কার।

কলিকাতা
১১ আশ্বিন ১৩৪৩

তোমার প্রীতিমুগ্ধ
রবিবাসরের সভ্যগণ

এই সভায় বিখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল, কুমারী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী অসীমা শেঠ ও কুমারী আভাময়ী বসু সঙ্গীত পরিবেশন করেন, কৌতুকাভিনয় করেন নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কুমারী রমা গঙ্গোপাধ্যায় এসরাজ বাজিয়ে শোনান এবং সাওতালী ও সাপুড়িয়া নৃত্য প্রদর্শন করেন কুমারী দীপিকা দে। সভা অপরাহ্ণ ৪॥ টায় সুরু হয়ে শেষ হয় নৈশ ভোজ-অন্তে।

শরৎচন্দ্র যখন পানিত্রাসে থাকতেন তখন রবিবাসরে আসতে পারতেন না। কিন্তু তিনি এলে জমিয়ে গল্প জুড়ে দিতেন। আসলে তিনি ছিলেন একজন পরম মজলিসী মানুষ।

রবিবাসরের খাতায় তাঁর স্বাক্ষরেও বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি লিখতেন 'শ চট্টোপাধ্যায়' কিন্তু দেখাতো যেন 'শচট্টোপাধ্যায়'। আর কোথাও তিনি এরূপ স্বাক্ষর করেছেন বলে শুনিনি।

২রা মাঘ, ১৩৪৪ তারিখে শরৎচন্দ্রের তিরোধান ঘটে, সেদিন ভবানীপুরে হাজরা পার্কের নিকটে রবিবাসরের অধিবেশন বসেছিল। এই দুঃসংবাদ সভায় ঘোষিত হলে অধিবেশন মুলতুবি রেখে সকল সদস্য শরৎচন্দ্রের গৃহে যান এবং আবার রবিবাসরে ফিরে এসে এক মিনিট কাল অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। যখন তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত করা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই রবিবাসরে তাঁর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছিল। এমন অপূর্ব যোগাযোগ কদাচিৎ ঘটে। রবিবাসরই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান যারা সেই দিনই শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে। শরৎ স্মৃতিরক্ষা তহবিলেও রবিবাসর হতে সদস্যগণ যথাসাধ্য সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। এখনও রবিবাসরে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা করা হয়।

পল্লীবাংলার পালপার্বণ

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি. এইচ. ডি

বাংলা কৃষিভিত্তিক দেশ, সেইজন্য কৃষিকর্ম দ্বারাই যেমন এর অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে, তেমনই কৃষিকর্ম ভিত্তি করেই তার প্রধান প্রধান লৌকিক উৎসবগুলোও গড়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাব বশতঃ কৃষি কর্মের এই মৌলিক সংস্কার অনেকখানি প্রচ্ছন্ন হয়ে গেলেও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে এখনও এদেশের কৃষি-সংস্কৃতির ধারাটির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কৃষিকর্মের দুটি প্রধান অবলম্বন, প্রথমতঃ পৃথিবী, দ্বিতীয়ত সূর্য। আদিম সমাজের সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে সূর্যই প্রধানতঃ কৃষিকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সূর্যই অনাবৃষ্টির কারণ, অনাবৃষ্টিই কৃষিকর্মের শত্রু। কৃষিকর্মের দ্বিতীয় অবলম্বন পৃথিবী, কারণ, পৃথিবীর উপরেই শস্য জন্ম লাভ করে।' সুতরাং নানা ভাবে পৃথিবীকে প্রসন্ন করতে না পার্‌লে তা'র কাছ থেকে শস্য পাবার আশা করা যায় না। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে এখনও যে সকল পাল পার্বনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে এই দুটি বস্তুই মূলতঃ লক্ষ্য হয়ে থাকে। এমন কি বাংলার পল্লীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে উৎসব গাজন, তাতে সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর একটি আনুষ্ঠানিক বিবাহের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। আদিম সমাজের এই বিশ্বাস ছিল যে সূর্যের সঙ্গে পৃথিবী যথাসময়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হলে পৃথিবী শস্য-প্রসবিনী হতে পারে না। সেইজন্য গ্রীষ্ম যখন অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠে পৃথিবীর শস্যসম্ভাবনা বিলুপ্ত করে দিতে উদ্যত হয়, তখনই সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর

বিবাহোৎসবের অনুষ্ঠান করে সূর্য-তেজকে প্রশমিত করবার উপায় সন্ধান করা হয়।

বাংলার পল্লীসমাজের একটি প্রধান উৎসব সর্পপূজা, তা' মনসা পূজা বলে সর্বত্র পরিচিত। কারণ, সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনসা। মনসা পূজার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, তাও মূলতঃ পৃথিবীরই পূজা। মনসা যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই সর্প মাটির মধ্যে গর্তে বাস করে। বর্ষার প্রারম্ভে মাটির নীচ থেকে তারা বেরিয়ে আসে, আবার বর্ষার শেষে মাটির নীচে গিয়ে আশ্রয়লাভ করে। সুতরাং সর্পকে মাটি বা পৃথিবীরই প্রাণরূপ বলে কল্পনা করা হয়, সেই অর্থে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার পূজাও পৃথিবীরই পূজা। এ' কথা অনেকেই মনে করেন, দেবী মাত্রই পৃথিবী বা ধরিত্রীর প্রতীক এবং আদিম বিশ্বাসে পুরুষ দেবতা বল্‌তে একমাত্র সূর্যকেই বুঝায়। সূর্য পৃথিবীর প্রত্যেক কৃষিজীবী জাতিরই মৌলিক দেবতা, তবে প্রত্যেক দেশেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁর চরিত্রের পরিকল্পনা বিভিন্ন হয়ে থাকে।

পল্লীবাংলায় এখনও অসংখ্য পাল পার্বনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তবে অর্থনৈতিক কারণে এ'দের আগেকার আড়ম্বর আর নেই, এ'কথা সত্য। অনেক ক্ষেত্রে নিয়মরক্ষা মাত্র করা হয়ে থাকে। সম্পন্ন গ্রাম-বাসীরা সহরে চ'লে আসার জন্য এ সব ক্ষেত্রে আর বড় উৎসাহ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎসবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। বছরের প্রথম মাস থেকেই আরম্ভ করা যাক।

বৈশাখ মাসে পল্লীবাংলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ধর্মঠাকুরের গাজন। তবে তা পশ্চিম বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, তথাপি অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের দিক দিয়ে বিচার করলে এ'র চাইতে উল্লেখযোগ্য উৎসব এ' সময়ে আর নেই। ধর্মঠাকুর আদিম

জাতির সূর্য দেবতা। পশ্চিম বাংলার, প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলের, ডোম জাতি এই অঞ্চলের এক অতি আদিম জাতির বংশধর। তাদের মধ্যে এই পূজার ধারা দীর্ঘ দিন ধরে চ'লে আসছে ; এই অঞ্চলের উপর ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দু প্রভাবের ফলে এই সকল বিভিন্ন ধর্মের কিছু কিছু বিভিন্নমুখী উপকরণ তার উপর স্তরে স্তরে এসে সঞ্চিত হয়, তার ফলে কখনও এই উৎসবকে বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান, কখনও জৈন ধর্মানুষ্ঠান, কখনও বা হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান ব'লে মনে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে ডোমজাতির যে মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে, তা থেকেই তার আদিম প্রকৃতি প্রকাশ পায়।

ধর্মঠাকুরের গাজন সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই অনুষ্ঠিত হয়, তবে তার ব্যতিক্রমও আছে। ক্বচিৎ তা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেও হতে দেখা যায়। তবে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই এই উৎসব সর্বাধিক অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মঠাকুর একটি শিলাখণ্ড মাত্র, বাৎসরিক পূজার দিন আনুষ্ঠানিকভাবে শিলা-খণ্ডটিকে ইহার 'মন্দির' থেকে বাইরে এনে বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ বাদ্যভাণ্ড সহযোগে গ্রামের কোন পুকুর কিংবা বাঁধের জলে স্নান করানো হয়। ধর্মঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী হয় তারা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এই সকল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। গাজনে সন্ন্যাসী হলে তা'র আর কোন জাতের বিচার থাকে না, সকল দেবকর্মেই তার অধিকার জন্মায়। ডোম জাতির লোকই এই সকল অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ক'রবার অধিকারী, তবে কোন কোন গ্রামে ব্রাহ্মণের অধিকারেও এ কার্য স্থাপিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ডোম দেয়াসীর কাজ করে, মন্দির কিংবা দেব-সেবার অধিকার সে কোন দিক থেকেই পরিত্যাগ করে না। চৈত্র সংক্রান্তির সময় যে শিবের গাজন হয়, তা' আগে ধর্মঠাকুরের গাজনই ছিল, কারণ, চড়ক ধর্মঠাকুরের পূজার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত, শিব পূজার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। চড়ক সূর্য পূজারই একটি অঙ্গ, শিবপূজার অঙ্গ নয়। চড়ক

গাছের উপর শূন্যে চক্রাকারে যে আবর্তন করতে দেখা যায়, তা' সূর্যেরই পরিক্রমণের রূপক মাত্র। বছরের শেষ দিনে সূর্যকে তার নূতন গতিপথে শক্তি দেবার জন্য কোন প্রতীককে শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তা'কে ইংরাজিতে sympathetic magic বলে। চড়কে যে লোকটিকে শূন্যে বেঁধে দিয়ে আজকাল ঘুরান হয়, আগে তার শির দাঁড়ার ভিতর দিয়ে বঁড়শী বিঁধিয়ে শূন্যে এমনিভাবে ঘুরানো হ'তো। তার ফলে তার মৃত্যু হ'লে সকলে মনে করত সূর্যদেব নরবলি গ্রহণ ক'রেছেন, ফলে সে বৎসর শস্যোৎপাদন বেশি হ'বে। সহজেই বুঝতে পারা যায়, শিবের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের কোন যোগ নেই, সূর্যের সঙ্গেই তার যোগ থাকবার কথা। অথচ যে উৎসবে আজকাল এই অনুষ্ঠানটি হ'য়ে থাকে, তা শিবের গাজন ব'লে পরিচিত। চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবটি সূর্যেরই উৎসব। যে দিন সূর্য দ্বাদশ রাশির পথে যাত্রা শেষ ক'রে এসে যাত্রাপথে পুনর্বার পদক্ষেপ করবার জন্য প্রস্তুত হন এই দিনটি পৃথিবীব্যাপী কৃষিজীবী সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য সূর্যোৎসব। হিন্দু প্রভাবের জন্য আদিমজাতির সূর্য্যদেবতার পরিবর্তে পৌরাণিক শিবের নাম এর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একে শিবের গাজন ব'লে পরিচিত ক'রেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্মের গাজন এবং শিবের গাজনে কোন পার্থক্য নেই। তবে বৈশাখ মাসের ধর্মের গাজনের মধ্যে আদিম সমাজের ধর্মবোধের কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ এখনও প্রকাশ পায়, শিবের গাজনের কোন কোন অংশে হিন্দুপ্রভাব অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠেছে।

ধর্মের গাজনের একটি প্রধান অঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মশিলার স্নান। ইংরেজিতে একেও sympathetic magic বলে। এর উদ্দেশ্য, বৈশাখ মাসে যখন অনাবৃষ্টি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তখন সূর্যের প্রতীক ধর্মঠাকুরের শিলারূপটিকে জলে স্নান করিয়ে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করা। ধর্মঠাকুরের একটি

প্রধান গুণ, তিনি বন্ধ্যা নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে পুত্র-সন্তান দান করেন। পৃথিবীব্যাপী আদিম সমাজের বিশ্বাস সূর্য উর্বরতার দেবতা (fertility god), তা পৃথিবীর পক্ষে যেমন সত্য, নারীর পক্ষেও তেমনই সত্য। সেইজন্য নিঃসন্তানা নারীরা সন্তান কামনায় ধর্মঠাকুরের নিকট ধরনা দিয়ে থাকে। শিবের নিকট পুত্র বর কামনার কোন অর্থ হয় না, এখানে আদিম সমাজের সূর্যই হিন্দু প্রভাব বশতঃ পৌরাণিক শিব রূপে কল্পিত হ'যে থাকেন। আগে যে কথা ব'লেছি, তা থেকে বুঝতে পারা যাবে, ধর্মঠাকুরের গাজনেই চড়ক হওয়া সঙ্গত, শিবের গাজনে নয়। তবে এই অঞ্চলের অধিবাসীর উপর ক্রমাগত হিন্দু প্রভাবের ফলে শিবের নামে প্রচলিত চৈত্র সংক্রান্তির গাজনেই আজ-কাল চড়ক হ'চ্ছে বলে ধর্মের গাজনে তার অনুষ্ঠান বড় একটা চোখে পড়ে না, তবে পুরুলিয়া জেলার কোন কোন গ্রামে এখনও বৈশাখী পূর্ণিমায় যে ধর্মের গাজন হ'যে থাকে, তাতে চড়ক হ'তে দেখা যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে একটি কৃষি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তার নাম রহিণ পূজা। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম তের দিন ধরেই এই পুজো চলে, পূজার শেষ দিন, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশ দিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে কৃষকেরা সেদিন বৎসরের প্রথম বীজ বপন করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম থেকেই প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রতিসন্ধ্যায় রহিণ পূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। রহিণ পূজা গ্রামের বারোয়ারী পূজা নয়, প্রত্যেক গৃহস্থই স্বতন্ত্রভাবে নিজগৃহে তার অনুষ্ঠান করে থাকে। বীজ বপনের পূর্বে ধরিত্রীমাতাকে প্রসন্ন করাই এই পূজার উদ্দেশ্য। এই পূজার একটি বিশেষ আচার লক্ষ্য করবার মত। পুজোর জায়গায় একটি থালায় করে কয়েকটি টিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাতে প্রচুর ধুনো দেওয়া হয়। ধূপর বা পুরোহিত এসে প্রথমই সেই আগুনের থালাটি শুকে নেবে, তারপর এক নিঃশ্বাসে জ্বলন্ত টিকেগুলোর ভিতরকার আগুন নিভিয়ে দেবে। তারপর মনসার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়। আগেই বলেছি, সর্পের অধিষ্ঠাত্রী

দেবী মনসাকেও ধরিত্রীরই প্রতীক্ বলে মনে করা হয়। রহিণ পূজা উপলক্ষেই পশ্চিমবাংলার প্রসিদ্ধ লোক-সঙ্গীত সাথীগানও শুনতে পাওয়া যায়।

আষাঢ় মাসের একটি প্রধান কৃষি-উৎসব—অম্বুবাচী। নূতন বর্ষার সূচনায় পৃথিবী ঐ সময় রজঃস্বলা হয়ে থাকে বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস। হিন্দু মুসলমান কোন কৃষকই তখন হাল চাষ করে না, মাটি খুঁড়ে না। ধরিত্রী উপাসনার প্রত্যেকটি অঙ্গের সঙ্গেই কোন না কোন উপায়ে সর্পের সম্পর্ক আছে, অম্বুবাচী উপলক্ষে বৎসরব্যাপী সর্পের দংশন নিরোধ করবার জন্য কতকগুলো ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করা হয়। কারো কারো বিশ্বাস, অম্বুবাচীতে আমদুধ খেলে সে বৎসর সর্পে দংশন করতে পারে না। অম্বুবাচী উপলক্ষে সর্ব নদনদীই রক্তধারা বহন করে, একমাত্র করতোয়া নদীই জলধারা বহন করে বলে সে সময় করতোয়া স্নান অনেকে কর্তব্য বলে মনে করে। উত্তর বাংলায় করতোয়া নদীর তীরে তীরে অম্বুবাচীর তিনদিনও বিরাট মেলার অধিবেশন হয়, কোন কোন স্থানের মেলা কোন কোন কারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই উপলক্ষে কামাখ্যা তীর্থ দর্শনও পুণ্য কর্ম বলে মনে করা হয়। পাহাড়ের উপর যে অক্ষয় প্রস্রবন কামাখ্যা বলে পূজিত হন তাতে তখন রক্তধারা প্রবাহিত হয় বলে সাধারণের বিশ্বাস। আষাঢ় মাসে পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি জনপ্রিয় উৎসব—বড়ো পাহাড়ের পূজা। সাঁওতাল জাতির প্রধান দেবতা (Supreme God)-এর নাম মুরাঙ বুরো। তারই পূজা সাঁওতাল এবং সাঁওতাল প্রভাবিত বাংলা ভাষাভাষী সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। সন্তান কামনায়, কোন দূর দেশে যাত্রাকালে, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ কামনায় বড়ো পাহাড়ের পূজা হয়। পূজা এবং মেলায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অংশ গ্রহণ করে। পাহাড়ের পূজাও পৃথিবী পূজারই একটি রূপ মাত্র।

আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিনে গৃহস্থের ঘরে ঘরে মনসার ঘট

স্থাপন করা হয়, সমগ্র শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়া সেই ঘটে মনসার পূজা হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বিশেষ পূজার পর দিনে দেবীর ভাসান হয়। মনসা পূজা বাংলার জাতীয় উৎসব বলে উল্লেখ করা যায়। পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর বাংলায় এর মত ব্যাপক উৎসব আর মাত্র দু'টি আছে, একটি গাজন, আর একটি পৌষ-পার্বণ। সুতরাং মনসা-পূজা পল্লী বাংলার তিনটি প্রাচীন উৎসবের অন্যতম। তবে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই পূজার রূপ বিভিন্ন। পশ্চিম বাংলায় ঘটে দেবীর পূজা হয়, পূর্ব বাংলায় প্রতিমায় পূজা হয়। কোন কোন স্থানে যমজ মনসার গাছের নীচেও তাঁর পূজা হয়। মনসার সঙ্গে মুখ্য সম্পর্ক সর্পের। আগেই আলোচনা করেছি, সর্পের সঙ্গে ধরিত্রীর সম্পর্ক অতি নিকট; সুতরাং মনসা পূজাও এক অর্থে ধরিত্রীরই পূজা। পশ্চিম বাংলার, বিশেষতঃ বীরভূম জেলায় ভাদ্র মাসেও মনসা পূজা হয়, তা'কে ভাদুলে মনসা বলে। শ্রাবণ মাসে যে অঞ্চলে যে মনসার পূজা হয়, তার নাম শাওডালে মনসা। মনসা বর্ষা কালেই পূজিতা হয়ে থাকেন, কারণ, বর্ষাকালেই সর্পভয় বেশী। যে অঞ্চলে বর্ষা বিলম্বিত হয়, সেই অঞ্চলেই মনসা পূজা ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ভাদ্র মাসে পশ্চিম বাংলা, বিশেষত পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পল্লী অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উৎসব ভাদু পূজা। প্রকৃতপক্ষে ভাদু পূজা পল্লীবাংলার বর্ষা উৎসব। ইনি ভাদ্র মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে ভাদু বলে উল্লিখিত হয়ে থাকেন। ভাদ্র মাসে বর্ষাসিক্ত ধরিত্রীর রূপ পল্লীর কুমারী হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলে এই পূজার জন্য রচিত গীতি অর্থের ভিতর দিয়ে তারই আনন্দ যেন স্বতঃ স্ফূর্ত হয়ে পড়ে। এই পূজা প্রধানতঃ পরিবারের কুমারী এবং সদ্য বিবাহিতা বধূদেরই পূজা। সারা ভাদ্র মাসে রাত্রি জেগে ভাদুর মৃৎ প্রতিমা সামনে রেখে মুখে মুখে গান রচনা করে তারই অঞ্জলি ও তাঁর পূজা হয়। আজকের গান কালকে বাসি হয়ে যায়, প্রতিদিন

নূতন নূতন গান মুখে মুখে রচিত হয়ে ভাদুর গুণ কীর্ত্তন করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মনের অনেক গোপন কথাও মনের ভিতর থেকে বাইরে ছুটি পায়।

আশ্বিন মাসে যে দুর্গোৎসব হয় তা কোনদিনই পল্লীবাংলার জনসাধারণের উৎসব বলে গণ্য হ'তে পারেনি। মধ্যযুগে সামন্ত রাজাদিগের মধ্যে এবং জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের পর প্রত্যেক জমিদার পরিবারে এই পূজার প্রচলন ছিল, জনসাধারণ তার সঙ্গে নিবিড় যোগ অনুভব করতে পারত না। আধুনিক জীবনকে কেন্দ্র করে এই পূজা নাগরিক সমাজেই ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু পল্লীসমাজ তা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় নি। বিশেষতঃ জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীতেও দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান সংখ্যায় অনেক কমে এসেছে, শহরেই 'সর্বজনীন' বলে পরিচিত পূজার সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও পল্লীজীবন তা দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছে, এ' কথা বল্‌তে পারা যায় না।
দুর্গোৎসবের কতকগুলো লৌকিক উপকরণ আছে, তা' প্রথমতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীনভাবেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনুষ্ঠিত হতো। কালক্রমে শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতি তাদের উপর আরোপ করবার ফলে তাদের মৌলিক পরিচয় আজ অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে।

দুর্গোৎসব পল্লীবাংলার সাধারণ জনগণের জাতীয় উৎসব না হলেও আশ্বিন মাসে বাংলার পল্লীতে কতকগুলো বিশেষ উৎসবেরও অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় বিজয়া দশমীর দিনে ভৈরব এবং রঙ্কিনী পূজার অনুষ্ঠান হয়। সেই অঞ্চলের পল্লীবাসীর তাই শারদোৎসব। ভৈরব পূজার একটি প্রধান অঙ্গ কাঠি নাচ। এই সময় কাঠি নাচের ব্যাপক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ভৈরব ভয়ঙ্কররূপী (malignant) দেবতা, তাকে তুষ্ট করবার জন্য কাঠি নাচ প্রয়োজন। কাঠি নাচ কোন যুদ্ধ নৃত্যেরই অবশেষ। একদিন যখন সমাজে গোষ্ঠী-সংগ্রাম (community war) প্রচলিত ছিল, তখন ভৈরব

দেবতাকে নৃত্য দ্বারা সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে সংগ্রামে জয়লাভ করবার জন্য শক্তি প্রার্থনা করা হতো। কাঠি (stick) যুদ্ধাস্ত্রের প্রতীক। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কাঠি নৃত্য অধঃপতিত হয়ে নারীর বেশ ধারণ ক'রে পুরুষের নৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পায়ে ঘুঙুর পরে পুরুষেরা নারী সেজে নাচে, নাচের সঙ্গে সঙ্গে যে গান চলে, তাদের বিষয় কৃষ্ণলীলা নতুবা রামলীলা। সুতরাং মনে হয়, বাইরে থেকে এদের উপর কিছু প্রভাব এসে পড়েছে।

আশ্বিন মাসে বিজয়াদশমীর রাত্রে পূর্ববাংলার কোন কোন অঞ্চলে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে 'নারিকেল খেলা' নামে একটি উৎসব পালন করে। তার সঙ্গেও দুর্গোৎসবের কোন সম্পর্ক নাই। নারিকেল ভাঙ্গা নিয়ে প্রতিযোগিতা এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। তার আর কোন ধর্মীয় রূপ নাই। দুর্গোৎসবের যে দুর্গাদেবীর পূজা করা হয়, তিনি ধরিত্রীরই প্রতীক্, ও মহিষাসুর অনাবৃষ্টির প্রতীক। অনাবৃষ্টিরূপ অসুরকে প্রতি বৎসর বিনাশ করতে না পারলে ধরিত্রীর শস্যসম্পদ লাভের কোন আশা নেই। সেইজন্য ধরিত্রীরূপিনী দুর্গা অনাবৃষ্টির অসুররূপী মহিষকে বিনাশ করেন।

কার্ত্তিক মাসে পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে, তাকে গরয়া উৎসব বলে। এই উৎসবটি পল্লাবাংলার গো-পূজার একটি রূপ। কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে যেদিন বাংলার সর্বত্র উচ্চতর জাতির মধ্যে শ্যামা পূজার অনুষ্ঠান হয়, সে দিনই গরয়া উৎসবেরও তিথি। একে বাদনা পরব বলে। এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ গরু বা মহিষ 'নাচানো'। শক্ত খুঁটিতে একটি বলিষ্ঠ মোষ কিংবা ষাঁড়কে বেঁধে তাকে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষিপ্ত করে তোলাই এ'র উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষ্যে ক্ষিপ্ত পশুটাকে ঘিরে উচ্চ বাদ্যভাণ্ড সহযোগে নৃত্যগীত চলতে থাকে। গীতের মধ্যে কপিলা গাভীর জন্ম বৃত্তান্ত শুনতে পাওয়া যায়। আরও নানাভাবে গো-মহিষ কীর্ত্তন করা

হয়। এই উৎসবের দিনে ভোর বেলায় গোরুকে নিয়ে গোয়ালে গোয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে জাগানো হয়, জাগানো উপলক্ষে বাদ্যভাণ্ড সহ নৃত্য গীত চল্‌তে থাকে।

কৃষিকর্মের প্রধান সহায় গো-জাতি। কেবলমাত্র হিন্দুর সনাতন শাস্ত্রের নির্দেশে নয়, কৃষিকর্মে গো-জাতির দানের কথা স্মরণ ক'রে স্বভাবতই এই সকল উপায়ে তার প্রতি কৃষিজীবী সমাজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।

কৃষিজীবী প্রাচীন সমাজ মাত্রেরই অগ্রহায়ণ মাস বছরের প্রথম মাস। বাংলাদেশেও একদিন তাই ছিল, সেইজন্য অগ্রহায়ণ মাসের এই প্রকার নামকরণ হ'য়েছিল। অগ্রহায়ণ মাসকে মার্গশীর্ষ বলা হয়, বৎসরের তা' শ্রেষ্ঠ মাস। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'মাসানাং মার্গশীর্ষোহং ঋতুণাম্ কুসুমাকরঃ।' মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ দাসও বলেছেন, 'মাসমধ্যে মাইসর আপনি ভগবান্।' এই মাস বছরের নূতন ফসল ঘরে এনে তোলবার মাস, এই মাস নবান্ন উৎসবের মাস। কৃষিভিত্তিক সমাজের এর চাইতে আনন্দের সময় আর কিছুই হ'তে পারে না। তবে একথাও সত্য এ মাস উৎসবের মাস নয়, কারণ এই মাসে ধান কেটে ঘরে এনে তোলার জন্য প্রত্যেক কৃষক এবং কৃষক পরিবারকেই ব্যস্ত থাকতে হয়। সেইজন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কোন ব্যাপক উৎসব এই মাসে অনুষ্ঠিত হবার উপায় নেই। এই মাসে যে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তা' পারিবারিক উৎসব, পল্লীর কোন বারোয়ারী উৎসব কিংবা গোষ্ঠী (community) উৎসব নয়। এই প্রকার পারিবারিক উৎসব আরও কয়েকটি এই মাসে অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসেই পশ্চিমবাংলার কুমারী মেয়েদের ইতু পূজার অনুষ্ঠান হয়। ইতু শব্দটি সূর্য অর্থবাচক আদিত্য শব্দ থেকে জাত। সুতরাং ইতু পূজা সূর্য পূজারই একটি মেয়েলী রূপ। সূর্য স্বামী এবং পুত্র বর দাতা, সেই জন্য কুমারী মেয়েরা তাঁর পূজা ক'রে তাঁর কাছে স্বামী এবং পুত্রের বর চায়। সারা অগ্রহায়ণ মাস ধ'রেই ইতুর পূজা

করতে হয়, কিন্তু তা' সত্বেও তা' বারোয়ারী পূজার রূপ নিতে পারেনি। প্রত্যেকের পরিবারে স্বতন্ত্রভাবে এই পূজা হয়, পূজার মধ্যে আচারের দিকটি প্রাধান্যলাভ করে। আচার-নিরপেক্ষ গীতি কিংবা নৃত্যের কোনও সম্পর্ক এর সঙ্গে নেই। সেইজন্য তা' ভাদু পূজার রূপ নিতে পারেনি।

সেঁজুতি ব্রতও অগ্রহায়ণ মাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মেয়েলী ব্রত। সেঁজুতি ব্রতে প্রায় উঠোন-জোড়া আলপনা আঁকতে হয়, আলপনার মধ্য দিয়ে কুমারী-হৃদয়ের নানা ঐচ্ছিক কামনা-বাসনার রূপ ফুটে উঠে। প্রায় ঘরে ঘরেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান হ'লেও গোষ্ঠীগত (communally) কিংবা বারোয়ারীভাবে এই ব্রত উদ্‌যাপন করা হয় না।

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল মেয়েলী ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়, তাদের অধিকাংশের লক্ষ্য সূর্য। কারণ, আগেই বলেছি, একদিন অগ্রহায়ণ মাস থেকেই বছর গণনা করবার রীতি এ দেশে প্রচলিত ছিল। পূর্ববাংলায় থোয়া ব্রত নামে একটি ব্রতও এই মাসে উদ্‌যাপন করা হয়, তা'তে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দেবার যে রীতি আছে, তা' লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রদীপটি যে সূর্যেরই প্রতীক তা' সহজেই বুঝতে পারা যায়।

অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উপলক্ষে বরিশাল জেলায় কাক-বলি দিবার রীতি প্রচলিত আছে, তা'তে একটি ছড়া শুন্‌তে পাওয়া যায়, তা' এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য—

দাঁড় কাউয়ারে আহ্বান কর‍্যা,
পাতি কাউয়ারে বলি দিয়া
কোঁ কোঁ কোঁ,
আজ কৈলাস যোগো বাড়ী শুভো নবান্নো।
আইয়ো খাইয়ো, কাক, বলি লইও,
হাত ভইর‍্যা সন্দেশ দিমু,
পেটটি ভর‍্যা খাইও॥

নবান্ন উৎসবের মধ্যে গৃহস্থের মনে একটি উদার মনোভাব ব্যক্ত হয়। কেবলমাত্র আত্মতুষ্টির জন্যই নবান্ন নয়, পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলকে তার ভাগ দিয়ে তবে গৃহস্থের তৃপ্তি। তার ঘরের আজ নূতন অন্ন কেবলমাত্র তার নিজের ভোগের জন্য নয়, পশুপক্ষীও তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হয় না।

কৃষিভিত্তিক সমাজে পৌষ শ্রেষ্ঠ মাস। বাংলাদেশে পৌষ মাসকে লক্ষ্মীমাস বলে। অগ্রহায়ণ মাসেই গৃহস্থের ধানকাটা শেষ হয়ে যায়, পৌষ আরম্ভ হ'বার আগেই সকল ধান তার গোলাজাত হয়, সারা পৌষ-মাস এক মুঠি ধানও সে তার সারা বছরের জন্য গোলাজাত করা সঞ্চয় থেকে নিয়ে ব্যয় করবে না। কেবলমাত্র যে-ধান মরাইয়ে উঠে নাই, তাই সে মাসের জন্য ব্যয় করবে। এই ব্যয়ের স্বভাবতই কোন হিসাব থাকে না। বেহিসাবী ব্যয়ের মধ্যেই আনন্দ তার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাই সারা পৌষ মাস জুড়েই কৃষকের উৎসব। তার বিশেষ কোন রীতি নেই।

পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জিলার এই উৎসবের নাম পৌষ-পরব বা টুসু-পরব। পতিগৃহগতা অভিমানিনী কন্যা টুসু গানের মধ্য দিয়ে গায়—

> এত বড় পোষ-পরবে রাখলি, মা, পরের ঘরে,
> আমার মন কেমন করে।
> যেমন শোল মাছে উফাল মারে,
> আমি থাকব না, মা, আর তোর ঘরে।
> মায়ে দিল মাথা বেঁধে, দেগো মাসী ফুল গুঁজে,
> বিদায় দে, মা, সংসারের কাজে,
> আমি থাকব না আর তোর ঘরে॥

পৌষ মাসে (আশ্বিন মাসে নহে) পিতৃগৃহে না আসতে পারার দুঃখের মত দুঃখ বালিকা বধূর আর কিছু নেই; সেই দুঃখে মায়ের উপর অভিমান তার দুর্জয় হ'য়ে ওঠে।

সারা পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জিলার পশ্চিমাংশ পৌষ মাসে এই টুসুগানে মুখরিত হয়ে উঠে। টুসুই পৌষ-লক্ষ্মী। সারা পৌষমাস

ব্যাপিয়া সকল শ্রেণীর স্ত্রী-সমাজ টুসুর আগমনী থেকে আরম্ভ ক'রে মকর সংক্রান্তির দিন তার বিজয়াগান গেয়ে তার ক্ষুদ্র প্রতিমাটি জলে বিসর্জন দিয়ে শূন্য হাতে ঘরে ফিরে আসে। এই আশা নিয়ে তারা ফিরে আসে যে টুসু আবার ফিরে আসবে, বছর বছর টুসু এমনি আসে যায়। সে যেন গৃহস্থের ঘরের কন্যা। উচ্চতর হিন্দু সমাজে এই টুসুই উমার রূপ লাভ করেছে।

পৌষ মাসের শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা ক্ষেত্রপালের পূজা হ'য়ে থাকে। কৃষিকার্যের জন্য সে সকল দেবদেবীকে প্রসন্ন করবার প্রয়োজন হয়, তাঁদের নিকট সর্বদাই পশু বলি দিবার বিধান আছে। সদ্য পশুরক্তে ধরিত্রীর শক্তি বৃদ্ধি পায়, তা'তেই পৃথিবী শস্যে সমৃদ্ধি-শালিনী হ'য়ে উঠতে পারে। সেইজন্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, কৃষিজীবী সমাজেই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পশুবলির সূচনা হ'য়েছিল। বাস্তুদেবতা কিংবা ক্ষেত্রপালের পূজায় পূর্ববাংলায় মেষ বলির বিধান আছে। বছরের ফসল ঘরে তুলে নিয়ে এসে কৃতজ্ঞ কৃষক ধরিত্রী দেবতাকে পশুরক্তে পরিতৃপ্ত করে। শস্য প্রসব করবার ভিতর দিয়ে তার যে শক্তি নষ্ট হ'য়েছে, পশুরক্তে তারই ক্ষতিপূরণ হ'বে ব'লে বিশ্বাস করা হয়।

মকর সংক্রান্তির দিন পল্লীবাংলার অসংখ্য উৎসবের তিথি। তাদের মধ্যে নিম্নবঙ্গে বারাঠাকুর বা দক্ষিণদারা বা দক্ষিণরায়ের পূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বারাঠাকুর মুণ্ড দেবতা। সাধারণের বিশ্বাস, এই মুণ্ডই গণেশের যে মুণ্ডটি শনির দৃষ্টিতে উড়ে গিয়েছিল, সেই মুণ্ড। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' আদিম ধর্মোপাসনার বিশেষ একটি রূপ। কোন কোন আদিম সমাজ বিশ্বাস করে, সর্বদেহের মধ্যে কেবলমাত্র মুণ্ডটির মধ্যেই প্রাণ-শক্তি (life force) অবস্থান করে। সুতরাং সর্বদেহের মধ্যে একমাত্র মুণ্ডটিই উপাস্য ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে। সেইজন্য তারা দেবদবীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মুণ্ডটিরই উপাসনা করে। নাগাজাতির মুণ্ড-

শিকার (head hunting)-ও এই বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মুণ্ডমালী মা কালীর উপাসনারও এই তাৎপর্য। সেইজন্য এই অঞ্চলে মুণ্ডপূজা ব্যাপক প্রচলিত হয়েছে। সাধারণতঃ নিম্নবঙ্গ অঞ্চলে মুণ্ডটি অরণ্য প্রকৃতির প্রতীক ব'লে মনে করা হয়। অরণ্যের মধ্যে ধরিত্রীরই একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ পায়, সুতরাং গৌণত ধরিত্রীরই পূজা ব'লে মনে করতে হয়।

মাঘ মাসে পূর্ব বাংলার দুটি মেয়েলী ব্রত উল্লেখযোগ্য। এ'গুলো কোন বারোয়ারী কিংবা গোষ্ঠিগত অনুষ্ঠান নয়, অন্যান্য মেয়েলী ব্রতের মতই তা পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র। ইহাদের একটির নাম মাঘমণ্ডল ব্রত, অপরটির নাম পুনাই বা পৌর্ণমাসীর ব্রত। মাঘ-মণ্ডল ব্রত সূর্য ব্রত। পশ্চিম বাংলার কুমারী মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসে যে ইতু ব্রত করে, মাঘমণ্ডল ব্রত প্রকৃত পক্ষে তাই। সূর্যকে লক্ষ্য করেই এই ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়। উঠান-জোড়া আলপনার মধ্য দিয়ে কুমারী হৃদয়ের ঐহিক কামনা-বাসনার বিচিত্র রূপ প্রকাশ পায়। নাটকীয় ভঙ্গিতে তাতে যে সকল ছড়া আবৃত্তি করা হয়, তাতে জীবন-রসের স্পর্শ গোপন থাকে না।

পুনাইর ব্রত বাংলা মেয়েলী ব্রতের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রের ব্রত। আগেই ব'লেছি পল্লীবাংলার পাল পার্বণের প্রধান লক্ষ্য সূর্য এবং তারপর পৃথিবী। কোন না কোন উপায়ে এই দুটি বস্তুকে লক্ষ্য করেই কৃষি-ভিত্তিক সমাজের ধর্ম কর্ম ধ্যান ধারনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, পুনাই ব্রত তার একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। লৌকিক উৎসবে অনুষ্ঠানে চন্দ্রের কোন স্থান দেখা যায় না। স্বতন্ত্র কোন সাংস্কৃতিক ধারা থেকে বাঙ্গালীর পল্লীজীবনে তা এ'সে আজ যুক্ত হয়েছে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, ফাল্গুন মাসের প্রধান উৎসব দোলযাত্রা। কিন্তু দোলযাত্রা বৈষ্ণব প্রভাবিত যুগে বৈষ্ণব সমাজেই প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল, জনসাধারণের সমাজের সঙ্গে তার যোগ স্থাপিত হতে পারে

নি। ফাগুয়া উৎসবটিও পল্লীবাংলার নিজস্ব উৎসব নয়। পূর্ব বাংলার পল্লীতে প্রধানতঃ মেয়েলী ব্রতে যে দুটি উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাই ফাল্গুন মাসে বাংলার নিজস্ব উৎসব বলে মনে হতে পারে।

তাদের একটির নাম ফাল্গুন দোলা। এ'টি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে, এ'র কিছু কিছু উপকরণ দোলযাত্রার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। একটি দোলনা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তাতে মৃদু মৃদু দোল দিতে দিতে এই ব্রতে কুমারীরা এই প্রকার ছড়া বলে,—

ফাল্গুন দোলা—গুণ প্রতিষ্ঠা
গুণে তিতা—গুণে মিঠা।
ভোজন ভাত—পিন্ধন পাট
পাট কাপড়ে—রাত্রি রাখ

উত্তমঠাকুরের পূজা পূর্ব বাংলার অন্যতম বসন্তকালীন পল্লী উৎসব। উত্তমঠাকুর বসন্ত প্রকৃতির দেবতা, ক্রমে তিনি নন্দ দুলাল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। তাঁরও পূজার কিছু কিছু উপকরণ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পূর্ববাংলার পল্লী অঞ্চলে আর এক দেবতার পূজা হয়ে থাকে, তার নাম বসনরা। বসন্তরাজ কথাটিই উচ্চারণ বিকৃতিতে বসনরায় পরিণত হয়েছে। তা'ও বসন্ত প্রকৃতির পূজা। সংস্কৃত নাটকে যে বসন্তকালীন কামদেবের পূজার কথা শুনতে পাওয়া যায়, তারই এটি একটি লৌকিক রূপ।

চৈত্র মাসের পল্লীবাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব শিবের গাজন। শিবের গাজনকে কোন কোন অঞ্চলে নীলের গাজন বা দেল পূজাও বলে। মালদহ জেলায় তাই গম্ভীরা বলে পরিচিত। শিবের গাজন যে প্রাচীন সূর্যোৎসব ব্যতীত আর কিছুই নয়, তা আগেই আলোচনা করেছি। তিনদিন ধরে এই উৎসব চলে, উৎসব উপলক্ষে সর্বত্রই

মেলার অধিবেশন। চড়ক এই উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমানে নানা ব্যবহারিক অসুবিধার জন্য চড়ক পরিত্যক্ত হয়েছে। শিবের গাজনের মধ্যে বাংলার বহু লৌকিক ধর্মীয় আচরণ এসে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সেইজন্য সর্বত্রই তা' এক একটি আঞ্চলিক রূপ লাভ করেছে। তান্ত্রিক সাধনা দ্বারা প্রভাবিত উত্তর রাঢ় অঞ্চলে তান্ত্রিক আচার অনুযায়ী কতকগুলো অনাচার তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। সন্ন্যাসীদের শ্মশান থেকে মৃতদেহ সংগ্রহ করে উন্মত্ত নৃত্য তার একটি বিশেষ লক্ষণ।

যে সকল পাল পার্বণের উপরে বর্ণনা করা গেল, ইংরেজিতে এ গুলো calendric festival অর্থাৎ নির্ধারিত দিন তারিখ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত উৎসব বলে। তা' ছাড়াও শীতলা পুজা, ওলাদেবীর পুজা, রক্ষাকালীর পুজা ইত্যাদি গোষ্ঠীমূলক অনুষ্ঠান বিশেষ প্রয়োজনে বৎসরের প্রায় সকল সময়েই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

রবীন্দ্রচেতনায় "শিব"

শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, এল. এল. বি.

'হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছো ঘর
আমারে দিয়েছো শুধু পথ',

এ শুধু কবির কথা নয়; ভারতীয় ঐতিহ্যের রূপায়ণে "শিব" চেতনা এক অপরূপ সম্পদ। কালসমুদ্রের প্রাণহিল্লোলে, তার তরঙ্গ-বিভঙ্গে কত রূপই না ফুটে উঠেছে। এই মনমন্থনে আমরা পেয়েছি অমৃত, আমরা পেয়েছি গরল, আমরা পেয়েছি তত্ত্ব, আমরা পেয়েছি তথ্য, এসেছে সমাজ-বেদনা, প্রকৃতিচেতনা, রূপ নিয়েছে সাধন নিবেদন, প্রেমিকের আবেদন, ভক্তের আকূতি, কর্মীর বিচার, সাধারণ মানুষের আচার, দানা বেঁধেছে ইতিহাস তার মাল-মসলা নিয়ে, পুঁথিপত্তর বগলে শাস্ত্রও এসেছে শস্ত্রপাণি হয়ে কথা ও কাহিনীতে জড়িয়ে। যুগ যুগ ধরে এই শিবকে আমরা গড়েছি, ভেঙ্গেছি, মনন দিয়ে চিন্তা দিয়ে সাজিয়েছি, সাধ দিয়ে সাধ্য দিয়ে রঙ দিয়ে রূপ দিয়ে রসোত্তীর্ণ করবার চেষ্টা করেছি, সাধনোচিত মার্গে স্থাপন করেছি, বেদবেদান্তের পরমতত্ত্বে পরিণত করেছি, আবার তাকে টেনে নিয়ে এসেছি হাটে মাঠে বাটে, ভাঙ খাইয়েছি, কোঁদল করিয়েছি। নিবাতনিষ্কম্প মহা-যোগীকে কল্পনা করেছি গরীব নেশাখোর শ্মশানবাসী পাগল ভোলানাথরূপে—যে খেতে দিতে পারে না তার স্ত্রীকে, ভরণপোষণ করতে পারে না তার পুত্রকন্যাদের। এই "শিব"কে নিয়েই তর্ক করেছি আমরা যে তিনি অনার্যদের 'দেবতা নাকি—মহেঞ্জদড়তে নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি বৃষভবাহন যিনি বেদের রুদ্রই কি তিনি—হিরণ্যকেশিন্ গৃহ্যসূত্রের শত রুদ্রীয়ের প্রতীক, তস্করদের দেবতা পশুপ, কল্পনা

করেছি যে যাস্ক ও সায়ন্ যাঁদের ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বললেন সেই শিশ্ন-দেবতাদের মানসভৌম রূপই কি শিব। ঋষি উপমন্যু কোন রুদ্র ও দেবীর উপাসনা প্রবর্তন করেছিলেন, কৃষ্ণবাসুদেব জাম্ববতীর সঙ্গে কোন 'দেব্যা সহ মহেশ্বরের'। মহাভারতে তিনি দিগ্‌বাস, নগ্ন, উগ্র, যোগী, সিদ্ধযোগী, মহাতপা, ঘোরতপা। একদিকে এঁকেই করা হল লিঙ্গপূজার প্রতীক আবার ইনিই 'নিত্যেন ব্রহ্মচর্যেন স্থিত' শিব। লোকসাহিত্যে তিনি ভিক্ষুক ভোলানাথ, পাগল দিগম্বর, আত্মবিস্মৃত, শ্মশানবাসী। আবার তাঁরই গৃহিণী যিনি তিনি অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরী বরদাত্রী। মহাযান কারণ্ডব্যূহেও তাঁকে দেখেছি অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে। বৌদ্ধচিন্তায় তিনি লোকনাথ, তিনি মহাকাল, তিনি ত্রিকালেশ্বর, বজ্রসত্ত্ব বজ্রধর, ডোম্বী শবরী চণ্ডালীর লীলাসহচর—আদরিণী 'নৈরামণি'র কক্ষে ও বক্ষে তিনি বিহার করেন মহাসুখচক্রে। কাশ্মীরের কুলীশরা, দক্ষিণের শৈবসিদ্ধান্তী বা তামিল নায়নাররা, বাংলার আগমবাগীশরা অষ্টাদশলীলা মূর্তিকে পঞ্চক্রিয়ায় সৃষ্টিস্থিতিসংহার তিরোভাব অনুগ্রহের পরিপূর্ণ ঐক্যের মধ্যে যে দেবতাকে দেখলেন, তিনিই কি প্রাচীন তামিল সঙ্গম সাহিত্যের কবি-পরিষদের সভাপতি শিব কবিমনীষী। শঙ্করাচার্য আবার তাঁকে শুধু লৌকিক দেবতারূপে কল্পনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁকে বৈদান্তিক ব্রহ্মত্বেও নিয়ে গেলেন। তিনি পরমাত্মা, তিনি অজ, তিনি শাশ্বত, তিনি কারণসমূহের কারণ, আদিঅন্তহীন নিরীহ নিরাকার। তাঁতেই বিশ্ব লয় হয়, বিশ্ব পালিত হয়। তাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, দেশ নেই, বেশ নেই, তিনি ত্রিমূর্তি, জ্যোতিষাং জ্যোতি। সারা ভারতময় আজও ধ্বনিত হচ্ছে—শিব, শিব—চিদানন্দময়রূপ, যিনি মন নন, বুদ্ধি নন, অহঙ্কার নন, যিনি একদিকে কৃতস্মর, আর একদিকে বিকৃতস্মর। চারিধামে আজও ভক্ত গাইছেন—

ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো।

যাঁর একদিকে স্তধন যুবতী স্বাস্থ্যসৌখ্য, আর একদিকে —

তিমিরহৃদবিদারণ জ্বলদগ্নি নিদারুণ
মরুশ্মশান সঞ্চর
শংকর শংকর

এই সত্য সনাতন "শিব"চেতনা রবীন্দ্রনাথের মত স্পর্শকাতর মননশীল মানসেও প্রতিক্রিয়া তুলবে—এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট মনে রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক যুগসন্ধিক্ষণে এবং এমন এক শ্রীমতাং গেহে যেখানে পৌত্তলিকতার সদ্য বিদায় হয়েছে। তাঁকে যেদিন উপনয়নের মাধ্যমে সাবিত্রী মন্ত্রের দীক্ষা দিলেন মহর্ষি, তখন সে মন্ত্র, সে পদ্ধতি, সনাতন প্রথানুযায়ী নয়। সামাজিক জীবনে পুরনো কাল পিছন ফিরলেও নতুন কালের নৌকো সবে তার সওদা নিয়ে ঘাটে পৌঁছেছে। একদিকে খসে পড়ছে রঙমহল শীশমহলের নবাবী আমল, যমুনা কল্লোল সাথে নহবতে তান মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার আর একদিকে গড়ে উঠছে নতুন চিন্তা, নতুন শিক্ষাদীক্ষাচেতনা, রাষ্ট্রবোধ। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে বিংশ শতাব্দীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের কথায় বলা যেতে পারে যে তিনি একাধারে legend ও symbol.

ভারতের মহামানবের সাগরতীরে এই যে শিবচেতনা, তা বারে বারে রূপ নিয়েছে সমন্বয়ের ধারায়, সমীকরণের চেষ্টায়। ভারত-ইতিহাসের মূলমন্ত্রই এই। রবীন্দ্রনাথের মত উত্তম পুরুষের কাছে এই চেতনা ধরা দিল বিশ্বরূপের খেলাঘরে, নটরাজের তালে তালে, বিশ্ববাসনার ফুল্ল অরবিন্দের কেন্দ্রমাঝে, লৌকিক সাধনার অঙ্গরূপে যেমন তেমনি পরমচেতনার স্বরূপত্বেও।

জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিলো করে গেছো দান।

১২৮৮ সাল। নির্ঝরের স্বপ্ন তখনও ভঙ্গ হয় নি। কবির মননে জেগে উঠল সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের এক অপূর্ব ছবি। তিনি দেখছেন মহাছন্দে বন্দী হয়েছে যুগ যুগ—যুগ-যুগান্তর।

উঠিল আকুল আর্তস্বর
'জাগো' 'জাগো' 'জাগো' মহাদেব
...   .
জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর
তিন কাল ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক-দিগন্তর
প্রলয় পিনাক তুলি   করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া
জগতের আদি-অন্ত   থর থর থর থর
উঠিল কাঁপিয়া
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল জগতের সমস্ত বাঁধন
উঠিল অসীম শূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতেব উন্মত্ত কোলাহল!
মহা-অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা-চিতানল

সব চূর্ণ হয়ে গেল—কিন্তু কবির কল্পনার শিব নিরুদ্বেগ, শান্ত, স্তব্ধ সমাহিত।

মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিল মহাধ্যান।

এরই দু বছর পরে দেখি (১২৯০) 'ভারতী'তে "ধর্ম" (আষাঢ় ১৩৬৭ শনিবারের চিঠিতে উদ্‌ধৃত) প্রবন্ধে তরুণ কবি লিখেছেন—

'শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক-বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ততাণ্ডবে উন্মত্ত। কণ্ঠের মধ্যে বিষ পূর্ণ রহিয়াছে, তবু নৃত্য   মরণের রঙ্গ- ভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিণী কালী তাঁহার বক্ষের উপরে সর্বদা

বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই। যাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ, এত হলাহল, এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে। সর্পের ফণায় হলাহলের নীলদ্যুতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি, কিন্তু তাঁহার জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চিরস্রোত অমৃত-নিষ্যন্দিনী পুণ্য ভাগীরথীর আনন্দকল্লোল কি শুনা যাইতেছে না? নিজের ডমরুধ্বনিতে, নিজের অস্ফুট হর্ষগানে উন্মত্ত হইয়া নিজে যে অবিশ্রাম নৃত্য করিতেছেন, তাহার গভীর কারণ কি দেখিতে পাইতেছি? বাহিরের লোকে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে কিন্তু তাঁহার গৃহের মধ্যে দেখি, অন্নপূর্ণা চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর ওই যে মলিনতা দেখিতেছ, শ্মশানের ভস্ম দেখিতেছ, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছ, ও কেবল উপরে—ওই শ্মশানভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন রজত-গিরি-নিভ চারুচন্দ্রাবতংস অতি সুন্দর অমর বপু দেখিতেছ না কি? উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর মৃত্যুকে আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে বিকট করালদশনা লোল-রসনা মূর্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ওই মৃত্যুই ইহার প্রিয়তমা, ওই মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু আকারে প্রতিভাত হইতেছেন; কিন্তু ভক্তেরা জানেন কালীও যা, গৌরীও তাই; আমরা তাঁহার করালমূর্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে সকলে যোগী বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন?'

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে
বিভূতিভূষিত শুভ্রদেহ নাচিছ দিক্‌বসনে।
মহা-আনন্দে পুলক কায়

গঙ্গা উথলি উছলি যায়
ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়
জটাজুট ছায় গগনে।

'সারদামঙ্গলে'র কবির প্রভাব এখানে প্রবল।

কিন্তু এ শুধু গৌড়ানন্দ কবির স্বপ্নমঙ্গলের হিং টিং ছট্ নয় যে

ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকালে ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণবিগুণ

শব্দরসিক কবির বক্রোক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

কবি চলেছেন পদ্মার তীরে তীরে, বড়ল, আত্রেয়ী নদীর ধারে ধারে, ভাঙনধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে। হাজার হাজার গাঙ-শালিখরা উড়ে গেল, একটা বড় মাছ জলের তলা থেকে ক্ষণিক কলশব্দে লাফ দিয়ে উঠে জানিয়ে গেল যে জল-যবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দে জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের আভাস আছে। হঠাৎ সেই অবচেতনের সমুদ্র থেকে ভেসে উঠল—

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর

আর কালস্রোত বেয়ে বেরিয়ে পড়ল গ্রাম্য ও লোকসংগীত ছড়া ও পাঁচালিতে আচ্ছন্ন মন—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদে এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান্।

কবি বলছেন,

"আমার মানসপটে একটি ঘন মেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তাল তরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত, তাহার পর দেখিতে পাইতাম সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটি কয়েক পানসি নৌকা বাঁধা আর শিবঠাকুরের নববিবাহিত বধূগণ

চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছে। মধ্যমাই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী।”

ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম

মেঘের পরে মেঘ জমে, ভৈরবের বাঁশী বাজে, ঈশানের বিষাণ ওঠে, সন্ন্যাসীর মনে গান ঘনায়—গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু। আসেন তিনি, যিনি দুর্দম, যিনি নিশ্চিত, যিনি নিষ্ঠুর, যিনি নূতন, যিনি সহজপ্রবল স্নিগ্ধকৃষ্ণ ভয়ঙ্কর। ধ্যানভঙ্গ হয় বারে বারে, জটাধারীর জটা হয় প্রকম্পিত, আর্ত কবি বলেন—

তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে

এখানে শিব শুধু ভদ্রদেবতা নন, রুদ্র দেবতা, তিনি নটরাজ, নটেশ।

মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার আগে যাও গো আমায় রাঙিয়ে দিয়ে
রক্তে তোমার চরণ দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
রং যেন মোর মর্মে লাগে
আমার সকল কর্মে লাগে।

কবি বলতেন যে নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে, বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।

আমি নটরাজের চেলা
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

তখন,

হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁদে ছন্দ ভালো মন্দ তালে তালে
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গমালায় পড়ি কবি বলছেন যে শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদিগকে সমস্ত অশিব পরিহার করে 'শিব' হতে হবে, অর্থাৎ শুভ কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নেই, তেমনি কর্মহীনতার মধ্যেও মঙ্গলকে কেউ পেতে পারে না। ঔদাসীন্যেও মঙ্গল নেই। কর্মসমুদ্র মন্থন করেই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে মহর্ষির প্রবর্তিত উপাসনা পদ্ধতিতে মহানির্বাণ তন্ত্র ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্ প্রাধান্য পেয়েছিল, সেই দেবতাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন যিনি শুধু এক আর অনাদি নন্, যিনি

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং চ পরমং দৈবতং
পতিং রতীনাং পরমং পরস্তাদ
বিদামদেব ভুবনেশমীড্যং

অথবা

যা তে রুদ্রাশিবা তনুরঘোরাঽ পাপকাশিনী
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি

রবীন্দ্রনাথের চেতনাতে এই 'শিব' 'মহেশ্বর' রুদ্রের দক্ষিণরূপ নিয়েই শুধু প্রকাশ হয়নি, তাকে তিনি দেখেছেন নটরাজের নৃত্যের মধ্যে, তার ঝঞ্ঝার মধ্যে, লীলালাস্যের মধ্যে, পার্বতীর হাসির মধ্যে, মানুষের মধ্যে।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যা মায়িনং তু মহেশ্বরম।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মিলনের নবী—ছান্দোগ্যের মিথুন মন্ত্রের কবি—কেউ যেখানে বর্জিত হয়নি, সেইখানেই তো তিনি, তিনি কোন খণ্ডকে

আশ্রয় করে নেই, তিনি চন্দ্রে নেই, সূর্যে নেই, তারকায় নেই, অথচ আছেন চন্দ্রসূর্য-তারকায়, চোখে নেই বাক্যে নেই অথচ সবে আছেন।

এই যে সর্বগত শিবের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের হাতে তা traditional value থেকে রূপায়িত হল সমাজসেবায়, কল্যাণের আদর্শে "শিব" প্রতীক্ হয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'শিব' রুদ্র বটে কিন্তু সে রুদ্র—

সর্বং রোদয়তি সংহরতি প্রলয়াদৌ—রুজং অর্থাৎ সংসারদুঃখং দ্রাবয়তি ইতি বা রুদ্র (বিজ্ঞান ভগবান ভাষ্য)। তাই রবীন্দ্রনাথের 'শিব' এইদিক থেকে পরিপূর্ণ কল্যাণের মূর্তি—তিনি শুভবুদ্ধির দ্বারা আমাদের সংযুক্ত করেন। এর মধ্যে আরো একটু ছায়া পড়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবতাবাদ বা 'মানুষ'কে নিয়ে জোর গলায় চেঁচামেচি সুরু হোল—পশ্চিম থেকে মতবাদ এলো—কাণ্ট, হেগেল, পসিভিষ্টরা, মিল, বেন্থাম, কার্লাইল, এমার্সন, ওয়াল্ট হুইটম্যান সবাই বলতে আরম্ভ করলেন সমাজের সত্য শক্তি হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। আমরাও উপনিষদ খুঁজে জীব শিব পেলুম—বৈষ্ণবকাব্য বের করে গদগদ গলায় বললাম—সবার উপরে মানুষ সত্য। বিংশ শতাব্দীর দর্শন ও বিজ্ঞান কিন্তু বলতে সুরু করলে—মানুষই শেষ কথা নয়—সে, জড় ও জীবের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের একটি অধ্যায় মাত্র। তিন 'ডাইমেনশন' ছাড়াও তার আর এক 'ডাইমেনশন' আছে যেখানে সে বিরাট, অগাধ, যাকে বলা হয় intuitive mentality. তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা কাম-কামনা সুখ-দুঃখ জৈবিক তাড়না, সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ—এ সবের ঊর্ধ্বেও তার একটা অনির্বচনীয় সত্তা আছে, শ্রেয়বোধ আছে, যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতো শিব মন্ত্রে দীক্ষা, অগাধে দীক্ষা—

> গৈব মাঁহি গুরু দেও মিলা পায়া হাম পরসাদ
> মস্তক মেরা কর ধরা দক্ষ্যা হম অগাধ

রন্ধ্রহীন অন্ধকার ভেদ করে আমার গুরু আলো হয়ে প্রকাশিত

হলেন, আমি কিছু পেলাম তাঁর প্রসাদ, তিনি আমার শির ধরে করলেন আশীর্বাদ, আমার হলো অগাধে দীক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের 'শিব' শুধু প্রাচীন পৌরাণিক 'শিব' নন, 'লৌকিক' শিব নন, বেদের রুদ্র দেবতা নন, শ্বেতাশ্বেতরের 'মহেশ্বর' নন, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-কল্যাণ ও শ্রেয়বোধের আদর্শও এবং বিংশ শতাব্দীর 'মানবিক ভূমা'—Divinity of Humanity বা Humanity of Divinity—কিন্তু এই মানুষ 'শিব' মানবিক চৈতন্যে বিধৃত আনন্দ, মানুষকে বিলুপ্ত করে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নন, মানবকেন্দ্রিক অধ্যাত্ম স্বীকৃতি।

তাই তো মন্ত্র হল—

মুক্ত যিনি দেখ না তারে
তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা শৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার?

শুধু তত্ত্ব নয়, গ্রাম্য সাহিত্যের লৌকিক শিবও কবিকে টেনেছে। শরৎকালের আগমনী গান কোন্ কবিকে না টানে! কন্যাবিরহকাতর মন যে আপনি বলে—যেতে নাহি দিব—তবু যেতে দিতে হয়।

বৎসর গত হয়েছে কত করছে শিবের ঘর
যাও গিরিরাজ আনিতে গৌরী কৈলাস শিখর

এখানে শিবের সঙ্গে শিবানীকে দেখছি। হরগৌরী বা রাধাকৃষ্ণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কোথাও ভাবগদগদ হতে দেখি নি। বড়জোর তিনি লিখলেন—

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত আঁখি
দেখে, তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছি ঢাকি
প্রাতঃ সূর্যরুচি।

অস্থিমালা গেছে খুলি মাধবি বল্লরীমূলে
ভালে মাখা পুষ্পরেণু চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরানে।

কবি উমাপতিধর, শুভাংগ, ভগীরথদত্তের যুগ হতে বাংলার চিত্তাকাশে হরের সঙ্গে গৌরীকে সংযুক্ত দেখেছি। বিদ্যাপতিরও হরগৌরীর পদ আছে। শিবকে নিয়ে গৌরী পাগলিনী—যে শিব ভগ্নসমাধি রুদ্ধরভস, যে গৌরী হরহৃদয়-তড়াগরাজহংসী। রবীন্দ্র-নাথকে বারে বারে কালিদাসের কালেও চলে যেতে দেখেছি। কুমারসম্ভবের ধ্যানগম্ভীর নিবাত নিষ্কম্প নিরঞ্জন শিব তাকে যেমন মুগ্ধ করেছিল তেমনি আবার অভেদাঙ্গ হরপার্বতীও বারে বারে আলোকছাযার মত তাকে ডেকেছে। 'মেঘদূত' কবিতায় গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গির সঙ্গে ধূর্জটিব চন্দ্রকরোজ্জ্বল জটার কথা পড়ি। চৈতালীতে কুমাবসম্ভবের গান, মানস কৈলাস শৃঙ্গে নির্জন ভুবনের কথায় শিবের রূপকল্প রবীন্দ্র চেতনার প্রতীক। নগর-গুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কবি চলেছেন—

স্বপ্নলোকে উজ্জযিনীপুবে
মহাকাল মন্দিবের মাঝে
তখন গম্ভীবমন্দ্রে সন্ধ্যাবতি বাজে

মহাকাল সমুদ্রের তটে তিনি দেখেছেন চঞ্চলের চলমান ছবি, শুনেছিলেন ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী, তারপর—

রজনীর অন্ধকাব
উজ্জযিনী করি দিল লুপ্ত একাকার,
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিভিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রা নদীতীবে
আরতি থামিযা গেল শিবের মন্দিরে।

এ শিবকে বুঝতেন কবি, কিন্তু লোকগাঁথার—

হাতে শূলি কাঁধে থলি, শম্ভু ফেরে গলি গলি
শঙ্খ নিবি নিবি এই কথাটি বলি।

শাঁখারীরূপী এই শিবকে রবীন্দ্র-মন গ্রহণ করেছিল কি? কিংবা—

কহ গো নিরুপমা, কাহার বোলে রামা
ইচ্ছিলা বুড়া জটাধরে
হইয়া সুনারী ভজহ ভিখারী
দরিদ্র বর দিগম্বরে

অবশ্য 'ভিখারী শিবের কোল সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে' তবু তাঁর কাছে আলোকছায়াই "শিব-শিবানী"।

কুহেলী গেল আকাশে আলো দিল যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

এ যেন শঙ্করাচার্যের অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা—

মন্দারমালা পরিশোভিতায়ৈ কপালমালা পরিশোভিতায়
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।

মদনভস্মের পর কবির কল্পনায় নতুন চিন্তা এলো, শিবকে ডেকে বললেন—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে, করেছো এ কী সন্ন্যাসী।

এ প্রশ্ন চিরকালের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যুই শেষ কথা নয়—জীবন ও মৃত্যু দুই পিঠোপিঠী থাকে,—মৃত্যু ও অমৃত একেরই ছায়া। সেখানেও 'শিব' কে ভৈরবরূপে আমরা পাচ্চি কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন রূপে—

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ
হে ভৈরব শক্তি দাও ভক্ত পানে চাহ।
দূর করো মহারুদ্র
যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।

তাই মৃত্যু হতে পুষ্পধনু জাগেন, কারণ মহেশ্বর অগ্নিবর দিয়েছিলেন, মৃত্যু দিয়েই তিনি তাকে অমর করেছেন। সেখানে—

মৃত্যুঞ্জয় যে-মৃত্যুর দিয়েছেন হানি
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি
সেই দিব্য দীপ্যমান দেহ,
উন্মুক্ত করুক অগ্নি উৎসের প্রবাহ,
মিলনেরে করুক প্রখর
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।

মীনকেতুর পথ সহজ পথ নয়, সে নয় পুষ্পবিকীর্ণ ভোগের পথ, সে দেয় না আরামের তৃপ্তি, সেখানে রুদ্রকে জাগাতে হয়, সুপ্তি জড়িত তিমির জাল সহেনা।

একদিন রবীন্দ্রনাথ মরণকেই শ্যামসমান করে দেখেছিলেন কিন্তু শিবের মৃত্যুরূপও তাঁকে চঞ্চল করেছে।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ হে মোর মরণ
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লট্‌পট্ করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে
তাঁর-বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গ দল তরজে।
তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি ওঠে তান
ওগো মরণ হে মোর মরণ।

তাঁর কাছে শিব শিশু ভোলানাথের প্রতীক হয়েছে—

লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।

লৌকিক শিবপূজার ফলও দেখেছি যেমন গল্পগুচ্ছের 'দৃষ্টিদান' গল্পে। অন্ধ কুমুর স্বামী যখন পুনরায় বিয়ে করতে যাচ্ছে তখন সে বলছে — তোমাকে আমি এই মহাবিপদ' মহাপাপ হতে রক্ষা করব— এ যদি না পারি, তবে আমি কিসের স্ত্রী··· কী জন্য আমি শিব পূজা করেছিলাম···?"

আবার এই ভোলানাথই তাঁর কাছে খ্যাপা মহেশ্বর। তাই কবির কাছে পাগল শব্দটা ঘৃণার শব্দ নয়—তিনি বলছেন,

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্র প্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমরু বাজিতেছে—ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুতরূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাবকিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে এক ফোঁটা আমাকে দেয় নাই তাহা বলিতে পারি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া গেছে'।

এই শিবচেতনা কবিকে সাধক করে তুলেছে। তিনি বলছেন—
'হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলে উঠে— সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথ রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।···সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করে তোলে। নৃত্য করো হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ কোটী যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমান হতে থাকবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্র-সংগীতের তাল না কেটে যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যেই তোমার জয় হোক—'

মুক্তধারায় দেখি যন্ত্ররাজ বিভূতি বহু বৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের

বাঁধ তুলে উত্তরকূটের পার্বত্য মুক্তধারাকে বেঁধেছেন। সে দেশের দেবতা হচ্ছেন উত্তরভৈরব, তিনি সংশয়ভেদন, তিনি বন্ধনছেদন, তিনি সংকটসংহর। তিনি শঙ্কর, তিনি ময়োভব, ময়োস্কর। তাঁর মন্ত্র তো লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র নয়, তাঁর তন্ত্র তো পঞ্চভূত বন্ধন কর ইন্দ্রজাল তন্ত্র নয়। তাঁর বাণী যখন বজ্রঘোষ বাণী হয়ে বাজে তখন মৃত্যুসিন্ধুসন্তরণ আপনি হয়। তাঁর আসল ভক্তই পারে—

মারের সাগ পাড়ি দিতে
বিষম ঝড়ের বাযে

রবীন্দ্রনাথের শিবচেতনায় বৈরাগীর সাধনা আর ভৈরবের উপাসনা এক হয়ে যায়—

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয মাঝে হৃদয়-মাঝে।
নাচে রে নাচে চরণ নাচে
প্রাণের কাছে প্রাণের কাছে।
প্রহর জাগে প্রহরী জাগে
তারায তারায কাঁপন লাগে।
মরমে মরমে বেদনা ফুটে
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই চেতনা উপনিষদের সেই মূল চেতনারই অঙ্গ হয়ে ফুটেছে—অবচেতনার লৌকিক শিব অধিচেতনার বৈদিক শিব হয়ে এমন সুন্দরভাবে মিশে গেছে যে শৈব রবীন্দ্রনাথ, গায়ত্রীমন্ত্রের উদগাতা সৌর রবীন্দ্রনাথ, ঔপনিষদ রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণববাউল রবীন্দ্রনাথ, রূপপিপাসু তান্ত্রিক রবীন্দ্রনাথ, যুক্তিবাদী 'এগনষ্টীক' রবীন্দ্রনাথ, সকলে এসে মিশে গেছেন এক বিচিত্র সমন্বয়ভূমিতে—যেখানে শেষ কথা—

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে

মর্ত্যে সেই যে তিমিরজয়ী প্রভু—

অজেয় আত্মার রশ্মি তারে দিতে সীমা

প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।

সেই প্রসারণের দিকে তাঁর শিবকল্পনা চলেছে—সেইখানেই তার মহৎ, বৃহৎ বসে, সেইখানেই দেখি শিবতর শিবতমকে যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূকে। তাই মহাশৈব কবি বললেন—দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক, মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক—সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক—'সোঽহম'। তাইতো "কবির দীক্ষা" শিব মন্ত্রে—

শিব মন্ত্র দিই আমিও
অবাক করলে—
তুমি তো জানি কবি
কবে হলে শৈব।
কালিদাস ছিলেন শৈব
সেই পথের পথিক কবিরা।

... ...

তুমি কাকে বলো ত্যাগ করি
ত্যাগের রূপ দেখো এই ঝরণায়
নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়ত করে দান।
তিনি বিষ পান করেন, বিষকে কাটাবেন বলে,
ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও দ্বারে দ্বারে রব উঠল তাঁরকণ্ঠে
সে মুষ্টি ভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা।
নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস
তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান,
দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জলে।

যখন দ্বিধা অবসান হয় সব নমস্কার একটি নমস্কারে পৌঁছয়। কবির কথায় তখন—নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—তখন সুখে, মঙ্গলে

আর ভেদ নেই, বিরোধ নেই—তখন শিব শিব, শিব তখন শিব এবং শিবতর।

যদাহ তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি ন সৎ নাসৎ শিব এক কেবলঃ

যখন তোমার সেই অনন্ধকার আবির্ভূত হয় তখন কোথায় রাত্রি, কোথায় দিন, কোথায় সৎ, কোথায় অসৎ, তখন কেবল শিব।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ

নমঃ শঙ্করায় চ ময়োঙ্করা চ

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ

আজ সাহিত্য-পরিষদ ও রামেন্দ্রসুন্দরের কথা সত্য হয়েছে। 'কবিবর, শংকর তোমায় জয়যুক্ত করুন'।

রঙ্গভরা বঙ্গ দেশ

ভবানী মুখোপাধ্যায়

রঙ্গভরা বঙ্গ দেশ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পূণ্য জন্মভূমি। প্রথমেই সেই চিরস্মরণীয় বঙ্গসন্তানকে স্মরণ করি। বাংলাদেশের ঠিক রূপটি অতি অল্প কথায় তিনি বলতে পেরেছিলেন। বাঙালী জাতির ইতিহাস আলোচনা করে দেখুন, তা এক আশ্চর্য সরসতায় ভরা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ফরাসী দেশের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে মঁসিয়ে আঁদ্রে ভিযোলী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তারিখের ডেইলী মেল পত্রিকায লিখেছিলেন :—

"No flats, no coal, no salt, no money, Every one in Paris moans, groans, and grumbles. But they dance."

এই অবস্থার সঙ্গে বাঙালীর বর্তমান অবস্থা তুলনা করুন, বাঙালীর অতীতের কথা স্মরণ করুন, কথাগুলি কি আমাদের পক্ষেও সমান প্রযোজ্য নয়। কিছু নেই, তবু কি আমরা হাসতে ভুলে গেছি, নাচতে ?

এ এক অপূর্ব অবস্থা। 'বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।' সত্যেন্দ্রনাথের এই বাঘ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মূর্তি নিয়ে এসেছে, দক্ষিণা রায় কখনো এসেছেন ম্যালেরিয়া, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির মূর্তি নিয়ে, কখনো বিদেশী শাসকের মূর্তিতে, কখনো বা দাঙ্গাহাঙ্গামা রাজনৈতিক বিপর্যয়। বাঙালী কিন্তু বেঁচে আছে তার মুখের হাসি নিয়ে। তাই ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন "এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গভরা।"

বাঙালী একটু স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী, একটু বেশী আত্মাভিমানী, ইদানীং কিছুটা আত্ম-কেন্দ্রিক, তবু বাঙালী বাঙালী। যখন যেখানে গিয়েছেন রসগোল্লার দোকান বসিয়েছেন আর কালিবাড়ি প্রতিষ্ঠা করে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়ও গড়েছেন, আর বাঙালী একদা সারা ভারতবর্ষে সংবাদপত্র পরিচালনা করে দেশের মধ্যে জাতীয় চেতনা সঞ্চার করেছেন।

বাঙালীর বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত, কিন্তু মহারসিক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁরা সবাই যেমন তাঁদের রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের রচনায়, ব্যক্তিজীবনে সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, আশুতোষ প্রভৃতিরাও তেমনই রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের কথায় ও কাজে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষরাও তাঁদের কথাবার্তায় সেই রঙ্গরসিক বাঙালীত্ব বজায় রেখেছেন। মনে হয়েছে, এই সরসতাই বাঙালীর বাঁচবার পথ। এই রঙ্গরসপ্রিয়তা তার একমাত্র সিক্রেট।

বঙ্গ সংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণ এই সরসতা। সরসতাই সজীবত্বের পরিচায়ক।

বিভিন্ন ধরণের নমুনার দ্বারাআজকের এই ক্ষুদ্র আলোচনা শেষ করব। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর বিদ্রোহীদের শাস্তি দানের নানারকম জল্পনা চল্‌ছে। সেই সময় সংবাদ প্রভাকরে একজন পত্র লেখক লিখছেন :—

> "সরকার যদি বিদ্রোহীদের ক্ষমা করেন, অভয় দেন এবং অভিযুক্তদের ফাঁসির হুকুম হইতে মুক্তি দেন তবে বিদ্রোহ এখনই বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ প্রজারা এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জানিয়াছে যে রামে মারে বা রাবণে মারে, মরিতেই যখন হইবে তখন মারিয়া মরি।" (১৬ই আষাঢ়—১২৬৫, জুলাই—১৮৫৮)।

তারপর বিদ্রোহ সমাপ্ত হবার পর সম্পাদক ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর 'সংবাদ প্রভাকরে' এক কড়া সম্পাদকীয় লিখলেন বাঙালী

চরিত্রের সমালোচনা করে। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যটির নাম "বাঙালী দিগের বলবৃদ্ধির উপায়"—

"সকল জাতির মধ্যেই বাঙালীরাই শক্তি ও সাহসে অধম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে উন্নতির কথা ঘোষিত হইতেছে এবং বাঙালীরা বিদ্যাচর্চায় যে কৃতবিদ্য হইতেছেন তাহার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। ব্রিটিশ শক্তির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীদের পতন আরম্ভ হইবে এবং তাঁহারা হিন্দুস্থানীদের দাসত্ব করিবেন। কাপুরুষতার জন্যই বাঙালীদের সৈন্য-বাহিনীতে স্থান হয় নাই। বাঙালী চরিত্রের এই দুর্বলতার কারণ পাওয়া যাইবে তাঁহাদের সমাজ বন্ধনে। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব এই চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। সম্প্রতি কোন কোন স্থানে শরীব চর্চার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা প্রযোজনেব অনুপাতে অতি সামান্য। শরীর চর্চার প্রথম ধাপ হিসাবে তাহার প্রতি উল্লসিত মনোভাব বিসর্জন দিতে হইবে। এই মনোবৃত্তির মধ্যে আছে দাসত্ব প্রীতি।"

(১০ই পৌষ—সংবাদ প্রভাকর, ১২৮৫)

প্রায় একশত বছর আগে সম্পাদকের এই উক্তিটি ভবিষ্যৎবাণী বলা যায়। আজ আমরা যে অবস্থায় পৌঁছেচি তার সঙ্গে সম্পাদকের মন্তব্য কি আশ্চর্য মিলে যায়।

কিন্তু এই সব সত্ত্বেও বাঙালীর মধ্যে সংহতির অভাব ছিল না। বাঙালী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নানারকম পথ সন্ধান করে নিয়েছে। সেকালে যে সব সভা সমিতি ছিল তার একটি তালিকার দ্বারা সহজে বোঝা যাবে যে সেদিনের বাঙালী কত বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী ছিল :—

বিজ্ঞানদায়িনী সভা
ভারতবর্ষীয় সভা
বিধবা বিবাহ বিষয়ক সভা

সত্য জ্ঞান সঞ্চারিণী সভা

ভারত সভা

স্ত্রীবিদ্যা ও ভূম্যধিকারী সভা ইত্যাদি।

বিজ্ঞানদায়িনী সভার এক অধিবেশনের বিবরণ সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছে—

"গত বৃহস্পতি বাসরীয় যামিনীযোগে বিজ্ঞানদায়িনী সমাজের সভ্য মহাশয়দিগের নিয়মিত সভা হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবের বাদানুবাদ হয়। এদেশ ইংরেজদিগের হস্তগত হওয়াতে বাঙ্গালীরা সুখী কিনা। এই প্রশ্নের প্রতি শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় যে বক্তৃতা করেন ইত্যাদি—"

এরপর অক্ষয়কুমারের সুচিন্তিত ভাষণ মুদ্রিত হয়েছে।

ইংরেজদের সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্পর্কটা কোনদিনই তেমন সুখের ছিলনা, বাঙ্গালীরা ভদ্র এবং সরল-স্বভাব তাই সব ক্ষমার চক্ষে দেখেন এমন পরিচয় পাওয়া যায় সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। অবশ্য ঘটনাটি যে কি তা বোঝা কঠিন। সম্পাদকীয় আংশিক উদ্ধার করছি।

"ইংরাজরা নানা বিষয়ে বাঙ্গালীদের সহিত দুর্ব্যবহার করিতেছেন, অথচ বাঙ্গালীরা দয়ালু ও সরল স্বভাববশতঃ তাঁহারদিগের সহিত সদ্ব্যবহারের ক্রুটী করেন না। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের বিষয়ে ইংরাজজাতির অসদাচরণের কথা কাহারও অগোচর নাই। কিন্তু দেখুন বাঙ্গালী ধনী মহাশয়েরা তাঁহারদিগের কর্তৃক বিবিধ প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও এ পর্যন্ত সমস্ত প্রকারে সাধুতা প্রকাশ করিতেছেন।"

এরপর আশুতোষ দেব মহাশয়কে লাঁরপেন্ট নামক জনৈক সাহেব প্রতারণা করে জাহাজযোগে পলায়ন করছিলেন; দেববাবু "ওয়ারিন" অর্থাৎ ওয়ারেন্ট দ্বারা তাঁকে জাহাজ থেকে ধরে আনেন, যদি সুপ্রিম

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মিডিক্যাল কলেজে নিযুক্ত হয়েন। এখানে যতদিন ছিলেন, কিছুই মানিতেন না, সংপূর্ণ নাস্তিক ছিলেন। গলদেশ হইতে যজ্ঞ সূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোনো ধর্মের প্রতিই বিশ্বাস করিতেন না। পরে মিডিকেল কালেজের গুডিব সাহেবের সহিত বিলাত গমন করেন, সেখানে উত্তমরূপে বিদ্যা শিখিয়া দুর্বুদ্ধিবশতঃ অবশেষে এই অগাধ বিদ্যাপ্রকাশ করিলেন। যাহা হউক ধন্য বিবিলোভ, হে খ্রীষ্টধর্ম, চমৎকার তোমার গুণ, তুমি বিবি পর্যন্ত দিয়া লোককে স্বমতে আনহ।"

এই চিত্রটির সঙ্গে একালের চিত্র কল্পনা করুন। একালের ছেলেরাও নাস্তিক, বিলাত গমন এবং বিবিগ্রহণ সমানভাবেই চালু আছে, প্রভেদ শুধু ধর্ম। এখন আর ধর্মের বাড়াবাড়ি নেই তেমন, তবে রাজনীতির নামে যে সব ইজমঘটিত ধর্ম একালে গড়ে উঠেছে, তারা শুনেছি অনেক সময় স্বমতে আনার জন্য "বিবি পর্যন্ত" উপহার দিয়ে থাকে।

সমকালীন সমাজ চিত্র সংবাদ পত্রেই পাওয়া যায়। তাই সেকালের আর একটি মাত্র চিত্রের কথা উল্লেখ করে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রসঙ্গ শেষ করব। সেকালেও ফ্যাসনেবল্ ধর্ম নিয়ে মাতামাতির হুজুক ছিল—

"এই ভাবুকরা ভিন্ন ২ দলবদ্ধ পূর্বক বৃক্ষমূলে বা রম্যস্থলে বা পুষ্করিণীর ঘাটে বা মাঠে বা গৃহস্থের উঠানে অথবা রাজপথে স্ব স্ব মহাশয় অর্থাৎ উপগুরু বেষ্টন করিয়া বসিয়া একান্তঃ করণে কর্তাগুণ সংকীর্তন করিতেছে। কি আশ্চর্য, কি কুহক, যুবক-যুবতী ও কূলের কূলবধূ প্রভৃতি কামিনীগণ যাহারা পিঞ্জরের পক্ষির ন্যায় নিয়তঃ অন্তঃপুরে বদ্ধা থাকেন তাহারা এককালীন লজ্জা ও কুলভয় মনের বিকারকে জলাঞ্জলি দিয়া পরপুরুষের সহিত একাসনোপবিষ্টা হইয়া

আনন্দ লহরী ও গোপী যন্ত্রে গীত ও বাদ্য করিতেছে। ক্ষণেক ২ ঠাকুর ২ বলিয়া চীৎকার। ক্ষণেক বা গড় নামে করতালি ও জয়ধ্বনি প্রদান এবং ক্ষণেক বা আউল নাম উচ্চারণ করিতেছে, আবার নিস্তব্ধ হইয়া ভক্তিতে মগ্নান্তর অশ্রুপাত করিতেছে······ইত্যাদি''

সমগ্র অংশটুকু উদ্‌ধৃত করার সুবিধা নেই, কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে এক অপরূপ সমকালীন চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের যুগে যুগে হাওয়া পরিবর্তন ঘটেছে। কখনও বা ধর্মমত, কখন বা রাষ্ট্রমত, কখনও বা পশ্চিমের হাওয়ায় ভেসে আসা সমাজ বিপ্লব। কিন্তু এমনই আশ্চর্য, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির অন্তর্নিহিত মূল সুর এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ—, একদিন বাসের কনডাক্টর উচ্চৈস্বরে চীৎকার করছিল—আসুন! আসুন! এখনও কল্যাণী হয়নি, কাকদ্বীপ হযনি—'। এই কালের কিছু দিন আগে কল্যাণীতে কংগ্রেস অধিবেশনে বহু জন-সমাগমে এক বিশৃঙ্খল বিপর্যয় সৃষ্টি হয় আর কাকদ্বীপ সাগরমেলায় একটি ব্রীজ ভেঙে অনেকের মৃত্যু ঘটে।

আমরা আজ জনসমাগমে পরিপূর্ণ এক অঙ্গহীন বঙ্গদেশে বাস করছি। পূব-পশ্চিম এক হয়ে পশ্চিমে লীন হয়েছে। পশ্চিমের রূপান্তর ঘটেছে, সমাজ জীবনে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে। মেয়েরা আজ আর পাল্কী-নিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুচিতা রক্ষা করার প্রয়োজন অনুভব করেন না, জীবন সংগ্রামেও তিনি পুরুষের অংশী। ট্রামে-বাসে তাঁদেরও পুরুষের মতই অতি কষ্টে অনুপ্রবেশ করতে হয়।

কিন্তু এই যে অবস্থা, এমন দুর্দশাগ্রস্ত হয়েও তাঁদের মুখের হাসি কি মুছে গেছে, মুছে গেছে সরস রসালাপের প্রবণতা?

এখন সিনেমা কালচার আমাদের সামাজিক কালচারকে অনেকখানি গ্রাস করেছে। সিনেমা মাত্রই অবশ্য খারাপ নয়, তথাপি

সিনেমার মারফৎ অনেক উদ্ভট প্রদর্শিত হয়, যা আমাদের সামাজিক জীবনের পিছনের দরজা দিয়ে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছে।

বঙ্গদেশ রঙ্গভরা—বাজারে যান, মাছের কাণ্‌কোয় আলতা লাগিয়ে মাছওলা চীৎকার করছে—পান খেযেছে, পান খেয়েছে। আলুওলা চীৎকার করছে—রস গোল্‌লা, রস গোল্‌লা—এমনই আরো কত।

আমরা অতিশয় চাপে পড়েছি। যাঁতাকলের মত পিষ্ট। নানা রকমের যন্ত্রণা। তবু কি সভাসমিতির কিছু অভাব আছে?

প্রতিদিনের সংবাদ পত্র পাঠ করুন, কত সভাসমিতির বিজ্ঞপ্তি। কত সমাবেশ। তারপর আছে নাচ গান বাজনা।

সদারঙ্গ, তানসেন, নিখিল ভারত ইত্যাদির অহোরাত্র সম্মেলন। বিজ্ঞানদায়িনী সভার মত সভাও আছে, আবার পুরাতন কালের হরিভক্তি প্রদায়িনী সভাও আছে। যত রকমের পেশা সম্ভব তাঁদের সকলের সম্মিলিত ট্রেড ইউনিযন দলভুক্ত সমিতি আছে। দেশে সরকারি একটি এবং বে-সরকারী বা বিরোধী দল আছে এক ডজন। তাঁদেরও সভা আছে।

এই সব সভায় প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে অনেক প্রস্তাব, অনেক আবেদন নিবেদন, অনেক হুংকার, অনেক প্রতিবাদ এবং উপদেশ শোনা যায়। এই সব নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি অতি সাধারণ ভাবে একটা বিশ্লেষণ করেন তাহলে সামাজিক চিত্র পাবেন প্রচুর পরিমাণে। সমাজ জীবনের হাল্‌কা দিকটি এখন আর সংবাদপত্রে তেমন প্রকাশিত হয় না। পশ্চিম বঙ্গের অর্ধশত এবং সারা ভারতের শতাধিক মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আধামন্ত্রী, সেক্রেটারি, উপসেক্রেটারি, [illegible] বিবৃতিতে সংবাদ পত্র বোঝাই। তথাপি, দু' চারখানি সংবাদ পত্রিকা এখনও আছে, তার লাইনগুলির ভিতর ভালোভাবে নজর দিলে অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে। অনেক হাসির খবর। এই সংবাদের ভিতর থেকেই হাস্যরসের ফল্গুধারা প্রবাহিত।

বঙ্গদেশ রঙ্গভরা। আগে শাদা শাড়ি ভিন্ন আর কিছু ছিলনা বাঙালী মেয়েদের। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—বাংলাদেশ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, তাই রঙ্গের প্রয়োজন নাই। শাদাই ভালো। রাজপুতানার মরুভূমির দেশে লাল নীল হলদে নানা ধরণের শাড়ির প্রচলন। এখন অবশ্য সেই অবস্থা নেই, মেয়েরা রঙীন পরছেন, শাদাও পরেন কেউ কেউ, তবে অনেক কম।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাব জেব টেনে বলা যায আমরা এমনিতেই রঙ্গে আছি। আমাদের আব অন্য রঙেব প্রযোজন নেই। আমরা এত মোনিং, গ্রোনিং, গ্রামবলিং-এব ভেতবও ফরাসীদের মত নৃত্য করতে পারছি। বাঙালীব প্রতি বিধাতাব এ এক পরম আশীর্বাদ।

———

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মানুষ ও শিল্পী

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.

আঁদ্রে জিদ্ সম্পর্কে আর্ণল্ড বেনেট্ একবার বলেছিলেন—

"He writes in the very midst of morals. They are not only his background but very frequently his foreground."

—উক্তিটি আঁদ্রে জিদ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সার্থক কিনা এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। তাবা মনে কবেন কথাটা আবেগজনিত অতিশয়োক্তি মাত্র। কিন্তু এই মন্তব্যই যদি কথাসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে করা যায়, সকলেই তা সশ্রদ্ধভাবে মেনে নেবেন।

বাস্তবিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাবাজীবন আশ্চর্য একটা সুস্থ আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। 'বাঁচিয়ে রেখেছিলেন' বলছি " বিশেষ ভাবে তাঁর কৃতিত্বেরই স্মারক হিসাবে। অভাব, অসুবিধা, বোগ, শোক, দিনগত পাপক্ষয়েব গ্লানি, —বেঁচে থাকবাব দুঃখ তাঁর কম ছিল না, কিন্তু সহজাত একটা উদার প্রসন্নতায় অপ্রাপ্তির সব বেদনা ঢেকে হাসি মুখে তিনি সত্যসুন্দরের আরতি করে গেছেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম, মৃত্যু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর। বাঙ্গালীর পক্ষে দীর্ঘ ৮৬ বৎসবের জীবন সিপাহী বিদ্রোহের আপাত-ব্যর্থতার হতাশা এবং প্রেরণা, জাতির সর্বস্ব পণ করা মুক্তিসংগ্রামের ইতিবৃত্ত, দু দুটো বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ, আবর্তসঙ্কুল ঘটনাপ্রবাহে সমাজজীবনে ওলটপালট, পুত্রহীন পরিণত বয়সে জীবনসঙ্গিনী বিয়োগের মত

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বহু ক্ষয়ক্ষতির সমস্যা, কলকাতা, জব্বলপুর, কাশী, পূর্ণিয়া—দেশের অভ্যন্তরভাগে ব্যাপক পরিক্রমা এবং ঘরকুনো বাঙালীর একজন হয়েও বক্সার-বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সুদূর চীনদেশে পাড়ি,—বৈচিত্র্যের তরঙ্গাঘাত কেদারনাথের সুদীর্ঘ জীবনে অনেক হয়েছে। কিন্তু আনন্দের কথা—এইসব নাড়াচাড়ায় কলা-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্ণসমারোহেরই সুযোগ মিলেছে, মনে তার কোন ক্ষতের সৃষ্টি হয়নি। কলকাতার উত্তর-সহরতলিতে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর বাড়ি, ঘর থেকে দু'পা এগুলেই সাধকপ্রবর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যলাভের দুর্লভ সুযোগ; প্রথম জীবনের কোমল হৃদয়সম্ভার নিয়ে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পেযেছিলেন ব'লেই বোধহয় চিরকালের জন্য তাঁর মনটি খাঁটি সোনায় মুড়ে গিয়েছিল, বাস্তবের দুঃখদৈন্য সে মনে কখনও কলঙ্কের দাগ কাটতে পারেনি। হাস্যরসাত্মক রচনায় কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের শক্তি সর্বজন-স্বীকৃত, কিন্তু তাঁর লেখায় ব্যঙ্গ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। সত্যাশ্রয়ী লেখনী তাঁর অন্যায়, অসত্য, দুর্নীতি ও মিথ্যাচারের মুখোস খুলে দেবার জন্য ব্যঙ্গের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে, তবু এ-সব রচনার পিছনে সহানুভূতিশীল মানবতাবাদী ন্যায়নিষ্ঠ গঠনমূলক লেখক-মানস থেকে গিয়েছে বলে সে লেখা কঠোরতায় রূঢ় হয়নি! নির্মল শুভ্র হাস্যরসের প্রবর্তক হিসাবে আধুনিক সাহিত্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেছেন। এ হিসাবে কেদারনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই মহৎগুণের জন্যই সাহিত্য-রথী বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) 'আমরা কি ও কে' গল্পসঞ্চয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে কেদারনাথকে বলেছেন:

> 'আমরা কি ও কে' অতি চমৎকার লেখা। ও লেখার প্রতি ছত্রে রস আছে। আর আপনি বৈঁচি ষ্টেশন মাষ্টারের যে ছবি এঁকেছেন, বাঙলা সাহিত্যে তার জুড়ি নেই। ভদ্রলোকের অবস্থা শুনে ও তাঁর কথা শুনে,—আমার দুচোখ জলে ভরে এসেছিল—অবশ্য হাসতে হাসতে।

আমার বিশ্বাস বাংলায় আর একজন লোক নেই যিনি ও-ছবি আঁকতে পারেন।"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বা গল্প অনেকের কাছে আভিধানিক অর্থে উচ্চশ্রেণীর বলে গণ্য হবে না, কারণ এগুলিতে নরনারীর জৈবিক প্রেমের টানাপোড়েন নেই এবং গভীর মনস্তত্ত্বের সংঘাত খুবই কম। বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্রের যুগের পাঠকরুচিতে এ ধরণের লেখা সমাদৃত হওয়া কঠিন। তাছাড়া কেদারনাথের রচনায় অতিকথনের দোষ আছে, উচ্চাঙ্গ আর্টের পক্ষে অপরিহার্য মাত্রাবোধ তাঁর ছিলনা। কিন্তু অন্যহিসাবে কেদারনাথের কথা-সাহিত্যের মূল্য অনেক। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত চিত্রধর্মী মনোজ্ঞ রচনা এবং সেই রচনার অনেকগুলিতে নিজের গ্রামকে পটভূমি ও নিজেকে প্রধান চরিত্র রূপে উপস্থাপন বিচিত্র রূপ ও রসের সঞ্চার করেছে। এ দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাযেব লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার আশ্চর্য মিল দেখা যায। তাছাড়া জগৎ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সুনীতির প্রতি অটুট আস্থা, কল্যাণ ধর্মের অবিরাম অনুশীলন এবং পরিবেশ বা ঘটনাসংস্থানের বিরূপতাসত্বেও শেষ পর্যন্ত আশ্বাসের দক্ষিণা বাতাস—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের সাহিত্যের সম্পদ। আগেই বলা হয়েছে তাঁর লেখার মধ্যে হালকা হাসির ছড়াছড়ি, কারও ক্ষতি না করে, কারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করে মহৎ ও সুন্দর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার সাধনা তিনি করেছেন। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি 'কালাচাঁদ খুড়ো' অমর কমলাকান্তের সরল সংস্করণ এবং মূলতঃ কালাচাঁদ খুড়ো তিনি নিজেই। যা কিছু সামাজিক বা জাতিগত অন্যায় ও দুর্নীতি, কালাচাঁদ খুড়ো ব্যঙ্গের আশ্রয়ে তারই জীবন্ত প্রতিবাদ। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র কেদারনাথকে লেখা একখানি চিঠিতে তাঁর চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। "কোষ্ঠীর ফলাফল" উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৬ তারিখে লেখা পত্রে তিনি বলেছেন ঃ—

"চমৎকার লাগলো। বইখানিতে একটিমাত্র ক্রটির বিষয় উল্লেখ কোরব'—কিন্তু রাগ করতে পারবেন না এই অনুরোধ। ভগবান লেখার শক্তি আপনাকে অপর্যাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে ঐশ্বর্যবানেরই মিতবায়ী হওয়া প্রয়োজন, কাঙালের সে কাজ আবশ্যক না। শুধ্ লিখে চলাই ত নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে থাকা চাই যে।"*

প্রাচীন কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ সন্তান, হিন্দুধর্মের মহৎ মর্যাদা সম্পর্কে কেদারনাথ সব সময়েই সচেতন ছিলেন। ভণ্ডামির বিরুদ্ধে খড়্গ-হস্ত হ'লেও এবং আধুনিকতার মহত্ত্বটুকু সহজভাবে হাসিমুখে মেনে নিলেও যা প্রাচীন অথচ সুন্দর, তিনি ছিলেন তার একান্ত সমর্থক। হিন্দুদের আচার বিচার, এমন কি যা কুসংস্কার বলে অবহেলিত হয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সেগুলি মূল্যাযনের চেষ্টা তিনি সর্বদা করতেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। দেওঘরে বৈদ্যনাথ মন্দিরে পবিত্র বলে পরিচিত ভারতের বিভিন্ন নদীব জল ক্ষুদ্রাকার শিশিতে চড়াদামে বিক্রী হয়। ভক্তরা বাবার মাথায় ঢালবার জন্য তা কেনে। 'কোষ্ঠীর ফলাফলে' দৃশ্যটির বর্ণনা হাস্যরসাত্মক, কিন্তু এই বর্ণনার শেষদিকে কেদারনাথ আবেগের সঙ্গে বলেছেন:

"এই জলদেবতা এমন সব দুর্লভ জিনিষ রাখেন, যাহাদের ড্রামের মূল্য কিং কোম্পানীর এক ড্রামের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু তাহা অন্যায়ও নহে, অন্যায্যও নহে —কারণ এই সব জল জাহাজেও থাকে না, ল্যাবরেটারিতেও বানায় না। গরীবেরা অধিকাংশ পথই পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সেতুবন্ধ, দ্বারকা, মানস সরোবর প্রভৃতি সুদূর

---

*শরৎচন্দ্র কেদারনাথকে পানিত্রাস থেকে ১০।৬।১৯১৮ তারিখে লেখা এক পত্রে বলেছিলেন: "প্রার্থনা করি আপনি আরও কিছুদিন বেঁচে থেকে গল্প লিখুন। আমি প্রত্যেক ছত্রটি তার পড়ি। বন্ধুর লেখা বলে নয়, সত্যকার সাহিত্যিক মানুষের লেখা বলে পড়ি।"

দুর্গম তীর্থ হইতে অসীম শ্রমে বিপদসঙ্কুল পথে তাহা বহন করিয়া আনে। এই শ্রদ্ধার সামগ্রীর যথার্থ মূল্য আমরা দিতে পারি কি? পারি কেবল উপহাসের এক ফুৎকারে তাহাদের সৎকার করিতে।"

শারদীয়া অষ্টমীতে দেবীকে কাপড় দেওয়ার রীতি সাধারণ্যে প্রচলিত, পূজায় সার্বজনীন নববস্ত্রসংগ্রহের চাপে এ কাপড়ের গুণাগুণের জন্য কারও বড় একটা মাথাব্যথা নেই, নিয়মরক্ষা হ'লেই হয়। ভক্ত কেদারনাথ কিন্তু এতে সুখী নন। স্বাভাবিক ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়ে 'ভোলানাথের উইল' গল্পে তিনি পূজার বাজার সম্পর্কে লিখলেন:

"বেপরোয়া বাঙালীরা বাড়ির তাগাদা মত আপিস যেতে আসতে দু বেলা পূজার মালের খবর নিচ্ছিলেন। মহালয়ার (শ্রাদ্ধের) দিনে 'শো কেসে' শাণিত 'মদনবাণ'—শাড়ী ঝুলতে দেখে তাঁরাও গলা বাড়িয়ে ঝুলে পড়লেন—ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে শুরু করলেন।··· সপ্তমীর মধ্যে বাঙালীদের খরিদ একপ্রকার শেষ—কেবল মহাষ্টমীতে দেবীকে দেবার মত সস্তা কস্তাপেড়ের জন্যে তেমন তাগাদা ছিল না। একজোড়া নিয়ে ঝিয়েরও একখানা হবে, দুর্গারও একখানা হবে।"

সৎ ও সাত্ত্বিক জীবনযাপনের অনুরাগ ছিল কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি', 'বাণীসুধা'-র পবিত্র গান ও কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর সেই মনের স্পষ্ট পরিচয় মেলে। বলতে গেলে তাঁর প্রায় সব রচনাতেই এই মহৎ ধর্মটি ছড়িয়ে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এই ধর্মের বাস্তব মর্যাদা দিয়েছেন। পুঁথিগত বিদ্যার পুঁজি তাঁর বেশী ছিল না, কিন্তু চাকরীটি তিনি পেয়েছিলেন ভাল। সেই চাকরীর বন্ধন কিন্তু তাঁকে বাঁধতে পারেনি—বিষণ্ণ করেই রাখতো। একমাত্র সন্তান কন্যার বিবাহের পর দায় একটু কমার সঙ্গে সঙ্গেই

কেদারনাথ তাঁর অফিসার মেজর স্মিথ, ডি· এস. ও—কে জানালেন চাকরী করতে তাঁর আর মন নেই। খোলাখুলি বললেন :

"ছেলে নেই, কন্যাদায় মুক্ত হয়েছি, জীবন কিন্তু নিষ্ফল। জীবিকার্জন করেছি মাত্র, নিজের কাজ কিছুই করা হয়নি। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, পরমার্থচিন্তা আমার অবশ্য করণীয় কাজ। সেটা রয়ে গিয়েছে।' সব সত্য কথা বললুম ও আমাকে কর্ম-হতে অবসর নিতে সাহায্য করতে অনুরোধ করলুম। তিনি শুনে অবাক। পরে আমার প্রস্তাবের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা বুঝতে পেরে বললেন—"পাঁচটা বছর থাকলে এখন যা পাচ্ছ তার তিনগুণ পাবে, নির্বোধের মত এরূপ ত্যাগস্বীকার কেন? বললুম, 'সারাজীবন Comfort seeking-এ (আরাম খুঁজে) কেটেছে, একাজে ত্যাগই প্রথম সোপান, আমি যদি আজ চালাতে না পারি, ত্যাগের আনন্দ আমাকে সাহায্য না করে, তবে বুঝবো আমার এ সঙ্কল্পের মধ্যে সত্য নেই।' (সজনীকান্ত দাসের ভূমিকা,—দাদামশায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প)

আগেই বলেছি, সনাতন ভাবধারা ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কেদারনাথ অচেতন ছিলেন না। বস্তুবাদী ঐতিহাসিক পরিবর্তন তিনি সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যই সম্ভাবনাময় নূতনকে বরণ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। অবসর-গ্রহণের পর তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন পুণ্যার্থী হয়েই, কিন্তু সেখানে শুধু ধর্মচর্চা বা পূজানুষ্ঠানই তাঁর অবলম্বন ছিল না। তিনি কাশীতেও বয়স্কদের চেয়ে দেশের যারা ভবিষ্যৎ সেই তরুণদের সঙ্গে বেশি মিশতেন এবং তাদের বোঝাবার বা বোঝবার চেষ্টা করতেন। 'আই হ্যাজ'-এ এটার কৈফিয়ৎ-স্বরূপ তিনি বলেছেন :

"তরুণদের মন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তারা ভুল করতে পারে, কিন্তু জ্ঞানতঃ অনিষ্ট করবে না। পারলে সাহায্য

করাই তাদের ধর্ম,—না পারলেও চেষ্টা পায়। তাই না ভালবাসি।"

আবার 'চাটুয্যে সংবাদ' গল্পে বলেছেন:

"অবসর গ্রহণান্তে কাশী এসে রইলুম। একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। অনভ্যস্ত পূজা, জপ, গঙ্গাস্নান নিয়ে অনির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করা বড় বোরিং।...'জয়নারায়ণ স্কুলের সামনে বেউড়িতলায় বাসা, দ্বিতলেই থাকি। প্রীতিভাজন তরুণেরা আসেন—কেহ লেখক, কেহ সাহিত্যপ্রেমিক—বেশ একটি আনন্দ বৈঠক নিত্যই বসে—সাময়িক সাহিত্য-কথা চলে। তারা যেন নবযুগের বার্তাবাহক—চোখে মুখে আনন্দ উত্তেজনা ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য। কিছু সৃষ্টির জন্য উৎসুক। ভাবতুম এইতো যৌবন, একেই বলে যৌবন। এরাই তো জগৎকে নূতন রূপ দিতে আসে—"

কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মানবতাবোধ যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। এই মানবতাবোধের আত্যন্তিকতায় তাঁর অনেক লেখা সম্ভাবনা সত্ত্বেও আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে সমাজে যারা ছোট হয়ে থাকে, তাদের জন্য সুগভীর মমতায় তিনি সর্বদাই উচ্ছল। বৃদ্ধবয়সে প্রীতিধন্য সকলে তাঁকে দাদামশাই বলে ডাকতেন, সে সার্থক। তাঁর জীবনচর্চা এবং সাহিত্যকৃতি এই দাদামশায়সুলভ স্নিগ্ধ ভালবাসায় সমুজ্জ্বল। সমাজে অন্যায় করে যারা অতিরিক্ত সুবিধাভোগ করে, সামাজিক দায়িত্বের ভার নিয়ে যারা অধিকার ভোগ করলেও দায় বহন করে না, তাদের কেদারনাথ আঘাত করেছেন। কিন্তু যারা সুযোগ পায়না বলেই ছোট হয়ে যাবে, অকৃত্রিম প্রীতিস্পর্শে তাদের তিনি উজ্জ্বল করে এঁকেছেন। এইজন্য তাঁর 'কোষ্ঠির ফলাফলে' সমাজপ্রধান সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যকে অতি সাধারণ মুসলমান কাবুলীওয়ালা আজিজ অনায়াসে অতিক্রম করে গেছে। এই গ্রন্থের শেষদিকে প্রচণ্ড শীতের রাতে ট্রেনের যে পাহাড়ী দরিদ্র যুবক নিজের শেষ সম্বল কম্বলখানা শীতার্ত সহযাত্রীকে দিয়ে

তার প্রাণ বাঁচিয়ে হাসিমুখে নেমে গেল, তার কথা ভোলা যায় না। 'থাকো' গল্পে পল্লীগ্রামের পরিচারিকাশ্রেণীর গয়লা-বৌ থাকো চরিত্র তার নীতিশাস্ত্রের বিধানে হয়তো দাঁড়ায় না, কিন্তু হৃদয়ের ঐশ্বর্যে সে শুধু গ্রামের ইতরভদ্র সকলকে জয় করে নি, সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ও জয় করেছে। 'কালী ঘরামী' গল্পে সামান্য চাকর কালী পরের গ্রামের মানুষের কষ্টলাঘবের জন্য নিজের বহুশ্রমে অর্জিত ৫২২ টাকা স্বেচ্ছায় সাঁকো তৈরীতে দিযে দিল। দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সে সাঁকোর কথা লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 'আনন্দময়ী দর্শন' গল্পে ব্যাণ্ডেলের ষ্টেশন মাষ্টার অতিকায় ও ভীষণদর্শন কাফ্রী ক্রিশ্চান মিঃ শেফার্ড, মুসলমান যুবক সুলতান, ইউরোপীয় ট্রেনের টিকিটপরীক্ষক মিঃ হার্ডি, সাধারণ বাঙ্গালী যুবক সতীশ সকলেই হৃদয-মাধুর্যের অনুপম প্রকাশে পাঠকের মন লুটে নিয়েছে। মিঃ হার্ডির প্রথম দর্শন প্রীতিকর নয়, কটভাষী কর্তব্যবিলাসী শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব, কিন্তু এই কঠিন বহিরঙ্গরূপের অন্তরালে তার স্নিগ্ধ কোমল মনটিকে খুঁজে বার করে অনুপম-ভঙ্গিতে পাঠককে উপহার দিয়েছেন কেদারনাথ। উৎসব প্রাক্‌কালে ওড়নাখানি উপহার দিয়ে আদরের বোন সেলিনার মুখে হাসি ফোটার মধুর কল্পনা করতে করতে বৈঁচি ষ্টেশন থেকে নিজের গ্রামের পথে রাত্রির অন্ধকারে পা বাড়ালে সুলতান, আর তার সেই দুরূহ যাত্রাকে সম্ভব করার পর ফেরবার ট্রেনের জন্য বৈঁচি ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলেন মিঃ হার্ডি। কেদারনাথ লিখছেন ঃ

"মিঃ হার্ডি এবার জ্যোৎস্নাখচিত চন্দ্রাতপ তলে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া উদাসভাবে বসিলেন। তাঁহার একমাত্র ভগ্নি সোফিয়ার কথা মনে পড়িল। দেড় বৎসর হইল সোফিয়া তাঁহাকে পরপর তিনখানি পত্র লেখে ও প্রত্যেকখানিতেই ভারতের রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির আর নূরজাহান ও তাজমহলের ফটো পাঠাইয়া দিবার জন্য আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ জানায়। • তিনি—"মিছে

কাজ” বলিয়া তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। আজ সেই বিস্মৃত কথা বার বার তাঁহাকে আঘাত করিয়া পীড়া দিতে লাগিল। সোফিয়ার অভিমান ভারাবনত চক্ষুর মধ্যে ভগ্নিত্বের অবমাননার নালিশ তিনি আজ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।”

কেদারনাথ প্রথম জীবনে বাংলার যে সমাজজীবন দেখেছিলেন তাতে ভাঙনের ইঙ্গিত ছিল সুস্পষ্ট। নীতিবোধ, শৃঙ্খলা এবং মানবিকতার অবক্ষয় যত্রতত্র পরিলক্ষিত হ'ত। বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত 'বাবু'-র দল তখন পারিবারিক জীবনে স-দাপটে বিরাজমান, ফলে কুলমহিলাদের দুর্দশার অনেকক্ষেত্রেই অন্ত ছিল না। এর বিপরীতে পতিতারা বরং সুখে থাকতো। সমাজজীবনে সর্বব্যাপী পুরুষ-প্রাধান্যের ফলে স্বভাবতঃই মেয়েদের মনে একটা অন্তর্নিহিত হীনতাবোধ ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, যার ফলে অবস্থাকে মানিয়ে নেবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃজাতির এই দুর্দশায় ব্যথিত হয়েছিলেন। অসহায়া কুললক্ষ্মীদের প্রকৃত মূল্যায়নের এবং তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। তার স্বাভাবিক ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লেখা “দেবী মাহাত্ম্য” এ হিসাবে এক অবিস্মরণীয় গল্প। প্রফুল্ল স্বচ্ছল গৃহস্বামী, কালাচাঁদ খুড়ো তাঁর দরিদ্র প্রতিবেশী। বলাবাহুল্য খুড়োর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন স্বয়ং কেদারনাথ। গল্পে বন্ধুপরিবৃত প্রফুল্ল ও খুড়োর কথোপকথনের একাংশ উদ্‌ধৃত হল :

“প্রফুল্ল—একদিন রাত্রে বেড়িয়ে এসে ডাকলুম,—দু মিনিট হয়ে গেল, উত্তর নেই—দোর খোলাও নেই। রাত তখনো সাড়ে বারোটা হয়নি হে! রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। সজোরে একটা লাথি মারতে খিলটা কোথায় ছিটকে গেল।

খুড়ো—এক লাথিতে, অ্যাঁ,—মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে। তারপর?

প্রফুল্ল—দেখি, লাণ্ঠান্ নিয়ে ছুটে আসছেন। খুকিটে চিল চেঁচাচ্ছে,—বরদাস্ত করতে পারলুম না,—লাণ্ঠানটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলুম।

খুড়ো—আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম,—এ সময়ে ও ছাড়া আর কিছু আসতেই পারে না,—fit ও করে না। আমি নিজে না পারলেও তোমাকে দুষতে পারি না। জোর থাকা চাই বই কি! আর নয়তো স্ত্রীপুরুষে প্রভেদ থাকে কোথায়?

প্রফুল্ল—শুনুন,—তারপর সাড়ে তিনমাস হয়ে গেল, আজও দোরের খিলটে হল না। সেটাও কি আমার কাজ?

খুড়ো—তুমি যে অবাক করলে বাবাজি! তুমিই ভাঙবে, আবার সারাতে হবে তোমাকেই? তাহলে ত যার অসুখ তাকেই ডাক্তার ডাকতে ওষধ আনতে যেতে হয়।"

এই 'দেবী মাহাত্ম্য' গল্পের মতই আর একটি সার্থক গল্প 'নামঞ্জুর'। অবশ্য 'নামঞ্জুর'-এ কেদারনাথ ব্যঙ্গের সাহায্য নেননি। এতে স্বার্থপর-দুর্নীতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের রূপ তিনি দেখিয়েছেন 'মাস্টার বৌ' চরিত্রে—সতীলক্ষ্মী প্রথমা স্ত্রী 'ক্ষ্যান্ত' থাকা সত্ত্বেও মাধব মোহবশে যাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। 'ক্ষ্যান্ত'র বিপরীতে এ গল্পে 'মাষ্টার বৌ' একেবারে ম্লান। গল্পটিতে জটিল সমস্যার সুলভ সমাধান হয়েছে সন্দেহ নেই এবং সে হিসাবে আর্টের বিচারে গল্পটির দাম কমে গেছে, কিন্তু তাহলেও নিগৃহীতা, অবহেলিতা বাংলার পুরস্ত্রীদের জন্য কেদারনাথের বেদনাবোধ এতে চমৎকার ফুটেছে।

বাংলার শ্যামল প্রকৃতিকে কেদারনাথ যেমন ভালবাসতেন, তেমনি ভালোবাসতেন তার মানুষগুলোকে। বাঙালীর দোষ, হীনতা বা অধঃপতন তাঁকে মর্মাহত করত। তাদের সবদিক থেকে মানুষ করে তোলবার জন্য সাহিত্যিক কেদারনাথ সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন এবং এর জন্যই তিনি বিশেষ করে ব্যঙ্গের

সাহায্য নিয়েছেন। বাঙালী হৃদযবান হোক, কর্মী হোক, নিজেদের ঐতিহ্য আর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সম্ভাবনা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলুক,—এই ছিল কেদারনাথের আকাঙ্খা। 'আমরা কি ও কে' গ্রন্থের গল্পগুলি প্রধানতঃ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখা। গ্রন্থের নামগল্পে বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতাব বিপরীতে তিনি একটি অত্যুজ্জ্বল অথচ অতিসাধাবণ মাতাল ইংরেজ নাবিকের ছবি এঁকেছেন। এই নাবিকটি হাওড়া সেতুব উপর যেতে যেতে ঝড়জলের মধ্যে অসুস্থ বাঙালী তরুণ কিশোরীর প্রাণরক্ষা করল নিজের পানে না তাকিয়ে, অথচ কলকাতা থেকে গঙ্গাভিমুখী বাঙালীর দল কিশোরীকে পড়ে থাকতে দেখেও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আত্মরক্ষার চেষ্টায় দ্রুতপায়ে অন্তর্ধান হ'ল। এখানেও কেদারনাথ কালাচাঁদ খুড়োর বেনামীতে উপস্থিত হয়েছেন এবং ক্ষুরধার ব্যঙ্গের আঘাতে স্বদেশবাসীর চৈতন্য ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। গল্পের শেষে অসুস্থ কিশোরীকে তার সন্তান শ্রীরামপুরের গাড়ীতে তুলে দিয়ে শ্বেতাঙ্গ নাবিক ফিরলো। কালাচাঁদ খুড়ো তার ফিরে যাওয়ার চিত্র বর্ণনা করছেন :—

> "দূর থেকে দেখা গেল,—যাকে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বেপরোযা হাওয়ার মত হঠাৎ মোড় ফিবে এসে পড়ায পেয়েছিলুম. সে নির্বিকার স্বাধীন হাওয়ার মত—সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই চলেছে। তার কোথাও বাধা সঙ্কোচ, ভেদাভেদ নেই। আশ্রয় তাকে বাঁধতে পারেনি। বিলিতি bindingএর (মলাটের) জীবন্ত বেদান্ত।"

এইভাবেই বাঙালীর দুর্বলতার উপর কেদারনাথ ব্যঙ্গের কুঠারাঘাত করেছেন 'দাদার দুরভিসন্ধি' গল্পে। বড়ভাই জগৎ প্রবাসে চাকুরী করে. ছোটভাই শশী বাড়িতে থেকে ক্রমেই সঙ্গদোষে অল্পবয়সেই সাবালকত্ব লাভ করছে। লেখাপড়া শশী ইস্তফা দিতে চায়, শিক্ষক বিধু মাষ্টার সমর্থন করলেন তাকে :—

"যাদের নষ্ট করবার টাকা আছে তারা চিরদিন পড়ুক

না, তা নাতো আমাদের চাকরী থাকবে কেন? তোমার সঙ্গে তো সেকথা নয়, তুমি আমাদের নমস্য ঘোষাল মশায়ের ছেলে। যা শিখেছ, তা গেরস্থ ছেলের জন্য যথেষ্ট। ওর ওপরে গেলেই—কবিতা লেখা আর কাগজে জ্যাঠামি করা বাড়ে বৈত না। তোমাকে সে কুপরামর্শ দিয়ে আমি পাপ বাড়াতে পারব না। লেখাপড়া যদি জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধির জন্যে হয়, আর ঘোষাল মশায়ের বুদ্ধির যদি এক কাঁচ্চাও পেয়ে থাক তো কোনও মাড়োয়ারী বাচ্চাও তোমাকে হঠাতে পারবে না—এ আমি গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলতে পারি। আর যদি রোজগারের কথা তোল, পশুপতিবাবুর কাছে শুনেছি জগৎ বেশ দুপয়সা কামাচ্ছে। তোমার চারদিকে চটকলের কুলি আর কন্যাদায়গ্রস্ত কেরাণী, সেই টাকা আনিয়ে মোটা-সুদে ছাড়লে একটা হৌসের মুৎসুদ্দির মোটা রোজগার ঘরে বসেই করতে পারবে। হিসেব যখন হাসিল করেছ, তোমার আবার ভাবনা কি, টাকা লাফিয়ে বাড়বে। বুদ্ধির 'টেস্ট্' টাকা রোজগার।"

ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর দেশে শান্তিশৃঙ্খলা আনবার সংকল্প নিয়েই লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারী প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। সমাজের উচ্চস্তর থেকেই প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই মহান কাজটি নৈরাশ্যজনক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। জমিদার সম্প্রদায়ের আত্মকেন্দ্রিকতা, আলস্য, দম্ভ, বিলাসিতা ও অমিতাচারের হীনতা বাঙলার সমাজ-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করল। সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনার শোচনীয় পরিণতি কেদারনাথ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনপন্থী হয়েও সমর্থন করতে পারলেন না। 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি' শীর্ষক হাস্যরসাত্মক গল্পটিকে এই জমিদারের ব্যঙ্গচিত্রই তিনি এঁকেছেন। গল্পটির প্রথম কয়েকটি লাইন পড়লেই কেদারনাথের বক্তব্য এবং আকাঙ্ক্ষা অনবহিত পাঠকের কাছেও ধরা পড়বে ঃ—

"চৌধুরী মশাই ছিলেন গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত সম্মানিত স্থূলকায় মাতব্বর,—ছ-আনি জমিদার। বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, সটকায় রাখা অনির্বাণ বাড়বানল,—সবই তাঁর ছিল। আর ছিল—তাস, পাশা, অহিফেন আর সান্ধ্য মজলিস্ ;—এই চতুর্বেদচর্চা। অহিফেনটা তিনি আহার করতেন,—সাত সের দুধে দু'ভরি আফিং সুপক্ক হলে তার সরখানি তিনি ভোগে লাগাতেন, দুগ্ধটা পার্শ্বদদের মধ্যে অধিকারী মত বণ্টন হত।

'ভৃত্য নন্দার প্রধান কাজ ছিল,—গো-সেবা, দুগ্ধ-প্রস্তুত আর কল্কে বদলে দেওয়া। আর যে কাজটি ছিল সেটি সে দুধ জ্বাল দিতে দিতেই সেরে রাখতো। কথা বার্তার জবাব সে চোখ বুজেই দিত।

'চৌধুরী মশাই কখনো কখনো আন্দাজে বলতেন—"নন্দা, ঝিমুচ্ছিস বুঝি! খবরদার বেটা, দোর গোড়ায় বসে ঝিমুলে গেরস্তোর অকল্যাণ হয় জান না পাজি, দূর করে দেব!

'নন্দা চোখ বুজেই বলতো—"আপনি দেখলেন কখন হুজুর!"

কথাটা ঠিক, শুনে চৌধুরী মশাই খুসীই হতেন। বড়লোকের বিশেষ জমিদার লোকের, চোখ চেয়ে থাকাটা একেবারেই ভাল নয়, লোকসেনে লক্ষণ। প্রজা বেটারা চোখ দিয়ে ভিতরে ঢুকে বাঁধি ব্যবস্থা বিগড়ে দেয়,—মতলব হাসিল করে নেয়,—দুঃখকষ্ট মাখানো মুখ দেখিয়ে অকস্মাৎ দয়া টেনে বার করে বসে। এটা ছিল তাঁর পিতৃবাক্য। চোখ চাওয়ার তরে পড়ে রয়েছে ভস্মলোচনেরা—নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা।"

বাঙালীর মত বাংলা সাহিত্যকে কেদারনাথ প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন যাতে বাড়ে তার জন্য

সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতেন। অবসর গ্রহণের পর কাশীতে গিয়ে ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগের চেয়ে সাহিত্যচর্চায় তিনি নিজেকে অধিকতর ব্যাপৃত রাখতেন। তাঁর উপন্যাস "আই হ্যাজ"-এ আছে, কাশীতে কালীকুমারকে তিনি বলছেন,—

"তুমি ভাই বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু আর শরৎবাবুর যা লেখা বেরিয়েছে, তাই ভাল করে দেখ,—বারবার—আর কিছু দেখ আর না দেখ। রসে, সৌন্দর্যে, শিল্পে আমাদের অমন সম্পদ রামায়ণ মহাভারত ছাড়া আর কোথাও আছে কি না আমার জানা নেই।"

মাইকেল মধুসুদন সম্পর্কেও তাঁর শ্রদ্ধা কি রকম গাঢ় ছিল কোষ্ঠীর ফলাফলের মূল চরিত্রের দেওঘরে নাতজামাইয়ের সঙ্গে কথোপকথনের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাবে—

"আবার আমাদের মধুকবি ব্যারিষ্টার মাইকেল ক'দিন ধরে এক নাপিতের মামলা—কয়েকটা কবির গান শুনে করে দিয়েছিলেন ; তাইতেই হাজার টাকার খোলের ফাঁকটা উপচে উঠেছিল।

শ্রীমান—আর তাই শেষ অবস্থাটাও খুব শোচনীয়,—মলেনও দাতব্য চিকিৎসালয়ে।

'বলিলাম্—"মলেন ! না—মরাকে বাঁচালেন ? কোন খবরই রাখ না বন্ধু। ত্রেতাযুগের মরা মেঘনাদকে সব যুগে অমর করে গেলেন, আর নিজেও অমর হয়ে রইলেন। তোমার মেটিরিয়েল 'মেশিনগানের' এত শক্তি নেই যে আর তাঁদের মারেন।"

কাশীতে একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের সাক্ষাতের সম্ভাবনা হয়। 'কবুলতি' গল্পগ্রন্থের "স্মরণে" গল্পে সেই প্রসঙ্গে তিনি বললেন,—

"শরৎবাবুকে দেখবার ইচ্ছাটা সত্যই প্রবল। যিনি বই-ছাড়াদের কেঁচে বই ধরিয়েছেন, তাঁকে দেখতে হবে বৈ

কি। খৃষ্টানই হয়েছি—তা বলে সরস্বতী পূজো করব না কেনো।”

এরপর যখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল, শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি যা বললেন তা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির এক নবমূল্যায়ন :—

“চরিত্রহীনে গৃহদেবতা নারায়ণকে অন্ন দেওয়ার ঘটনাটা নিয়ে কলেজ থেকে ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে বসে যে অনুতপ্ত অপরাধীটি শান্তিলাভার্থ ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, সে দিবাকর নয়, বোধ করি শরৎচন্দ্র। অন্ততঃ দিবাকরের প্রাণে যিনি অনুতাপ এনেছিলেন তিনি-আপনি। আবার অতবড় বিচার গর্বিতা বিদূষী কিরণময়ীর হাতে যিনি কালীঘাটের ফুলবিল্বপত্র দিয়ে তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করেছেন, তিনিও আপনি বই আর কেউ নন।”

তারপর শরৎচন্দ্র বিদায় নিলে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনার জের টেনে কেদাবনাথ বললেন যে—‘লোকটির লেখা পড়তুম আর অবাক হয়ে ভাবতুম—বাঃ কোথাও ফিকে মারছে না! ভাষার শক্তি আর সৌন্দর্যে ঘরের পরিচিত আটপৌরে জিনিষটিকেও কি উপভোগ্য করেই উপস্থিত করেন। কোথাও রঙের সাজগোজ নেই—উচ্ছ্বাসের উৎপত্তি নেই—সবই সহজ। আজ সেই মানুষটির চেহারায় আর পরিচ্ছদে সেই পরিচয়ই পেলুম।’

বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা সেবা ক'রে সমৃদ্ধ করেছেন সেইসব সাহিত্যরথীকে কেদারনাথ পাণ-প্রিয় মনে করতেন। তিনি নিজে সাহিত্যিক, কিন্তু যশোলাভের প্রশ্নে প্রতিযোগিসুলভ মনোভাব তাঁর ছিল না। মাতৃভাষার অন্য যশস্বী সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ প্রশস্তি করতে তাঁর মনে কখনো দ্বিধা জাগতো না। নিজের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি বঙ্গসাহিত্যরথীদের করকমলে উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত উৎসর্গপত্রগুলিতে তাঁর উদার গুণগ্রাহিতা প্রকাশমান :—

১। আমরা কি ও কে—গল্পগ্রন্থ—"আমার জীবন-সন্ধ্যায় ভাগ্যলব্ধ সুহৃদ্বর বিশ্ববরেণ্য কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে পরম শ্রদ্ধায় নিবেদিত" ;

২। আই হ্যাজ—উপন্যাস—"প্রথম জীবনে যাঁহার রচনা আমাকে রসসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে ও প্রেরণা দেয়,—সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে" ;

৩। কবুলতি—গল্পগ্রন্থ—"পরম শ্রদ্ধেয় রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের করকমলে" ;

৪। কোষ্ঠীর ফলাফল—উপন্যাস—"শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে" ;

৫। ভাদুড়ী মশাই—উপন্যাস—"যার অসীম প্রভাব কথিত চলতি ভাষাকে পুস্তকে পাংক্তেয় করে প্রকাশ চেষ্টাকে সহজ শক্তি দিয়েছে, সেই অশেষ শ্রদ্ধাভাজন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের করে—চলতি ভাষায় লেখা আমার এই সামান্য অর্ঘ্য অর্পণ করলুম" ;

৬। সন্ধ্যাশঙ্খ—গল্পগ্রন্থ—"শুভাশিসসহ প্রিয় বনফুলকে।"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্রষ্টা শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু মহৎ শিল্পীর সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণসাধন-ব্রতী হওয়ার জন্য তাঁকে সাধারণের বোধগম্য হ'তে অতিরিক্ত স্পষ্ট হতে হয়েছে এবং সেইসূত্রে 'ব্যঙ্গপ্রবণ হওয়ার জন্য তাঁর এই মহৎ শিল্পপ্রতিভা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয়েছে। কেদারনাথের রচনায় রূপসজ্জার শৃঙ্খলাভাব কিছুটা দেখা গেলেও তা নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কেদারনাথের সঙ্গে ডিকেন্সের তুলনা করেছেন। ডিকেন্সের অভিজ্ঞতা, ডিকেন্সের সংবেদনশীলতা,

ডিকেন্সের মানবতাবাদ এবং ডিকেন্সের সাধারণের মর্মভেদী পরিহাস-প্রিয়তার সমান্তরাল মানসরূপ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। কেদারনাথের প্রতিভা সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত প্রশংসাবাণীই শেষ কথা :—

"তোমার এই রচনার কুঞ্জে মরা ডাল শুকনো পাতা নেই বললেই হয়। তোমার চিত্রপট থেকে ছবিগুলো বেরিয়ে এসে কথা কইতে থাকে।"

(রবীন্দ্রনাথের পত্র, আপল্যাণ্ডস্, শিলং, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

যাদু ও সাহিত্য

শ্রীঅজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)

মার্কিণ সাহিত্য-জগতের দিক্‌পাল আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ভোরবেলা তাঁর বন্দুক পরিষ্কার করছিলেন, করতে করতে সেই বন্দুকের গুলিতেই তিনি মারা গেছেন।

কাগজে খবর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে প্রশ্ন জাগল : এটা কি অ্যাক্‌সিডেন্ট, না সুইসাইড ? আকস্মিক দুর্ঘটনা, না আত্মহত্যা ?

মনে ঠিক এমনি প্রশ্ন জেগেছিল যাদু-জগতের দিকপাল যাদুকর চুং লিং সু যখন মারা গেলেন বন্দুকের গুলিতে। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯১৭ সালে। কলকাতায় এখন যেখানে রক্সি তখন সেখানে ছিল এম্পায়ার। সেই এম্পায়ার থিয়েটারে তাঁর যাদু প্রদর্শনী সারা শহরে বিস্ময়ের যে সাড়া জাগিয়েছিল তেমন আশ্চর্য সাড়া তারপর এ শহরে দেশী বা বিদেশী কোনো যাদুকরই আজ পর্যন্ত জাগাতে পারেন নি। কলকাতায়—এবং ভারতের অন্যত্র—তিনি যে সব যাদুর খেলা দেখিয়েছিলেন তাদের ভেতর একটি ছিল বন্দুকের গুলি আটকানোর খেলা। দর্শকদের পরীক্ষিত এবং চিহ্নিত একটি গুলি বন্দুকে পোরা হতো। সেই গুলি মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে চালানো হতো, চুং লিং সু'র বক্ষ লক্ষ্য করে। একটি চিনেমাটির প্লেট দিয়ে সেই গুলিটি ঠেকিয়ে দিতেন অত্যাশ্চর্য চীনে যাদুকর চুং লিং সু। প্লেটে ঠেকে গুলিটি মঞ্চের ওপর পড়ে যেতো। তুলে দেখা যেতো সেটি দর্শকদের সেই চিহ্নিত গুলি।

এখানে এক এম্পায়ারে যে খেলা দেখিয়ে শিহরণ এবং সাড়া জাগিয়ে গেলেন চুং লিং সু, পরের বছর লণ্ডনে আরেক এম্পায়ারে

সেই খেলাটি দেখাতে গিয়েই মারা গেলেন তিনি। সেই এম্পায়ারের নাম উডগ্রীন এম্পায়ার। সেই করুণ ঘটনার তারিখ ২৩শে মার্চ, ১৯১৮ সাল। সেদিন ছিল সপ্তাহের শেষ দিন. শনিবারের শেষ প্রদর্শনী। শেষ খেলাটি ছিল এই বন্দুকের গুলি আটকানোর খেলা। এ খেলাটাই সব চেয়ে বেশি মারাত্মক, সব চেয়ে বেশি শিহরণ জাগানো। দুটি গুলি চালালেন দুজন বন্দুকধারী, একই সঙ্গে দুটি বন্দুক থেকে—মঞ্চের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে যাদুকর চুং লিং সু। বহুবার গুলি ঠেকিয়েছেন, এবার আর পারলেন না। দুটি বন্দুক গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন মঞ্চের ওপর, বহু কষ্টে বললেন "পর্দা ফেলে দাও।" মঞ্চের সামনে পর্দা ফেলে দেওয়া হলো। ঘণ্টা কয়েকের ভেতর চির অন্ধকারের পর্দা নেমে এলো চুং লিং সু'র জীবনে। অর্থাৎ সোজা ভাষায় তিনি মারা গেলেন।

পরে যথাকালে করোনার কর্তৃক তদন্ত হলো, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি রায় দিলেন: Death from misadventure—আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। কিন্তু বহু মনে এই সন্দেহ জেগে রইল ব্যাপারটা ঠিক দুর্ঘটনা নয়—হয়তো আত্মহত্যা। হয়তো কোনো কারণে জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন, হয়তো কোনো মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন, তাই পরের চালানো বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করবার এই যাদুকরোচিত অভিনব পন্থাটি অবলম্বন করেছিলেন অতুলনীয় যাদুকর চুং লিং সু।

নিজের হাতের বন্দুকের গুলিতে হেমিংওয়ের মৃত্যুর খবর পড়ে সঙ্গেই সঙ্গেই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল চুং লিং সু'র মৃত্যু কাহিনী। তাই সন্দেহ হয়েছিল হয়তো চুং লিং সু'র মতোই হেমিংওয়েও আত্মহত্যা করেছেন, তাঁর মৃত্যু আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। পরদিন খবরের কাগজ খুলে বুঝলাম আমার সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়; 'ডেইলি মেল,' 'নিউইয়র্ক মিরর' প্রভৃতি পত্রিকাও অনুরূপ সন্দেহ বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করেছে।

জানি না, কথাসাহিত্যিক হেমিংওয়ের মৃত্যু-রহস্য নিয়ে গবেষণা হবে কিনা, এবং হলে তার ফলাফল কি হবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার মতো আরো অনেকেরই মনে সন্দেহ জেগে থাকবে হেমিংওয়ে আত্মহত্যা করেছেন, আর জেগে থাকবে আরেকটি প্রশ্ন : কেন আত্মহত্যা করেছেন হেমিংওয়ে? ৬২ বছরের জীবনে চারজন স্ত্রীর স্বামী হয়েছেন তিনি। তবে কি তাঁর আত্মহত্যার মূলে সাংসারিক বা হৃদয়-ঘটিত কোনো কারণ ছিল? কিছুদিন আগে ক্যান্সার রোগে চিত্রাভিনেতা বন্ধু গ্যারি কুপারের মৃত্যুতে হেমিংওয়েকে শোকে অভিভূত দেখা গিয়েছিল—গ্যারি তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তবে কি বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনাতেই অধীর হয়ে আত্মহত্যা করেছেন হেমিংওয়ে? অথবা কি তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন জীবনের একঘেয়েমিতে? কথা-সাহিত্যের জগতে তিনি পেয়েছিলেন অসামান্য জনপ্রিয়তা, খ্যাতি, অর্থ, মর্যাদা। পেতে পেতে কি আরো পাবার আকাঙ্খা, আনন্দ বা শিহরণ লোপ পেয়ে গিয়েছিল, নূতনত্বের অভাবে? অর্থাৎ জীবনের থ্রিল (thrill) হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি? তাই ভেবেছিলেন জীবনটা তো অনেক দেখলাম, এতে আর কিছু নূতনত্ব মিলছে না; দেখা যাক মৃত্যুতে নূতনত্বের স্বাদ কিছু মেলে কিনা? তাঁর আত্মহননের মূলে সেই নূতনত্বের সন্ধান?

এই ধরণের এবং আরো অন্য ধরণের নানা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে হেমিংওয়ে সম্বন্ধে। কারণ তাঁর মতো সুদক্ষ শিকারী বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে মাথায় গুলির আঘাত পেয়ে মারা গেলেন এটাকে নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে বিশ্বাস করে নেওয়া শক্ত।

সাহিত্যিক হেমিংওয়ে সম্পর্কে কি হবে বলতে পারি না, কিন্তু যাদুকর চুং লিং সূ'র মৃত্যুর বহুদিন পরেও তাঁর মৃত্যু-রহস্য নিয়ে অনেক গবেষণা, অনেক লেখালেখি, অনেক আলোচনা হয়েছে, এবং সে রহস্যের চূড়ান্ত সমাধান আজও হয়নি। হওয়া হয়তো সম্ভবও

নয়। রহস্য-সৃষ্টি করাই যাঁর জীবনের ব্রত ছিল, মৃত্যুতেও তিনি একটি রহস্য সৃষ্টি করে রেখে গেছেন।

যেমন বিচিত্র চুং লিং সু'র মৃত্যু, তেমনি বিচিত্র ছিল তাঁর জীবন। কথাসাহিত্যের চমৎকার খোরাক। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর 'রয় দি মিষ্টিক' অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ রায়ের মুখে শুনেছি, চুং লিং সু যখন ১৯১৭ সালে কলকাতায় তাঁর যাদুর খেলা দেখিয়ে বাজার মাৎ করছিলেন, তখন তাঁর প্রত্যেকটি প্রদর্শনীতে কলকাতার চীনা বাসিন্দারা সাগ্রহে এবং সগর্বে ভিড় করত। তাদেরই স্বজাতীয় একজন যাদুকর এসে এই সুদূর কলকাতায় এমন অতুলনীয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করছেন দেখে তারা আনন্দে গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তারা টেরই পায়নি চুং লিং সু মোটেই চীনদেশী নন, আসলে তিনি চীনা ছদ্মবেশে মার্কিণ যাদুকর উইলিয়াম রবিনসন—যিনি প্রায় আঠারো বছর ধরে এই চীনা ছদ্মনামে আর ছদ্মবেশেই দুনিয়ার যাদুরসিকদের চোখে ধুলো দিয়ে আসছেন। আমেরিকায় এবং ইংল্যাণ্ডে আসল চীনা যাদুকর চিং লিং ফু'র সঙ্গে এই নকল চীনা যাদুকর চুং লিং সু'র যে পেশাদারী লড়াই চলেছিল, সে কাহিনীও কথাসাহিত্যের চমৎকার খোরাক।

যাদু-জগতের আরেকটি দিক্‌পাল চরিত্র-বৈচিত্র্যে কথাসাহিত্যে স্থান দাবী করতে পারেন; তিনি হচ্ছেন যাদুকর "লাফায়েৎ"। লাফায়েৎ-এর একটি প্রিয় বাণী ছিল, এটি তাঁর বাড়ীর প্রবেশদ্বারে এবং ঘরের দেয়ালে ঝুলানো বোর্ডে লেখা থাক্‌তো:

"The more I see of men, the more I love my dog."

এই বাণীটিকে তিনি অমন ফলাও করে প্রাধান্য দিতেন, যা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে মানব-চরিত্রের পরিচয় নানা ভাবে পেয়ে পেয়ে তিনি সার বুঝেছিলেন মানব-চরিত্রের চাইতে কুকুর-চরিত্র মহত্তর, মধুরতর। বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা চলে, যাদুকর লাফায়েৎ অন্তত তাঁর যুগের চ্যাম্পিয়ন কুকুর-প্রেমিক। মানুষের সমাজ থেকে

তিনি নিজেকে যথাসাধ্য দূরে সরিয়ে রাখতেন, এমন কি যাদুকরদের সমাজেও মিশতেন না। যাদুজগতে তাঁর বন্ধু ছিলেন শুধু হ্যারি হুডিনি, হোরেস গোল্‌ডিন প্রমুখ দু-চারজন প্রথম শ্রেণীর যাদুকর। ফলে যাদুকর-সমাজের তিনি ছিলেন পরম অপ্রিয় পাত্র। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

কুকুরটিকে খুব বাচ্চা বয়সে যাদুকর হুডিনি উপহার দিয়েছিলেন লাফায়েৎকে। বাচ্চাটির রূপের বালাই ছিল না বললেই চলে, কিন্তু লাফায়েৎ তার নাম দিয়েছিলেন 'বিউটি'। কুকুর নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠেছিলেন যে তাঁর মনের কথাটা বৈষ্ণব কবির ভঙ্গিতে বলা যেতে পারতো ঃ

"উঠিতে কুকুর বসিতে কুকুর
কুকুর করেছি সার।"

একবার এক অল্পবুদ্ধি ছোক্‌রা লাফায়েৎ-এর সামনেই তাঁর বিউটি-বিহীন 'বিউটি' কুকুরটির চেহারার সমালোচনা করেছিল। লাফায়েৎ নীরবে উঠে গম্ভীরভাবে তার ঘাড় ধরে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিলেন।

এই কুকুরপ্রীতির পথে তিনি এতদূর এগিয়েছিলেন যে কুকুরটিকে রোজ ডিনার টেবলে রীতিমতো মানুষী কায়দায় ডিনার খাওয়াতেন। বিউটির ডিনার খাওয়ার সময় বাবুর্চি এসে তার কলারের তলায় রুমাল গুঁজে ঝুলিয়ে দিয়ে যেতো।

মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই লাফায়েৎ এই ইচ্ছা জানিয়ে রেখেছিলেন, যেন মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির ওপর তাঁর প্রিয় কুকুর 'বিউটি'র একটি প্রতিকৃতি ক্ষোদাই করা থাকে। এখানে বলে রাখি, তাঁর সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করা হয়েছিল। চুং লিং সূ'র মতোই লাফায়েৎ-এর মৃত্যুও কিছুটা রহস্যময়।

লাফায়েৎ জাতিতে জার্মাণ ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল সিগমণ্ড নয়বার্গার; তিনি মারা গিয়েছিলেন এডিনবরা সহরের এম্পায়ার থিয়েটারে আগুনে পুড়ে, ১৯১১ সালে। পাছে স্টেজের দরজা দিয়ে

ঢুকে কেউ তাঁর কোনো যাদুর খেলার গুপ্ত কৌশল জেনে ফেলে সেই ভয়ে তিনি সে দরজাটি তালাবন্ধ করিয়ে রেখেছিলেন। এক সন্ধ্যায় স্টেজের ভেতর পর্দায় আগুন ধরে গেল, দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। পিছনের দরজা দিয়ে লাফায়েৎ পালাতে গেলেন, কিন্তু তখন খেয়াল হলো তারই নির্দেশে দরজা তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ছুটে এলেন স্টেজের সামনের দিকে। জ্বলন্ত পর্দার আড়াল ভেদ করে আসতে পারলেন না, পড়ে গিয়ে পুড়ে মারা গেলেন। লাফায়েৎ-এর মৃত্যু সম্বন্ধে নানারকমের কিম্বদন্তী এবং অনুমান প্রচলিত আছে। একটি কিম্বদন্তী এই যে, স্টেজের ভেতরের সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ড থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন, কিন্তু বেরিয়ে এসেই তার মনে হলো তাঁর প্রিয় সাদা ঘোড়াটি বন্দী রয়েছে ভেতরে! তাকে মুক্ত করে নিয়ে না এলে অসহায় ভাবে দগ্ধ হয়ে মরবে বেচারা। যাদু প্রদর্শনে মানবেতর প্রাণীর ব্যবহার প্রথম প্রবর্তন করেন যাদুকর লাফায়েৎ। তাঁর একটি চমকপ্রদ নয়নাভিরাম খেলায় এ ঘোড়াটি সুসজ্জিত হয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হতো। অনেক দিনের প্রিয় সাথী এই বিশ্বস্ত ঘোড়াটির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলেন না লাফায়েৎ। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ঘোড়াটির প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঢুকে গেলেন সেই অগ্নিকুণ্ডের ভেতর। বাঁচাতে পারলেন না ঘোড়াটিকে। নিজেও মারা গেলেন সেই আগ্নেয় নরকে। মানবপ্রীতির চাইতে মানবেতর জানোয়ারপ্রীতি যাঁর বেশি ছিল, একটি মানবেতর জানোয়ারকে বাঁচাতে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হলো।

আরেকটি কিম্বদন্তী এই যে, অগ্নিকাণ্ডের পর আগুনে ঝলসানো ভীষণভাবে বিকৃত যে মৃতদেহটি লাফায়েৎ-এর বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেটি লাফায়েৎ-এর নয়, অন্য কোনো ব্যক্তির; লাফায়েৎ প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে পেরেছিলেন, তারপর চিরদিনের জন্য গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বলেই তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি।

এই কিম্বদন্তীটিকে সত্যি বলে মেনে নেওয়া শক্ত বটে, কিন্তু

একেবারে বাতিল করে দেওয়াও চলে না। অমন খামখেয়ালী লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

আগুনটা কি করে লেগেছিল, সে ব্যাপারটিও রহস্যময়। কেউ কেউ বলেন, আগুন লাগাটা দৈবাতের ব্যাপার। আবার কেউ কেউ সন্দেহ করেন, আগুন লাগানো হয়েছিল শক্রতা করে, যদিও খুব সম্ভব শুধু লাফায়েৎ-এর বড় রকমের লোকসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে, তাঁকে প্রাণে মারবার জন্যে নয়।

বিদেশী যাদুকর লাফায়েৎ-এর প্রিয় বাণীটির কথা বলেছি, যা ভোলা শক্ত :

"The more I see of men, the more I love my dog."

একজন এদেশী যাদু-ওস্তাদের একটি মনে রাখবার মতো বাণীও মনে পড়েছে। এই ওস্তাদটির ছিল নানারকম হাত-সাফাই-প্রধান যাদুর খেলায় অসামান্য দক্ষতা। পথের ধারে বা ময়দানে এমন অনেক যাদুর খেলা দেখাত সে, যা দেখে মনে হতো সত্যিকারের মিরাক্‌ল্‌, অসাধ্য সাধন।

অসাধারণ যাদুশিল্পী ছিল এই প্রায়-নিরক্ষর লোকটি, তার দোষের ভেতর ছিল মাঝে মাঝে পরের পকেট সাফ করা এবং সাগরেদদের তালিম দিয়ে দিয়ে ও বিদ্যায় পোক্ত করে তোলা। Dickens-এ Oliver Twist উপন্যাসের Fagin-এর মতো। ওস্তাদের নামটা নেপথ্যে রেখেই বলি, সাগরেদদের প্রতি তার বাণী ছিল "আপনা দিল সাফ রাখনা, ঔর দুসরোকি পাকিট সাফ করনা।" অর্থাৎ

"সাফ রেখে হরদম আপনার চিত্ত
পরের পকেট সাফ করে যাও নিত্য।"

যদিও বর্তমান জগতে পরের পকেট সাফ করাটাই নীতি, এবং খুচরো পকেটমারেরা যে-সমাজে ঘৃণিত, সেই সমাজেই পাইকারী পকেটমারেরা সম্মানিত, তবুও ওস্তাদের এই পরের পকেট সাফ

করবার সাধনা আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু যাদুশিল্পে সে যে একজন অসাধারণ শিল্পী, সে কথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারিনি। তা ছাড়া একটু সান্ত্বনা বোধ করেছিলাম ওস্তাদের দেওয়া এই আশ্বাসে, গরীব-গরবার পকেট মারা তারা গুনাহ্ বা মহা অপরাধ বলেই মনে করে, তারা মারে বেছে বেছে শুধু সেই সব পকেট যাতে আছে ফালতু টাকা, কাপ্তানী করে ওড়াবার টাকা, অপব্যবহার করবার টাকা। অনেক পকেটের ভেতর থেকে বেছে বেছে ঠিক সেই সব পকেট চিনে নেওয়া সম্ভব কিনা প্রশ্ন করায় ওস্তাদ হেসে বলেছিল "ও স্যার আমরা টের পেয়ে যাই।" কথাটা যে একেবারে হেসে বা তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেবার নয় তা আমি খানিকটা বিশ্বাস করি ; কারণ পাঁচটি ইন্দ্রিয় কাজে লাগাতে লাগাতে এদের যে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অদ্ভুতভাবে গড়ে ওঠে তা আমি একাধিক বার টের পেয়েছি।

এই প্রসঙ্গে কবি ম্যাথু আর্ণল্ডের বিখ্যাত কবিতা "Scholar Gipsy"র কথা মনে পড়ছে। অক্সফোর্ডের পড়ুয়া ছেলেটি অক্সফোর্ড ছেড়ে ভিড়ে গিয়েছিল যাযাবর জিপসিদের দলে, তাদের রহস্যময় গুপ্তবিদ্যাটি আয়ত্ত করবে বলে। সেই গুপ্তবিদ্যাটি হচ্ছে প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অন্যের ইচ্ছা, চিন্তা এবং কার্য প্রভাবান্বিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা। এবং তা যদি করা যায় তাহলেই অন্যের মনের কথা পুঁথি পড়ার মতো বলে দেওয়া যায়—এ-ও এক রকমের অত্যাশ্চর্য যাদুর খেলা।

কবিতাটি ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে ম্যাথু আর্ণল্ডের অনবদ্য অবদান। অনেকেরই ভালো লেগেছে, আরো অনেকেরই ভালো লাগবে। আমার ব্যক্তিগতভাবে আরো বেশি ভালো লেগেছে এই জন্যে যে, আমি অক্সফোর্ডের সেই পড়ুয়াটির মতো বিদ্যায়তন ত্যাগ করে যাযাবরদের দলে ভিড়ে না গেলেও অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি বেছে বেছে সেই সব যাযাবরদের সঙ্গে, যারা যাদুবিদ্যায় দক্ষ, কারণ গত ত্রিশ বছর ধরে সাহিত্যের নেশার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি নেশা আমার ওপর ভূতের মতো ভর করে আছে—যাদুর নেশা। সাহিত্যের সঙ্গে যাদুর

একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমি অনুভব করি, কারণ তলিয়ে দেখলে সাহিত্যও তো এক রকমের যাদু। এবং বিস্ময় সৃষ্টির কলা বা আর্টকে যারা পেশা এবং নেশা হিসেবে নিয়েছে তাদের বিচিত্র জীবনে ছড়িয়ে আছে সাহিত্যের অফুরন্ত খোরাক, বিশেষ করে কথা-সাহিত্যের।

সাহিত্য এবং যাদু—এই দুয়ের ভেতর একটি বিশেষ রকমের সাদৃশ্য দেখতে পাই, দুটোই এক ধরণের খোদার ওপর খোদকারি। বাস্তব জীবনে যা ঘটছে, অর্থাৎ ভগবান যা ঘটাচ্ছেন, সেই ঘটনা-গুলির কিছু গ্রহণ, কিছু বর্জন, কখনো বা পারম্পর্য পরিবর্তন করে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে সাহিত্যিক করছেন নতুন সৃষ্টি—বিশ্বস্রষ্টার মতোই স্রষ্টার ভূমিকায় অভিনয় করছেন সাহিত্যস্রষ্টা মানুষ।

এবার যাদুর কথা যদি ধরি তো দেখতে পাই—বিশ্বের সর্বপ্রথম এবং সেরা যাদুকর হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, যিনি সৃষ্টি করেছেন বিস্ময়ে ভরা এই বিশ্ব। 'পানিমে মীন পিয়াসীর' মতো বিস্ময়ের মহাসমুদ্রে ডুবে আছি বলেই আমাদের চোখের সামনে প্রতিদিন দেখা বিস্ময়কে বিস্ময় বলে চিনতে পারছি না। বাইবেলে আছে God said, let there be light and there was light. ঈশ্বর বললেন আলোর আবির্ভাব হোক। অমনি সঙ্গে সঙ্গে আলো আবির্ভূত হোলো। এ ম্যাজিক বা যাদু ছাড়া আর কি? বিশ্বের প্রথম যাদু। পৃথিবী সৃষ্টি করে ভগবান তুলে নিলেন এক খামচা মাটি, তাইতে ফুঁ দিয়ে প্রাণসঞ্চার করে তৈরি করলেন আদি মানুষ আদম। আশ্চর্য ম্যাজিক।

যাদুকর রাজা বোস তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিখ্যাত উক্তির ঈষৎ পরিবর্তিত প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন:

> বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
> ছাড়ি কোথা খুঁজিছ বিস্ময়?

বলেছিলেন,—

"বিশ্ব যাছুকরের যাছুতে চাঁদ সূর্য উঠছে ডুবছে, কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটছে, ছোট্ট বীজ থেকে বেরোচ্ছে বিরাট বটবৃক্ষ। এসব দেখে লোক বিস্ময় বোধ করে না, বিস্মিত হয় আমাদের খালি টুপি থেকে খরগোশ বার করতে দেখে, কিংবা হাত বুলিয়ে রুমালের রং বদলাতে দেখে। এর চাইতে বড়ো তামাসা আর কি হতে পারে? অবশ্য এই তামাসা আছে বলেই আমরা করে খাচ্ছি।"

প্রথম জীবনে তিনি কি রকম ছিলেন জানি না, আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং অন্তরঙ্গতা হয়েছিল তাঁর শেষ বয়সে, যখন তাঁর মনে এসেছিল জীবন-দার্শনিকতা। তিনি খানিকটা রহস্য করে, খানিকটা গভীর অনুভূতির সঙ্গে বলেছিলেন "There is divinity in Magic. ভগবান বিরাট যাছুকর, আর আমরা ক্ষুদে যাছুকর, কিন্তু যাছুকর তো বটে! যতো তুচ্ছই হই না কেন, আমরা প্রত্যেক যাছুকর ভাবতে পারি ভগবান আর আমি—both belong to the same profession. আমাদের একই পেশা। ভগবান সৃষ্টি করেন খাঁটি বিস্ময়, আমরা সৃষ্টি করি নকল বিস্ময়।"

এই ভাবটাই আমাদের দেশী ভ্রাম্যমান যাছুকরদের মধ্যেও প্রচলিত, যারা আধুনিক শিক্ষায় অশিক্ষিত। চলতি ভাষায় এদের বলা হয় 'মাদারি'। ভারতীয় যাছুর ঐতিহ্য এরাই বজায় রেখেছে বংশানুক্রমিক ধারায়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন, এদেরও তেমনি বিভিন্ন ঘরানা আছে, বিভিন্ন ওস্তাদ আছে। এদের প্রধান নমস্য হচ্ছেন বিশ্বের পয়লা নম্বর যাছুকর, ছু নম্বর নমস্য এদের যাছু-ওস্তাদ। এই ছুজনের নাম স্মরণ করে এবং এদের শ্রদ্ধা জানিয়েই এরা যাছু প্রদর্শন শুরু করে।

এই হলো এদের সাধারণ বিশেষত্ব, যাকে বলা যায় common characteristics. আমি কৌতূহল বোধ করেছি সাধারণ বিশেষত্বের নেপথ্যে এদের বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী

সম্বন্ধে। কৌতূহলে যে সব সময়ে সাড়া মিলেছে তা নয়, কিন্তু যতখানি পেয়েছি তাও কিছু কম নয়। এই তথাকথিত সাধারণ অশিক্ষিত মানুষদের জীবনের বিচিত্র কাহিনীতে পেয়েছি প্রচুর অসাধারণত্বের স্বাদ ; আর ভেবেছি, সাহিত্যে এরা অবহেলিত থাকা সাহিত্যেরই দুর্ভাগ্য। এদের বিচিত্র হাসি-কান্না কমেডি-ট্রাজেডি সাহিত্যে রূপান্তরিত হলে সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়বে, সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।*

---

* রবিবাসরে পঠিত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি হতেই অ. কৃ ব. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'যাদুকাহিনী' প্রণয়নে উৎসাহিত হন এবং কালক্রমে 'যাদুকাহিনী' দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হতে নরসিংদাস আগরওয়ালা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। গ্রন্থখানির হিন্দি অনুবাদও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বঙ্গীয় নাট্যশালার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী, বি. এল

কলিকাতার আদিম যুগে "দি প্লে হাউস" নামে একটি সৌখীন মিলন সঙ্ঘ বা ক্লাব অবস্থিত ছিল বর্তমান লালবাজার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার ৮ নং লালবাজার স্ট্রীটে। সেখানে কোন অভিনয় হতো না —উহা ছিল তৎকালীন সাহেবদের 'নাইট' ক্লাব। কিছু দিন পরে সেই 'নাইট ক্লাব' উঠে গেল। পরে গড়ে উঠলো একটি সৌখীন নাট্যশালা, বর্তমান 'রাইটার্স বিল্ডিংস'-এর পিছনে,—নাম 'নিউ প্লে হাউস'—সাধারণ প্রচলিত নাম হ'ল "কলিকাতা থিয়েটার"। এই সৌখীন "থিয়েটার" হ'ল বাংলা নাট্যশালার প্রথম ভিত্তি বা সোপান।

১৭৭৫ হ'তে ১৮ ৮ সাল অবধি এই বিদেশী সাহেব মেম কর্তৃক অভিনীত রঙ্গমঞ্চে তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর স্ত্রী মিসেস ব্রিস্‌টোস অদ্ভূত অভিনয় করতেন। তিনি দেখতে ছিলেন সুন্দরী, অভিনয় করতেন অপূর্ব—সহ অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিলেন সাহেব ও মেম। সকলেই সৌখীন অভিনেতা ও অভিনেত্রী। থিয়েটারের নাম লোকমুখে মিসেস ব্রিসটোস থিয়েটার নামে পরিচিত হয়ে সেই সময়ে কলিকাতা সহরে বিপুল উদ্দীপনা ও রস সৃষ্টি করল। মিসেস ব্রিসটোসের অপরূপ রূপলাবণ্য ও অভিনয় নৈপুণ্য কোম্পানীর বড়কর্তাদের মুগ্ধ করেছিল। ১৮৮৯ সনের ১৫ই অক্টোবর এই সম্প্রদায় ভারতীয় নাটক 'ফ্যাটাল রিং' বা শকুন্তলা অভিনয় করেন।

তারপর মিঃ লেবেডফ নামক একজন রাশিয়ান বাদ্যকার কলিকাতায় এসে চীনাবাজার-ডুমতলায় একটী পেশাদারী থিয়েটার

'লেবেডফের নিউ থিয়েটার বা বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে একটা রঙ্গমঞ্চ খুললেন। পরবর্তী কালে তিনি একজন বিখ্যাত অভিনেতা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভারতচন্দ্রের কবিতার সংগীত রূপায়ন সেই থিয়েটারের 'অরকেসট্রায়' গীত হতো।

এই সব সম্প্রদায়ের নাটক অভিনয় তৎকালীন বাঙ্গালীদের প্রাণে বাংলায় থিয়েটার করবার প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এই উৎসাহের ফলে—১৮৩২ সালে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক "হিন্দু থিয়েটার" ও নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের "শ্যামবাজার থিয়েটার"-এর আবির্ভাব হয়। এই দুই বিখ্যাত নাগরিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার' মঞ্চস্থ করল "উত্তর রাম চরিত" নাটক ও "শ্যামবাজার থিয়েটার" কর্তৃক অভিনীত হ'ল "বিদ্যাসুন্দর" ; বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়। পূর্বে স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হ'ত সুদর্শন যুবকদের দ্বারা কিন্তু নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁর "শ্যামবাজার থিয়েটারে" বিদ্যাসুন্দর নাটকে সর্বপ্রথম মেয়ে চরিত্রে মেয়ে অভিনেত্রী অবতীর্ণ করান বাংলা রঙ্গমঞ্চে। অবশ্য এইটি সৌখীন থিয়েটার—পেশাদারী বা পাবলিক থিয়েটারের জন্ম হয় নি সেই সময়ে।

যাত্রা, কবিগান, তর্জা, বাইনাচ, খেমটা ইত্যাদি ছিল তৎকালীন আভিজাত্য, সমাজপতি বা বড়লোকদের খেয়াল ও ব্যসন। সাহেব মহলে থিয়েটার দেখে রাজা মহারাজা ও বনেদী বাঙ্গালী সমাজে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার করবার উৎসাহ জাগল। মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যময় বাগানবাড়ী 'বেলগাছিয়া ভিলায়' গড়ে উঠল একটি পাকা রঙ্গমঞ্চ—নামকরণ হ'ল "বেলগাছিয়া থিয়েটার" —দেড় বছর 'রিহার্সাল' দেবার পরে ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে মঞ্চস্থ হল বাংলা নাটক "রত্নাবলী"। সেই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আর সংগীত পরিচালনা করলেন স্বয়ং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

স্ত্রী চরিত্র অভিনয় করল সুদর্শন যুবকবৃন্দ। অভিনয় হয়েছিল খুব চিত্তাকর্ষক। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট নাগরিক "রত্নাবলী" অভিনয় দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁদের পরবর্তী নাটক "শর্মিষ্ঠা"-ও সেইরূপ প্রশংসা অর্জন করল। সেই যুগে রেভাঃ কেশবচন্দ্র সেন ও ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রভৃতি ব্যক্তিরা অভিনয় ভালবাসতেন এবং তাঁরা নিজেরা অভিনয় করেছেন সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ে। এমনি করে গড়ে উঠল "পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার", 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার", ও "বহুবাজার থিয়েটার"—এইগুলি সবই সৌখীন নাট্যসংঘ। আর দর্শকবৃন্দ ছিলেন তৎকালীন অভিজাত বংশধর, বিশিষ্ট নাগরিক, বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও তাঁদের আত্মীয় গোষ্ঠী বা তাঁবেদার— সাধারণ গৃহস্থ বা ব্যক্তিবর্গের সেখানে প্রবেশ অধিকার ছিল না।

এই সময়ে পূর্ববঙ্গে ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' নামে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রথম অভিনয় হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।

১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা "বাগবাজার এমেচার থিয়েটারে" "সধবার একাদশী" নাটকে নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'নিমাইচাঁদের' ভূমিকায় সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর জোড়াসাঁকোর একটি ভাড়াটে বাড়ীতে নাট্যশালা তৈরী করে পেশাদারী পাবলিক থিয়েটার রূপে নিয়মিত অভিনয় সুরু করা হ'ল ১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর, নামকরণ হ'ল "ন্যাশানাল থিয়েটার"। এখানেও প্রথম নাটক অভিনীত হ'ল 'নীলদর্পণ'।" এই সময়ে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু ডাক্তারী ছেড়ে রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন জুন-১৮৭৪ সালে। প্রথম ভূমিকা "সৌরিন্ধ্রী" মেয়ের সাজে; 'নবীন মাধবের' ভূমিকায় ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ উডের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। অমৃত লালের অপূর্ব অভিনয় দর্শনে দর্শকবৃন্দ হ'ল মুগ্ধ। বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হ'ল ষ্টেজের উৎকর্ষ সাধনে।

এই হলো বাংলাদেশের প্রথম পেশাদারী পাবলিক থিয়েটার বা নাট্যশালা। গিরিশচন্দ্র নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু তিনি এই অভিনয়ে যোগদান করলেন না—কারণ তাঁর অভিমত, ভাল রঙ্গমঞ্চ তৈরী না করে পাবলিক থিয়েটার করা ঠিক হবে না। কিন্তু তিনি একটী ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে পাঠিয়েছিলেন এবং উহা গীত হ'ল সেই থিয়েটারে।

১৬ ই আগষ্ট ১৮৭৩ তারিখে "বেঙ্গল থিয়েটার" নামে একটী পাবলিক থিয়েটার উদ্বোধন করেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, বিডন ষ্ট্রীটে। এই সম্প্রদায়ে সর্বপ্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চে মহিলা অভিনেত্রী অবতীর্ণা হন এলোকেশী ও জগত্তারিণী। ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে "বেঙ্গল থিয়েটার" বন্ধ হয়ে যায়।

৩১শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ ভূবন মোহন নিয়োগী মহাশয়ের উদ্যোগে "গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার"-এর উদ্বোধন হয় ৬নং বিডন ষ্ট্রীটে। ভূবনবাবু তিন বছর পরে এই থিয়েটার লিজ দেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। কিন্তু কৃষ্ণধন বাবু এই থিয়েটার পরিচালনায় অসমর্থ হ'ন। এই সুযোগে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ২৪ পরগণার জমিদার কেদার চৌধুরীর সহযোগে তাঁর আত্মীয় দ্বারকানাথ দাস মহাশয়ের নামে "গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার" লিজ নিলেন এবং স্বয়ং এই থিয়েটার পরিচালনার ভার গ্রহণ করে এই 'ন্যাশানাল থিয়েটার' উদ্বোধন করলেন ১৮৭৭ সালের ৬ই অক্টোবর "আগামী" মঞ্চস্থ করে। বাংলা নাট্যশালার শুভদিন ও শুভ যুগ সুচিত হ'ল।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮১ জোড়াসাঁকো বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ "বাল্মিকী প্রতিভা"-তে বাল্মিকীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

১৮৮৩ সালে গুরুমুখ রায় নামক এক শিখ ভদ্রলোক বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনীর উৎসাহে ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীটে একটী রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে "ষ্টার থিয়েটার" নামে একটী সুন্দর প্রেক্ষাগৃহ উদ্বোধন

করেন ১৬।শে জুলাই। প্রথম অভিনয় গিরিশচন্দ্র বিরচিত 'দক্ষযজ্ঞ' —দক্ষের ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ও 'সতীর' চরিত্রে অবতীর্ণা হ'লেন বিনোদিনী।

পরে এই 'ষ্টার থিয়েটার' গুরুমুখ রায় বিক্রয় করলেন অমৃতলাল মিত্র, দাশু নিয়োগী, হরিগোপাল বসু ও অমৃতলাল বসু মহাশয়দের নিকট। তাদের পরিচালনায় প্রথম নাটক "কমলে কামিনী" মঞ্চস্থ হ'ল ২০শে মার্চ ১৮৮৭। গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ও অপূর্ব অভিনয়ে "ষ্টার থিয়েটার" গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠল।

এই সময়ে ধনকুবের মতিলাল শীলের পুত্র গোপাললাল শীল ষ্টার থিয়েটারের গৃহ ও ষ্টেজ খরিদ করে নেন কিন্তু "ষ্টার থিয়েটার" গুড্ উইলের মালিক রইলেন অমৃতলাল মিত্র, দাশু নিয়োগী, হরিগোপাল বসু ও অমৃতলাল বসু। তাঁরা পরে হাতিবাগানে বর্তমান "ষ্টার থিয়েটার" প্রেক্ষাগৃহ নির্মান করেন। ২৬শে মে ১৮৮৮ হাতীবাগান তথা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার মঞ্চের উদ্বোধন হয় "নসীরাম" নাটক দিয়ে। পরে গিরিশচন্দ্র 'ষ্টারে' যোগদান করলেন ও তার নাটক "প্রফুল্ল" মঞ্চস্থ হয়ে নাট্যজগতে এক যুগান্তর সৃষ্টি করে।

এদিকে ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীটে ধনীপুত্র গোপাললাল শীল "এমারেল্ড থিয়েটার" খুললেন ৮ই অক্টোবর১৮৮৭—গিরিশচন্দ্র এই থিয়েটারেও কিছুদিন অভিনয় করেন।

১৮৯৩ সালে গিরিশচন্দ্রের নব পরিকল্পনায় তাঁর মনোমত যুগোপযোগী সুন্দর এক নাট্যশালা তৈরী হ'লো—প্রথম নাম হল "দি ক্লাসিক" পরে "মিনার্ভা থিয়েটার"। এই হোল গিরিশচন্দ্রের "মিনার্ভা থিয়েটারের" ইতিকতা। গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পরিচালনায় প্রথম নাটক "ম্যাকবেথ" মঞ্চস্থ হ'ল। এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বা দানীবাবু সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে আত্ম-প্রকাশ করলেন "ম্যালকম্" ভূমিকায়—স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অভিনয় করলেন "ম্যাকবেথ" চরিত্রে।

১৮৮৭ সালে ১০ই ডিসেম্বর ৩৮নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কবি রাজকৃষ্ণ রায় মহাশযের পরিচালনায "বীণা থিয়েটারে" 'চন্দ্রহাস' মঞ্চস্থ করে প্রশংসা অর্জন করেছিল।

অভিনেতা নীলমাধব চক্রবর্তী "ষ্টার থিয়েটার' ছেড়ে "সিটি থিয়েটার" নামকরণে "বীণা" মঞ্চে ১৬ই মে ১৮৯১ "চৈতন্য লীলা" অভিনয় করেন।

১৮৯৬ সালের শেষার্ধে বাংলার নাট্যাকাশে এলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ১৮৯৭ সালে এমারেলড থিযেটার মঞ্চে "দি ক্লাসিক থিয়েটার" নামে অভিনয স্রুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর নাট্যপ্রতিভা বিকশিত হয। তিনি ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন ১৮ই জুলাই ১৯০৭ 'প্রফুল্ল' নাটকে ভজহরির ভূমিকায। অমৃত মিত্র —যোগেশ, অমৃত বসু —রমেশ ও প্রফুল্ল — কুসুমকুমারী। তিনমাস পরে অমরেন্দ্র নাথ 'মিনার্ভায' যোগদান করেন সহকারী ম্যানেজার পদে, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার ফিরে এলেন ষ্টারে লেসী হয়ে, গ্রেট ন্যাশানাল থিযেটারের সকল অভিনেতা অভিনেত্রী সহ। অমরেন্দ্র নাথের প্রযোজনায ১১ই ১৯১১ নভেম্বর ভূপেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাটক "সৎসঙ্গ" মঞ্চস্থ করলেন 'ষ্টার' মঞ্চে। এই সময়ে রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রণীত "খাসদখল" প্রহসন অভিনীত হয ষ্টারে — মোহিতের চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথ ও মোক্ষদার ভূমিকায় ছিলেন বসন্তকুমারী। অমৃতলালের "খাসদখল" অপূর্ব রসসৃষ্টি করল নাট্য-জগতে। ৬ই জানুয়ারী ১৯১৬ অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ষ্টার থিয়েটারের দুর্দিন এল।

১৯১৮ সালে গিরিমোহন মল্লিক ষ্টার থিয়েটার লিজ নিলেন,— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায ম্যানেজার হলেন কিন্তু কিছু দিন পরে গিরিবাবু সংশ্রব ত্যাগ করলেন। ১৯২০ সালে অভিনেত্রী তারা-সুন্দরীর আর্থিক সাহায্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ষ্টার থিয়েটার' লিজ নিলেন। কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির জন্য ১৯২২ সালের "সুদামা" অভিনয়ের পরে অপরেশচন্দ্র থিয়েটারের লিজ ছেড়ে দিলেন।

১৯১২ সালে মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় নিজস্ব জমিতে বিডন ষ্ট্রীটে তৎকালীন যুগোপযোগী এক রঙ্গমঞ্চ তৈরী করেন "মনোমোহন থিয়েটার" নামে। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা দানীবাবু, চূণীলাল দেব, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, অহীন্দ্র দে, আশ্চর্যময়ী, শশীমুখী, কুসুমকুমারী, তিনকড়ি প্রমুখ নটনটী সমন্বয়ে কণ্ঠহার, পানিপথ, দেবলাদেবী, হিন্দুবীর, বঙ্গেবর্গী প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে যশস্বী হন এবং সেই যুগে তিনিই একমাত্র সত্বাধিকারী যিনি থিয়েটার ব্যবসায়ে বড়লোক হয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি থিয়েটার বন্ধ করেন।

এই হল বাংলা নাট্যজগতের প্রথম শতকের ইতিকথা।

১৯২১ সালে প্রফেসর শিশির কুমার ভাদুড়ী প্রফেসরী ছেড়ে দিয়ে ম্যাডান থিয়েটার পরিচালিত কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার মঞ্চ ভাড়া নিয়ে সেখানে পেশাদারী থিয়েটার খুললেন "নাট্যমন্দির" নামে। তিনি কলেজে প্রফেসররূপে যেমনি ভাল পড়াতেন, অভিনয় আর্ট শেখাতেও তেমনি পটু ছিলেন। অল্পদিনেই নবীন অভিনেতা ও অভিনেত্রী গোষ্ঠী নব রূপায়ণে গঠিত করলেন।

গিরিশচন্দ্র ও মহেন্দ্র মিত্র মহাশযের মৃত্যুতে ১৯১২ সালে "মিনার্ভা থিয়েটার" অচল অবস্থায় উপনীত হ'ল। মহেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা উপেন্দ্র কুমার মিত্র থিয়েটারের দখল নিলেন। মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের সংগে মোকদ্দমা বাধল, ফলে রিসিভার নিযুক্ত হ'ল —পরে হাইকোর্টের হুকুম অনুযায়ী উপেন্দ্রনাথ মিত্র মিনার্ভা থিয়েটারের দখল পেলেন কয়েকটি সর্তে। মনোমোহন পাঁড়ে পেলেন "কোহিনুর ষ্টেজ"। অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন "মিনার্ভার" ম্যানেজার। উপেনবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও অপরেশ বাবুর লিখিত নাটক মঞ্চস্থ করে "মিনার্ভা" সচ্ছল হয়ে উঠল—নূতন নট-নটীর সমাবেশে, দানীবাবুর সুদক্ষ পরিচালনায়। নৃপেন বসু ওরফে নেপা বসু, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক চন্দ্র দে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকা

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নরেশ চন্দ্র মিত্র প্রমুখ নূতন অভিনেতা 'মিনার্ভা থিয়েটারে' যোগদান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮ই অক্টোবর ১৯২২ 'মিনার্ভা থিয়েটার' আগুনে পুড়ে যায়। কিন্তু উপেন বাবু ধৈর্য-সহকারে বহুক্লেশ স্বীকার করে ১৯২৫ সালে, আগষ্ট মাসে মিনার্ভা থিয়েটার সংস্কার করেন এবং থিয়েটার চালু করে "আত্মদর্শন" মঞ্চস্থ করেন ৮ই আগষ্ট ১৯২৫। ১৯৩৮ সালে উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে "ষ্টার" রঙ্গমঞ্চে চলে যান। উপেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীসলিল কুমার মিত্র বর্তমান ষ্টার থিয়েটারের মালিক। তিনি পিতার হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে বর্তমান নাট্য-জগতে বিশিষ্ট মাননীয় ব্যক্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভগবানের দয়ায় তিনি পেয়েছেন অতি কৃতী প্রযোজক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তকে। এই থিয়েটারের তিনজন শিল্পী—তিন চট্টোপাধ্যায়—উত্তমকুমার, সৌমিত্র ও বিশ্বজিৎ সিনেমা জগতের উজ্জ্বল তারকা।

উপেন্দ্রনাথের পরে নরেশ চন্দ্র গুপ্ত, দেলওয়ার হোসেন, চণ্ডী চরণ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ একটী লিমিটেড্ কোম্পানী করে "মিনার্ভা থিয়েটার" পরিচালনা করেন। সেই সম্প্রদায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রতীন বন্দোপাধ্যায়, দুর্গা-দাস বন্দোপাধ্যায়, অমল বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরযূবালা, রাণীবালা প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমন্বয়ে কিছু দিন ভাল ভাবেই চলেছিল কিন্তু ২২শে জুলাই ১৯৪৩ দুর্গাদাসের অকালমৃত্যুতে মিনার্ভা থিয়েটার তথা বাংলা রঙ্গমঞ্চের অপূরণীয় ক্ষতি হল। মিনার্ভা থিয়েটার অনেক হাত পরিবর্তনের পরে বর্তমানে প্রযোজক ও অভিনেতা শ্রীউৎপল দত্ত মহাশয়ের পরিচালনায় সুষ্ঠু ভাবে চলছে।

১৯২৪ সালে 'মনোমোহন' থিয়েটার' বন্ধ হলে শিশির কুমার ভাদুড়ী ষ্টেজ লিজ নিয়ে তাঁর 'নাট্যমন্দির' সেখানে স্থানান্তরিত করলেন। এই মনোমোহন ষ্টেজে শিশির কুমার ১৯২৪ সালে ৬ই আগষ্ট যোগেশ চন্দ্র চোধুরীর "সীতা" অভিনয় উদ্বোধন করে বাংলা নাট্যজগতে এক বিপুল উদ্দীপনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

তাঁর সম্প্রদায়ে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, রবি রায়, ভূপেন রায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, জহর গাঙ্গুলী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শৈলেন চৌধুরী, কঙ্কাবতী, প্রভা, রাণীবালা প্রভৃতি।

পরবর্তীকালে শিশির কুমার "শ্রীরঙ্গম" নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে (বর্তমান বিশ্বরূপা ও পুরাতন নাট্যনিকেতন)। সেখানে তিনি "বিজয়া", "বিপ্রদাস", "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটক অভিনয় করেন। তাঁর নাট্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার ভার দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি আগ্রহী না হওয়ায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে সেই পদ দেওয়া হয়।

শিশির কুমায় যখন 'নাট্যমন্দির' পতিষ্ঠা করেন সেই সময়ে তৎকালীন বিখ্যাত নাগরিক নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (এটর্নী), সতীশচন্দ্র সেন (এটর্নী), মাইকা-প্রিন্স কুমারকৃষ্ণ মিত্র: বিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গদাধর মল্লিক ও ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নামে একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে "ষ্টার থিয়েটার" বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন ১৯২৩ সালে। অপরেশ চন্দ্রকে মঞ্চের নাট্যকার ও অভিনয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ (ঠাকুরতা) ডেপুটি পোষ্ট-মাষ্টার পদ ত্যাগ করে হলেন আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের সেক্রেটারী। জুন ১৯২৩ বাংলা ১৩৩০ সালে রথদ্বিতীয়া দিনে অপরেশ চন্দ্রের নতুন নাটক "কর্ণার্জুন" মঞ্চস্থ হলো ষ্টার থিয়েটারে। অপূর্ব দৃশ্যপট, অভিনব সাজসজ্জা, অভিনব পোষাক পরিচ্ছদসহ অভিনয়ে মুগ্ধ হল দর্শকবৃন্দ। ১৯২৪ সালে দানীবাবু যোগদান করলেন এই প্রতিষ্ঠানে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার হ'ত "চন্দ্রগুপ্ত", "প্রফুল্ল", "জনা" অভিনয়। তারপর রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় যোগদান করেন এই প্রতিষ্ঠানে।

১৮ই জুলাই ১৯২৫ রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" মঞ্চস্থ হলো ষ্টারে—দ্বিতীয় রজনীর অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করলেন। ২৩শে নভেম্বর ১৯২৯ অনুরূপা দেবীর "মন্ত্রশক্তি" উপন্যাসের অপরেশ চন্দ্র কৃত নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হলো 'ষ্টারে'—'মথ্রো'র ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তী অপূর্ব অভিনয় কৌশল দেখালেন। ২রা জুলাই ১৯২৯ নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু পরলোক গমন করলেন। শিশির কুমার ভাদুড়ী আমেরিকা যাত্রার পূর্বে কিছু দিনের জন্য আর্ট থিয়েটারে যোগদান করে 'চিরকুমার সভায়' 'চন্দ্রের' ভূমিকায় ও 'মন্ত্রশক্তিতে' 'মৃগাঙ্কের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শ্রীজহর গাঙ্গুলী, জীবেন গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, আশু বোস, সুরেন রায় প্রভৃতি আর্ট থিয়েটারে যোগদান করে যশস্বী হন। আর্ট থিয়েটার যখন ষ্টার থিয়েটার পরিচালনা করেন সেই সময়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মাতা কমলা নেহেরু অসুস্থ অবস্থায় নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের গৃহে ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে 'ষ্টারে' এসে থিয়েটার দেখতেন, সংগে থাকতেন কন্যা ইন্দিরা।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের মালিক অনাদি নাথ বসু মহাশয় বাংলা দেশে ছায়া-চিত্র প্রদর্শনীর অগ্রদূত ছিলেন। তিনি অপরেশ চন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। ভবিষ্যৎকালে এই অনাদি নাথ বসু মহাশয়ের নামে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ 'মনোমোহন' থিয়েটার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সেখানে প্রথম অভিনয় 'শ্রীরামচন্দ্র" নাটক, মঞ্চস্থ হয় ১৯২৭, বাংলা ১৩৩৪ সাল ১৬ই আষাঢ় শুভ রথযাত্রার দিনে। অপরেশ চন্দ্র একটি নবাগত সংগীতশিল্পী সংগ্রহ করেন নৈহাটী থেকে, নাম মৃণালকান্তি ঘোষ এবং তাঁকে 'নাবিকের' ভূমিকায় "শ্রীরামচন্দ্র" নাটকে মঞ্চে নামান। তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর দর্শক-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করল। এই থিয়েটারের কর্তৃত্বভার ছিল প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের উপর। এখানকার শেষ অভিনয় "চাঁদ সদাগর" ১৯২৮ সালে। এই থিয়েটার গৃহ কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্তৃক দখলীকৃত হয়ে বর্তমানে যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ সড়ক হয়েছে—রাস্তার

পূর্বদিকের শিবমন্দিরে "নটনাথ" অতীত কালের সাক্ষীরূপে বিরাজমান আছেন। মনোমোহন থিয়েটারের মধ্যে এই 'নটনাথ' ছিলেন—প্রত্যেক শিল্পী মঞ্চে প্রবেশ করার পূর্বে এই ঠাকুরকে প্রণাম করতেন।

২৮শে নভেম্বর ১৯৩২ দানীবাবু দেহরক্ষা করলেন। "আর্ট-থিয়েটার" পরিচালিত ষ্টার থিয়েটার বন্ধ হ'ল ১৯৩৪ সালে। এরপর শিশির কুমার ভাদুড়ী ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "নব নাট্যমন্দির" প্রতিষ্ঠা করে "বিরাজ বৌ" মঞ্চস্থ করেন ২৮শে জুলাই ১৯৩৪ এবং 'রীতিমত নাটক' অভিনয় মঞ্চস্থ হয় ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৫।

প্রবোধ চন্দ্র গুহ 'আর্ট থিয়েটার' অবলুপ্তির পূর্বে ১৯২৯ সালে ষ্টার থিয়েটারের সংশ্রব ছেড়ে "নাট্য নিকেতন" মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে। সেখানে তিনি ২৮শে মার্চ ১৯৩১ "ধ্রুবতারা" নাটক মঞ্চস্থ করে "নাট্য নিকেতন"-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তারপর ১৯৩১ সালে শ্রীমন্মথ নাথ রায়ের "সাবিত্রী" অভিনীত হয়। ১৯৩৩ সালে অনুরূপা দেবীর "মা"য়ের নাট্যরূপ দেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৩ মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩৮ সালে শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের "সিরাজদ্দৌল্লা" নাটকে 'সিরাজের' চরিত্রে নির্মলেন্দু লাহিড়ী অপূর্ব অভিনয় করেন।

এই 'নাট্যনিকেতন' ও শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চ বর্তমানে "বিশ্বরূপা" থিয়েটার, পরিচালনা করছেন রাসবিহারী সরকার ও দক্ষিণেশ্বর সরকার; সরকার ব্রাদার্স কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের নাম। উক্ত সরকার ভ্রাতারা এই রঙ্গমঞ্চ সংস্কার করে নবীন রূপ দান করে বর্তমান সময়ে নাট্যপিপাসু সুধীজনের মনোরঞ্জন করছেন যুগোপযোগী নব নাটক মঞ্চস্থ করে। সেখানে যাত্রাপার্টি সমূহের মিলন ক্ষেত্র করেও সরকার মহাশয়েরা বাংলাদেশের যাত্রার কৃষ্টি রক্ষা করছেন। ১৯৩৮ সনে প্রবোধবাবুর অংশীদার যশোদা ঘোষ মহাশয় নাট্যনিকেতনের সংশ্রব ত্যাগ করে অপার চীৎপুর রোডে "রঙ্গমহাল" নামে থিয়েটার খুললেন।

১৯৪১ সালে "নাট্যনিকেতন" বন্ধ হয়ে গেল।

১৯৩০ সনে ৬২।১, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীটে অপর একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় "রং মহল" নামে, গায়ক শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দে ও রবীন্দ্রমোহন রায়ের আপ্রাণ চেষ্টা ও উদ্যোগে। শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র তাদের সাহায্য করেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই এই প্রতিষ্ঠান উঠে যায়।

১৯৩৩ সনে 'রং মহল' পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন শ্রীশিশির মল্লিক ও শ্রীযামিনী মিত্র। তারা যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী বিরচিত অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' নাটক মঞ্চস্থ করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। "চরিত্রহীন" নাটক এই প্রতিষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

১৯৩৮ সনে গদাধর মল্লিক মহাশয় 'রং মহল' থিয়েটার পরিচালনার ভার নিয়ে সুখ্যাতির সহিত মঞ্চস্থ করলেন "মাটির ঘর", 'ভোলা মাষ্টার' ও 'রত্নদীপ'।

বিভিন্ন হস্তান্তর হয়ে ১৯৬২ সনে অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "রং মহল" পরিচালনার ভার গ্রহণ করে "ভোলা মাষ্টার" ও "রামের সুমতি" মঞ্চস্থ করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন কিন্তু অহীন বাবুর দীর্ঘ অসুস্থতার জন্য এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। গদাধর মল্লিক মহাশয়ের জামাতা রঘুনাথ মল্লিক মহাশয় 'নাট্যভারতী' নামে ১৯৩৯ সালে একটি প্রতিষ্ঠান খুললেন হ্যারিসন রোড 'এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে'। এখানে "তটিনীর বিচার" ও "কঙ্কাবতীর ঘাট" অভিনীত হয়। এখানে অহীন্দ্র চৌধুরী ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেন।

১৯২৬ সনে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ও শিশির কুমার মিত্র (মহেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতা ও পুত্র) শিশির কুমার বসু মহাশয়ের সাহায্যে "মিত্র থিয়েটার" নামে 'এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে' থিয়েটার খুলেছিলেন— উহা ১৯২৭ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

চীৎপুরের 'রঙ্গমহল, ১৯৩৫ সালে "রূপমহাল" নাম নিয়ে "আত্মাহুতি" ও 'আবুল হোসেন' অভিনয়ে সাফল্য লাভ করেন কিন্তু কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায়।

ধর্মতলা ষ্ট্রীটে "চিপ্ থিয়েটার" নামে একটি ছোট রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তৎকালীন বাংলা রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরা তাদের একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২৪ সনে আমি ওকালতি ব্যবসা সুরু করলে তৎকালীন বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংগে পরিচিত হই। রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের অপূর্ব প্যাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছি। সেক্সপিয়ারের সব নাটকগুলিই তাঁর মুখস্থ ছিল; আবার আধ ঘণ্টায় 'জেলেপাড়ার সং'এর মত অপূর্ব ব্যঙ্গ রচনা তৈরী করতেন। শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের দোতলায় 'অমৃত চক্রে' বসে থাকতেন চারদিকে নাটক নভেল ছড়িয়ে। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) আসতেন গাঙ্গুলী মশাইয়ের হাত ধরে আমার গৃহে। নাটকীয় সুরে কত রকম আলাপ আলোচনা করে মুগ্ধ করতেন 'নাট্য সম্রাট'। রসিক চূড়ামণি অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছোট ভাইয়ের ন্যায় স্নেহ করতেন, তার নিদর্শন রেখে গেছেন এক নাটকের ক্ষুদ্র ভূমিকায় বা চরিত্রে। নটরাজ শিশির কুমার ভাদুড়ী ছিলেন আমার মাষ্টার মশাই—তিনিও আসতেন। শুনাতেন তাঁর স্বভাবসুলভ সুমধুর আবৃত্তি "শ্রীরাম" 'চাণক্য' প্রভৃতি নাটক হতে। তিনি ছিলেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ভ্রাতৃবৎসল এবং অদ্ভুত প্রতিভাশালী নট ও নাট্যকার কিন্তু অভিমানী; এতটুকু আত্মসম্মান বর্জন করতে নারাজ ছিলেন। এসেছেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায়, রবি রায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, তারাকুমার, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সোদর-প্রতীম অহীন্দ্র চৌধুরী। কত আনন্দ পেয়েছি তাঁদের সুমধুর আদর আপ্যায়নে—কত কথা মনে পড়ে পুরাতন দিনের—সে এক একটি অপূর্ব ইতিহাস। আর এসেছেন আলাপ করেছেন নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী ও শ্রীমতী সরযূবালা। তাঁদের কথা বার্তাও মধুর।

পট শিল্প সম্বন্ধে দু'একটি কথা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

বাংলা দেশ পাথুরে দেশ নয়। পাহাড় পর্বত এখানে নেই বল্লেও চলে। ভাস্কর্যের উপযুক্ত পাথরের এখানে বড় অভাব। পক্ষান্তরে বৃষ্টিপ্রধান, নদনদী, জলাভূমি ও বনভূমিবহুল এদেশে এঁঠেল মাটি ও কাঠের অভাব কখনো হয়নি। ফলে মৃৎশিল্প ও কাঠের খোদাই শিল্প এখানে প্রচুর সমৃদ্ধিলাভ করে। বাংলার মৃৎশিল্পীরা হাড়ি-কুড়ি, ঘড়া, সরা গড়তেন নরম মাটিতে আঙ্গুল ও করতল চালনা করে। খেলনা পুতুল ও নানা দেব-দেবীর মূর্তি রচনা করতেন, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে নানা সুদৃশ্য মাটির টালি, পোড়া ইটের বিভিন্ন নক্সা ও সুন্দর সুন্দর অলংকার রচনা করে মন্দিরের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে তাদের শিল্প রুচির পরিচয় দিতেন। এই হল বাংলার শিল্প বা লোকশিল্প। পুরুষানুক্রমে এই একই শিল্পধারা পিতামহ হতে পৌত্রে বর্তেছে, কর্মসিদ্ধ দরিদ্র শিল্পীদের এই ছিল উপজীবিকা। বর্ষাকালে রৌদ্রের অভাবে যখন মাটির কাজ অচল হয়ে যেত, তখনই তারা সুরু করতেন পট আঁকার কাজ।

দেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে আমাদের দেশে বিগত কোন চিত্রকরেরই নাম জানা যায় না। কারণ ছবির নীচে কোনই নাম স্বাক্ষরের বালাই নেই। নাম স্বাক্ষরের ব্যাপারটি আমরা পেয়েছি বিদেশ হতে। বিশেষতঃ এক অভিনব সমবায় পদ্ধতিতে তারা পট রচনা করতেন বলেই বোধ হয় ছবির নীচে নাম স্বাক্ষর করার প্রথা ছিল না। তখন যে ভাবে এই

পটগুলি আঁকা হত, সে কথা নিয়ে সামান্য আলোচনা করে দেখা যাক্।

পটগুলি আঁকা হত দেশী তুলট কাগজে, ছবি আঁকার জন্য তার ওপরে সাদা রং-এর একটি কোটিং মাখান হত। রং ছিল সবই দেশী, খড়িমাটি, গেরিমাটি, হরিতাল, মেটে সিন্দুর, দেশী নীল, ভূষো কালি, সাধারণতঃ পটে ব্যবহৃত হত। গঁদ অথবা তেঁতুলের বীজের আঠা রং-এর সঙ্গে মিশিয়ে শিল্পীরা কাজ করতেন।

প্রথমে কর্তা চিত্রকর একখানি মূর্তির ড্রইং কাঠ-কয়লা দিয়ে ঐ কোটিং করা কাগজে করে দিতেন এবং ঐ ড্রইং হতেই ১০।১২ খানি ট্রেস্ অপরাপর কোটিং করা কাগজে করে নেযা হ'ত। তারপর বাড়ীর ছেলে মেয়ে ও বৌরা এক একটি রং-এর বাটি ও তুলি নিয়ে গোল হয়ে বসতেন। যার হাতে লাল রং-এর তুলি থাকত, তিনি পটখানির যে যে অংশে লাল রং-এর প্রয়োজন, সে সে, স্থানে লাল রং লাগিয়ে দিতেন। যার হাতে নীল রং, তিনি পটের নীল অংশ, যার হাতে হলুদ তুলি তিনি পটের হলদে অংশ রঞ্জিত করতেন। এইভাবে দেখতে দেখতে খানিকক্ষণের মধ্যেই পটখানি রঙীন হয়ে উঠত। পরে কর্তা চিত্রকরের অবসর মত কালো অথবা ব্রাউন রং দিয়ে ছবির 'আউটলাইন' গুলি, নাক, মুখ, চোখ ও অলংকরণ প্রভৃতি করে ছবিখানি শেষ করতেন। এই সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করার সুবিধা এই ছিল যে নানা কথা-বার্তার মধ্য দিয়েই কাজটি সু-সম্পন্ন হয়ে যেত। বাপ, জ্যেঠা, খুড়ো, ভাইপো, ভাগ্নেরা মিলে এক একটা যৌথ পরিবারের সকলে মিলে এই পট-শিল্পের কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। এই সব আসরে শ্রম বিনো-দনের জন্য নানা প্রকার রসের গল্প-গুজবও চলত ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে। বাপ ছেলে এক সঙ্গে বসেই হয়ত কোন রসের গল্প উপভোগ করতেন। এতে তাদের বড় একটা বাধত না। অনেক সময়, অতি বৃদ্ধ শিল্পী যিনি চোখে ভাল দেখতে পাননা, কাজেই অবসর না নিয়ে উপায় কি, সামান্য পান তামুক অথবা কিছুটা

আফিমের পয়সার বিনিময়ে নানা গল্প-গুজব করে কর্মব্যস্ত শিল্পী গোষ্ঠীকে আনন্দ বিতরণ করতেন। বড় বড় শিল্পীদের আসরে কখনো কখনো গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন। কোথাও টাকাটা সিকিটা, কোথাও-বা মাসের ভাত রাঁধবার হাঁড়ির বিনিময়ে তিনি এই কার্য নিয়মিতভাবে করে যেতেন।

এইভাবে সমবায় পদ্ধতিতে পট তৈরী হত, পট ব্যবসায়ীরা আবার শিল্পীদের নিকট হতে পাইকারী হিসাবে কিনে, হাটে, বাজারে, বন্দরে, মেলায় পয়সায় ১ খানি, দু'পয়সায় ১ খানি, চার পয়সা, ছ'পয়সা পর্যন্ত তা বিক্রি করত।

পটগুলি প্রস্তুত হত অতি দ্রুত। নাক, মুখ, চোখ কোথায় কি পড়ল, কোথাও হাতের তিনটি আঙ্গুল, কোথাও বা ছটাই হয়ে গেল। কোথাও ডান পা বাঁ পা হয়ে গেল, তার খোঁজ বড় একটা কেউ রাখত না। কোন ক্রেতা পট কিনে বাড়ী নিয়ে গেলে, যদি কোন চিত্র সমালোচক শিশু পুত্র বা কন্যার কাছে পটের দোষ ত্রুটি ধরা পড়ে যেত, তবে তাদের গুরুজনদের কাছে বকুনি খেতে হত। কারণ লক্ষ্মীর চোখের পুটুলী নেই বা কালীর পটের ডান পা বাঁ পা হয়ে গেছে, এ কথা যদি ঐ সব দেব দেবী শুনতে পান তবে অনর্থ ঘটাবেন, এই ভয়েই তারা অস্থির হয়ে পড়ত।

জনসাধারণ ঠাকুর দেবতার ছবি ঘরে রাখবার জন্যেই মাত্র ঐগুলি কিনত। তার ভাল-মন্দের জন্য তাদের কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। এ জন্যই পটশিল্প একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে কখনো যেতে পারেনি। গতানুগতিক ভাবেই এ শিল্প বহু দিন ধরে চলে এসেছে। এর উন্নতির কোন প্রশ্নই কখনো ওঠেনি, কাজেই পটগুলি একমাত্র প্রাচীনত্বের দাবী ছাড়া আর কোন কিছুই দাবী করতে পারেনা।

আমাদের দেশে তীর্থক্ষেত্রের অন্ত নেই। ভক্তিরস-পিপাসু জনগণের তীর্থযাত্রা পরম কামনার বস্তু। প্রতি তীর্থ-ক্ষেত্রকে আশ্রয় করেই পটশিল্প চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। তীর্থযাত্রীদের নিকট নানা প্রকার ও নানা আকারের পট বিক্রি করেই পটুয়াদের

গ্রাসাচ্ছাদন চলে যেত। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, রামেশ্বর, ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর তীর্থক্ষেত্রগুলিতে শিল্পীরা আজও তাদের পট-শিল্পের পসরা নিয়ে বর্তমান আছেন। আমাদের কালীঘাটে এখনো ৪।৫ ঘর পট-শিল্পী আছেন, যারা শুধু মাত্র কালী মূর্তিরই পট আঁকেন। ঠাকুরের পট না নিয়ে বাড়ী ফিরলে তীর্থ ভ্রমণের ফলই হয়না—এমন বিশ্বাস পূর্বে আমাদের দেশে চলতি ছিল। আজ প্রায় ৭।৮ বছর পূর্বে উদয়পুর হতে ৩৬ মাইল দূরে নাথদ্বারে মীরাবাঈয়ের পুজিত ঠাকুর শ্রীনাথজী দর্শন করতে যাই। দুপুর বেলা বেলা আমাদের ধর্মশালার দরজায় দেখি দলে দলে পটুয়ারা এসে উপস্থিত।

তাদের কাছে চার আনা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত মূল্যের শ্রীনাথজীর চিত্রপট দেখেছি। এখন তারা তাদের পটের উপর বার্ণিশ পর্যন্ত লাগিয়ে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছেন।

যদিও এখন আমাদের দেশে নানা প্রকার আধুনিক মূদ্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে,—হাফ্‌টোন, লিথো, ফটো অফ্‌সেট, গ্রেভিয়োর প্রভৃতি চলছে, তবু ঠাকুরের ছবি পটে আঁকা ছাড়া পাওয়ার কোনও উপায় নেই। তার কারণ সর্বভারতীয় ঠাকুরদের ফটো তোলা নিষেধ। বিশেষতঃ যে স্থানে ঠাকুর বিরাজ করেন তা সাধারণতঃ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কাজেই পটুয়ারা হাতে যে ছবি আঁকেন তা থেকেই নানা পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়ে তা জনসাধারণের কাছে পৌছায়। এখনো বহু তীর্থক্ষেত্র আছে যেখানে হাতের ছবি ছাড়া ঠাকুরের ছবি পাওয়ার কোন উপায়ই নেই।

আমাদের দেশের এই প্রাচীন শিল্প অবলুপ্তির পথে। উদাহরণ স্বরূপ বলি—২৫।৩০ বৎসর পূর্বেও আমি তারকেশ্বরে যে পটুয়াপল্লী দেখেছি, তার সিকি অংশও আর এখন বর্তমান নেই।

দক্ষিণেশ্বরের কথা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ.
সম্পাদক—‘ভারতবর্ষ’

আমি পণ্ডিত, ঐতিহাসিক বা গবেষক নহি, তবে এই অঞ্চলে জন্মিয়াছি, এখন ৭১ বৎসর বয়স হইয়াছে, সারা জীবনই এই অঞ্চলে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। নিজের চোখে দেখা ও লোকমুখে শোনা কিছু সংবাদ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

দক্ষিণেশ্বর অতি পুরাতন গ্রাম। অনুমান হাজার বৎসর পূর্বে এখানে বান রাজার রাজধানী ছিল। তখন গঙ্গার খাত কোন্ পথে চলিত জানি না। ষাট বৎসর পূর্বে আমি যখন কামারহাটী সাগরদত্ত অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন একদিন দক্ষিণেশ্বর নিবাসী পূজনীয় শিক্ষক ৺নন্দলাল নিয়োগী মহাশয় আসিয়া বলিলেন, দক্ষিণেশ্বরে পুকুর কাটিতে কাটিতে তিরিশ ফুট নীচে মাটির মধ্যে একখানি নৌকা বাহির হইয়াছে। তোমাদের ইচ্ছা হইলে দেখিয়া আসিতে পার। হুজুগে ছিলাম, তখনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া নৌকা দেখিয়া আসিলাম। বর্তমানে যেখানে বালকদিগের জন্য দক্ষিণেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পাশেই পুকুর কাটা হইতেছিল। নৌকাখানি কতদিনের তাহা জানিবার মত আগ্রহের বয়স তখন হয় নাই। ওই ঘটনার তিরিশ বৎসর পরে দক্ষিণেশ্বর নিবাসী আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু, খড়দহ শতশ্রী খোল উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা ৺মৃণাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে খিড়কীর পুকুরের মধ্যে বান রাজার অট্টালিকার একাংশ দেখিয়া আসিয়াছি। যেখানে মৃণালবাবু পুকুর কাটিয়াছিলেন সেখানে একটি উচ্চ মাটির ঢিবি ছিল। পুকুর কাটিতে কাটিতে একটি বাড়ীর অংশ দেখা যায়, তাহার পাশেই তখন পুকুর কাটা হয়। এখন

সেখানে কি আছে জানি না। এই দুইটি চোখে দেখা ঘটনা দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে।

সাহিত্যের দিক্ দিয়াও দক্ষিণেশ্বরের ঐতিহ্য আছে। (১) পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি বংশের সন্তান। তিনি 'মহারাজা নন্দকুমার', 'জালিয়াত ক্লাইভ' প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। (২) দক্ষিণেশ্বর নিবাসী খ্যাতনামা রস-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের অঞ্চলের সকলের দাদা মহাশয় ছিলেন। দুইজনের নামই আপনাদের সুপরিচিত। উভয়েই শুধু সাহিত্য রচনা করেন নাই, সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরবাসী দাতারাম মণ্ডল, নবীন নিয়োগী প্রভৃতি ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কথা এ অঞ্চলের লোক এখনও ভোলে নাই। পরবর্তী কালে রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পভৃতি সর্বজনপরিচিত হইয়া দেশের কাজ করিয়া গিয়াছেন। প্রসন্ন বাবুর প্রপৌত্র শ্রীমান পিনাকী বন্দ্যো-পাধ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভের পর মিউনিসিপ্যাল কমিসনার হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর পুত্র শ্রীমান সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরস্থ রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের সম্পাদক ও কামারহাটি মিউনিসি প্যালিটির চেয়ারম্যান হইযা সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। বাচস্পতি বংশের খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় স্বদেশী যুগে খ্যাতনামা বিপ্লবী বলিয়া এবং ৺মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এ অঞ্চলের সর্বজন প্রিয় শিক্ষাব্রতী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

ইহাতো অধিবাসীদের কথা। দক্ষিণেশ্বরকে আজ মন্দির-নগর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ১৩০ বৎসর পূর্বে রানী রাসমনি দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে ষাট বিঘা জমি ক্রয় করিয়া দশলক্ষ টাকা ব্যয়ে কালী মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, বারটি শিবমন্দির ও গঙ্গার ঘাট প্রভৃতি নির্মান করিয়া প্রতিষ্ঠার দিনে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তথায় কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় আসিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংস দেবে পরিণত হইয়াছিলেন। তাহাদের কথা সর্বজনবিদিত, কাজেই পুনরুক্তি প্রয়োজন নাই। কলিকাতার অন্নদা ঠাকুর স্বপ্নাদেশ পাইয়া দক্ষিণেশ্বরে আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিষ্যদল তরুণ সন্ন্যাসীরা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া আদ্যাপীঠে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে অতি সুন্দর মন্দির নির্মান করিয়াছেন তাহা আজ দর্শক মাত্রেরই সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। বিস্ময়ের কথা, ঐ মন্দির প্রভৃতি নির্মানে কোন ধনীর মোটা টাকা দান নাই। এই বিপুল অর্থ দরিদ্র জনসাধারণের সামান্য দান হইতে সংগৃহীত।

কালী মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে কলিকাতার ধনী ব্যবসায়ী যদুনাথ মল্লিকের বাগানবাড়ী ছিল। যদুনাথের প্রপৌত্র শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ মল্লিক রবিবাসরের অন্যতম সদস্য। মল্লিক মহাশয়ের বাগান ক্রয় করিয়া গভর্ণমেণ্ট সেই জমির উপর বালী পুল নির্মান করিয়াছেন। পুলের উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে মল্লিক বাগানের কিছু জমি ও একটি ছোট বাড়ী অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। রবিবাসরের সদস্য রায়বাহাদুর নিবারণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ঐ জমি ও বাড়ী রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের দখলে আসে। নিবারণ বাবুকে সে কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন কলিকাতা পুলিশের সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ রবিবাসরের সদস্য ডাঃ সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই। ঐ স্থানে মহামণ্ডল এখন মন্দিরাদি নির্মান করিয়াছেন ও তথায় প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী রামকৃষ্ণ দেবের কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কালী মন্দিরের উত্তর দিকে অল্প দূরে যে সুরধনী কাননে চল্লিশ বৎসর পূর্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অসুস্থ হইয়া কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন, নদী তীরস্থ সেই বাগান এখন রামকৃষ্ণ মিশন ক্রয় করিয়া তথায় মিশনের সন্ন্যাসিনীদিগের শিক্ষা ও আবাস কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। ঐ আশ্রমের অল্প উত্তরে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের অগ্রজ স্বামী যোগানন্দের শিষ্যেরা যোগদা মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দেওঘর বালানন্দ আশ্রমের শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী এই

দক্ষিণেশ্বরেই জলকলের নিকট সুবৃহত জমি ক্রয় করিয়া মন্দির, বাসগৃহ, যক্ষা হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঠিক দক্ষিণেশ্বরে না হইলেও তাহার সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কার নাথ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইতে বালী পুলে যাইবার পথে আট বিঘা মূল্যবান জমি ক্রয় করিয়া মহামিলন মঠ স্থাপন করিয়াছেন। সেখানেও মন্দিরাদি নির্মানের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার অল্প দক্ষিণে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের চরণস্পর্শে ধন্য ভাগবত আচার্যের গৃহের পাটবাড়ীতে মন্দিরাদি নির্মিত হইয়া তাহা বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এ যুগের নাম প্রচারক শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী ঐ গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সেখানেই তাঁহার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছে। পাট বাড়ীতে বাবাজী মহাশয়ের সংগৃহীত কয়েক-হাজার বাংলা বৈষ্ণব গ্রন্থের পুঁথি এবং বহু সংস্কৃত ও বাংলা বৈষ্ণব গ্রন্থ আজিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

দক্ষিণেশ্বরে আরও বহু ছোট বড় মন্দির ও দেবস্থান বর্তমান, বাহুল্য ভয়ে তাহাদের কথা উল্লেখ করিলাম না।

কাব্য-সাহিত্যের মানদণ্ড ও গতিপ্রকৃতি

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস্-এর এক সভায় বিখ্যাত ইংরেজ কবি সিসিল ডে লিউস্ মন্তব্য করেন যে, ব্রিটেনে কবিতাবস্তুটি আস্তে আস্তে এক গৌণ কলাবিদ্যায় পরিণত হয়েছে। এ-কালীন কবিতায় সঙ্কেতময় ভাষার আতিশয্য তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছে।

সংবাদপত্রে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী দপ্তরে ইংরেজীর যে অধোগতি ঘটেছে ও প্রতিনিয়ত ঘটছে তারই পটভূমিতে ইংরেজী কবিতার অবক্ষয়ের অবস্থা ও তার গতিপ্রকৃতি তিনি বিচার করেছেন। বর্ত্তমানে ব্যবসা, বিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রভাবে ভাষা তার পুরানো প্রাণধর্ম্মিতা হারিয়ে কথাসর্বস্ব কাটাছাটা আটপৌরে কাজের ভাষায় পরিণত হয়েছে। ফলে, কারুকার্যখচিত সুললিত সুভাষিত ভাষা না হয়ে—তা সঙ্কেতময় এক হেঁয়ালি ভাষায় পরিণত হয়েছে। ইংরেজী কাব্য সম্বন্ধেও এ কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য হয়ে পড়েছে। কারণ ইংরেজী কবিতার অনুকরণে আমাদের কাব্যেও এই অবক্ষয় সকলেরই এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রগতিবাদী সমালোচকেরা আত্মরক্ষার্থে বলেন—যে, কাব্য-সাহিত্যের, তথা সকল শিল্পেরই সমাজ-আশ্রয়ী মানুষ ও তার পরিবেশের সঙ্গে এতই নিবিড় ও নিগূঢ় সংযোগ থাকে যে সমাজ ও জীবন থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায় না।

জি. কে. চেষ্টারটন এক সময়ে কৌতুক ক'রে এক মর্মান্তিক মন্তব্য করে বলেছিলেন,—'গান গাইতে পারো যদি তো গ্রামোফোনে যাও, অভিনয় করতে পারো তো সিনেমায় যাও, ছবি আঁকতে পারো

তো শিল্পবাণিজ্যের পোস্টার আঁকো, ভাষায় দখল থাকে তো সংবাদ-পত্রের আপিসে যাও, নয়তো ছাত্রদের নোট বই লেখো,—কিন্তু সাবধান বিশুদ্ধ শিল্প বানাতে যেয়ো না, —এ যুগের সব কিছুই ভেজাল। এখন বিশুদ্ধ বস্তুর ঠাঁই নাই,—বিশেষ করে আর্টে তো নাই-ই'। চেষ্টারটনের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন গভীর আক্ষেপের সঙ্গে কবি ডে. লিউস্।

প্রতিভাবান লেখকের অভাবে এবং অধুনাতন পরিবেশে নানা শ্রেণীসংঘাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রভাবে বাংলা সাহিত্যও আজ এক-প্রকার পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়েছে। পূর্বস্থরীদের সাধনা ও ঐতিহ্য-লব্ধ ভাব, ভাষা ও অলঙ্কার ত্যাগ করে, পরানুকরণপ্রিয়তার ফলে আমরাও আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ক্রমশঃ অশালীন হতে চলেছি। শুধু একটা নতুন কিছু করার নামে আমরা বিচারবুদ্ধি ও রসবোধের আদর্শকে নস্যাৎ করে দিচ্ছি, যার ফলে কাব্যসাহিত্য, 'রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বিশুদ্ধ প্রলাপ ও বিশুদ্ধতর ইয়ার্কি সংজ্ঞা দিয়াছেন, সেই ধোঁয়াটে বিবর্ণ বিষণ্ণ এক শ্রেণীর পদার্থে পরিণত হইতেছে।' (কবিতার মৃত্যু : যুগান্তর, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালেই বাংলা কাব্যের এই অধঃপতন দেখে খেদোক্তি করে গেছেন—'কাব্যের একটা গুণ যে কবির রচনাশক্তি, পাঠকের মনকে টেনে এনে লেখকের সঙ্গে একাত্ম করে দেয়,—তাকে তদ্ভাবে ভাবিত করে তোলে। আধুনিক কবিতা এদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—'পাঠকের মনে প্রবেশের পথ না হয়ে ভাষা যদি নিষেধের পাঁচিল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে কবিতার কোন সার্থকতাই আছে কিনা সন্দেহ।'

'নতুনের নামে যে কোন বাতুলতাই এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ নয়।'

'অতীতের অনুকরণও তাই যেমন নিন্দনীয়, আধুনিকতার নামে যে কোন হুজুগের ঢেউই তেমনি প্রগতির সামিল নয়।'

কাব্যের এই দুর্বোধ্যতাকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বিদ্রূপ করে বলেছেন

যে, যে-কাব্যের অর্থ করতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় সে-কাব্যের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা কি ? কিসের তাগিদে লোকে এইসব ছাই ভস্ম লিখতে উদ্যত হয় ? এগুলি কাব্যের নামে কতকগুলি বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে ?

এই সকল দোষ ত্রুটি এবং দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও আমি বলব, এই আধুনিক কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে বস্তুতন্ত্র জীবনদর্শন,—গভীর অনুভূতির মাধ্যমে মননে ও ব্যঞ্জনায় স্থানে স্থানে বলিষ্ঠ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র।

উৎকর্ষ সাধনার জন্য, বিজ্ঞানের মত সাহিত্যেও, পরীক্ষা নিরীক্ষা, গবেষণা ও আবিশ্চিকীর্ষা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিজ্ঞানে যেমন কালোত্তীর্ণ পরীক্ষোত্তীর্ণ পদার্থ বা ভৈষজ্যগুলিকে বর্জন করা হয় না, সাহিত্যেও তেমনি রসোত্তীর্ণ কাব্য বা তার প্রয়োগবিধিকে বর্জন করার কোনো সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। সেজন্য অদ্যাপি রসনাতৃপ্তিকর শাক-শুক্তানি থেকে পায়স-পিষ্টক কালিয়া-পোলাও কিছুই বর্জিত হয়নি, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক রান্নার উদ্ভাবন সত্ত্বেও।

রসোত্তীর্ণ 'পুরাতন' থাকবে এবং তা'তে রসোত্তীর্ণ 'নূতন' যোগ হয়ে সাহিত্যের সারস্বত সম্পদ বৃদ্ধি করবে। না হলে পুরাণো বা নূতন সত্যের নিজস্ব কোনো বয়সের দাবী নেই। তাই রস বিচারের যুক্তিতে মনে হয় মহাকবির শ্লোকটীই সিদ্ধান্ত বাক্য ঃ—

> পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
> ন বাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
> সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
> মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥

অর্থাৎ—

> 'পুরাণো' বলিয়া যাহা কিছু সব নহে সমাদর-যোগ্য নহে,
> 'নূতনের' বেলা শুধু অবহেলা তাই বা কাহার বিচারে সহে ?
> যেজন সুজন সুধী সজ্জন ভজে সে গুণের সূত্র ধরি
> পরের জিহ্বায় করে আস্বাদ মূঢ় পরীবাদ তাহারি করি।"

(মৎকৃত অনুবাদ)

সাম্প্রতিক কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনা পড়লে কারও এ ধারণা হবে না যে তাঁরা দেশকে ভালবাসেন না,—বা তাঁরা বিজাতীয় ভাবভঙ্গী ও আদর্শের অন্ধ অনুকরণ করেন মাত্র।

প্রকৃত কথা এই যে, আজ বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে দাঁড়িয়ে—সার্বজনীন স্বীকৃত ভিত্তির আদর্শে বা আবেদনে মৌলিক কাব্য রচনা করা সহজ নয়।

নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, ভাঙাগড়ার ডামাডোলের মধ্যে সমাজ-জীবনকে নতুন সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সংঘাতের বর্ণনা করে বলেছেন ঃ—

> 'জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু করে কাজ, হুড়মুড় করে আমোদ প্রমোদ। জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয় বা সম্পর্কিত জগতে নয়, হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।'

আমাদের মনে হয় যে, সে পরিমাণ সময়ও তাদের নেই। মহাকবিরই ভাষায় 'হায়রে আমার হতভাগ্য, সময় যে নাই সময় যে নাই!'

একালের কাব্যে বিনয় অস্পষ্ট, স্পর্ধা সুস্পষ্ট। সুন্দর অসুন্দরের, শ্লীলতা অশ্লীলতা, শালীনতা অশালীনতার তৌল-তরাজুর কাঁটা দু-দিকেই দুলছে,—নিরপেক্ষ বিচারের শাশ্বত সত্যের লক্ষ্যে স্থির হতে পারছে না, তাই এখন যথাসাধ্য সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখে—যথাজ্ঞান দু-কথা বলতে প্রবৃত্ত হচ্ছি, দীর্ঘকাল যাবৎ কাব্যসাহিত্যের সেবালব্ধ বিনীত অধিকারে, এবং—তারই দিগ্‌দর্শনের আশায় এবং আকাঙ্ক্ষায়।

প্রথমেই প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের আবহমান ঐতিহ্যের আদর্শ ও ধারার উল্লেখ করা উচিত মনে করি। আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁর 'কাব্য মীমাংসা'য় কাব্যসাহিত্যকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তার দেহ আছে প্রাণ বা আত্মাও আছে। কাব্যের দেহ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নেই—ভামহ, দণ্ডী, বামন থেকে বিশ্বনাথ পর্যন্ত সকলেই—"তস্য শব্দার্থৌ শরীরম্," অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকেই তার জীবনাধার দেহরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার প্রাণ বা আত্মা সম্বন্ধে মতভেদ আছে এবং এই মত পর্যায়ক্রমে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে।

আচার্য ভামহ, দেহবাদীদের মত, কাব্যের সৌন্দর্য-সমন্বিত অলঙ্কারমণ্ডিত দেহকেই তার সর্বস্ব মেনে নিয়েছেন।

দণ্ডী বহিরঙ্গ অলঙ্কার অপেক্ষা, তার 'গুন' বা অন্তরঙ্গ অলঙ্কারের উপর অধিকতর জোর দিলেন সত্য, কিন্তু তবুও তাঁর কাব্যের প্রাণ-বস্তুর সংজ্ঞা মনের মত হল না।

আলঙ্কারিক বামন, বাইরের বেশভূষা প্রসাধন এবং অভ্যন্তরের কাব্যগুন বা অন্তরঙ্গ অলঙ্কারের তারতম্য স্বীকার করে নিয়েও কাব্যের রচনাশৈলী বা রীতি বা বাগ্‌বিন্যাসকেই কাব্যের আত্মা নির্ধারণ করলেন।

অতঃপর আবির্ভূত হলেন কাশ্মীরে,—আলঙ্কারিকশ্রেষ্ঠ 'ধ্বন্যালোক'-রচয়িতা আনন্দবর্ধন। তিনি রসধ্বনিবাদের সূক্ষ্মতত্ত্বটি বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে—

অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মা
যো ব্যবস্থিতঃ
বাচ্যঃ প্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য
ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ ॥

মহাকবিদের ঐশ্বর্য মাধুর্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কাব্যের দুই প্রকার অর্থ থাকে,—একটি বাচ্যার্থ যা মোটামুটি আভিধানিক অর্থ এবং তা সাধারণ পাঠকের চোখেই ধরা পড়ে, আর একটি প্রতীয়মান হয়—গুণী-জ্ঞানী-রসজ্ঞ সহৃদয় পাঠকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। সেটি তাঁর ব্যঙ্গ্যার্থ—ব্যঞ্জিতার্থ—ব্যঞ্জনালব্ধ অর্থদ্যোতনা বা ধ্বনি (suggestion)।

তিনি বললেন, 'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য', ধ্বনিই কাব্যের আত্মা।

কাব্য কি ? 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। এই হল রসধ্বনিবাদ।— ধ্বনির তাৎপর্য রসসৃষ্টিতে। রস অনির্বচনীয়।

ধ্বন্যালোকে বলা হয়েছে :—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্তুস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥

মহাকবিদের বাণীতে তার বাচ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ অতিক্রম করেও এক গভীর অর্থের ইঙ্গিত বা আভাস থাকে, যেমন সুন্দরী রমণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য অতিক্রম করেও সমগ্র দেহাবয়বের গঠনসৌষ্ঠবে এক অনির্বচনীয় লাবণ্য দেখা যায় যাকে কবি বর্ণনা করেছেন—

"কিবা ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায় ;
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়।"

কাব্যসাহিত্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধান হলেও রসই তাহার প্রাণ। নানাবিধ আঙ্গিকের অভাব বা অল্পতা থাকলেও তা কাব্যপদবাচ্য হতে পারে, কিন্তু ভাবের ঘরে ফাঁকি থাকলে তার চলবে না। 'ভাব হতে রূপে' তার 'অবিরাম যাওয়া আসা'—একের সঙ্গে অপরের—সেই ভাবের মাধ্যমেই 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব' সম্ভব হয়ে থাকে। রসঘন কাব্যের এই নিস্পৃষ্টার্থ দৌত্যই তার বিশেষ গুণ।

'ধ্বনি বা ধ্বনন একটি পারিভাষিক শব্দ। ঘণ্টাধ্বনি হলে যেমন তার ধ্বনি বা শব্দ জলতরঙ্গের মত তরঙ্গ তুলে দূরপথগামী হয়—যা বেতারযন্ত্রে বহুদূরেও ধরা যায়,—তেমনি শব্দের যে অর্থ তার আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে, তার ধ্বননের দ্বারা,—তাকেই বলে তার ব্যঞ্জনা বা দ্যোতনা (suggestiveness). এই 'ধ্বনি' যার যত বেশী,—সেই কবির কাব্যে নিহিত তার ভাব তত গভীর, মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

কাব্যের দোষগুণ :

কাব্যের রসগ্রহণে যা বিঘ্ন ঘটায় তাই তার দোষ,—রসের চমৎকারিত্বই কাব্যের গুণ। তিক্ততা, কটুতা, তুচ্ছতা, গ্রাম্যতা, বর্বরতা, বাগাড়ম্বরপূর্ণতা অশ্লীলতা সৎ-কাব্যে যথাসম্ভব বর্জনীয়।

গুণের অভাব থাকলেও—এমন কি কিছু দোষ থাকলেও,—তা কাব্য হতে পারে যদি তার ভাব হতে রূপে—যাওয়া-আসা করবার মত রসের রসদ, ভাবের সম্পদ এবং কল্পনার গতিবেগবৈভব থাকে। তা না হলে কাব্য যদি পণ্ডিতের বিচারে শুচিশুদ্ধ হয় অথচ রসিকের বিচারে নীরস হয় তাহলে রসবেত্তা সহৃদয় পাঠকেরা বলেন,—'সে কেবল পণ্ডশ্রম পাণ্ডিত্য-প্রয়াস'!

বীণাযন্ত্র নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সুর বেঁধে—কোনো সুন্দরী গায়িকা যদি কেবল কালোয়াতীর আলাপচারী ক'রে তা'তে নীরস কিন্তু বিশুদ্ধ খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ গান করতে থাকেন তাহলে হতাশ হয়ে রসিক শ্রোতা বলতে বাধ্য হন :—

"But why such long
prelusion and display
Such tuning and adjustment
of the harp,
And taking it upon your breast
Only to speak dry words
across the strings !"

এমন অবস্থায় রসভারতীর মুখে রসিক শ্রোতা হয়তো আশা করেন :—

"ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম—
নীরবে অতি ধীরে ভ্রমরগীতিসম..."

দূর দ্রাক্ষাকুঞ্জের মধুর-রস-সম্পুটিত গজলগীতির গুঞ্জরণ, যা শুনে, ক্ষেত্রান্তরে, কোনো কবি বলেছেন :—

"গানটি ফুরাইলে যদি না মনে হয়
এমন শুনি নাই জীবনে
সেজন চলে গেলে যদি না মনে হয়

মানুষ নাই আর ভুবনে...
বসিয়া জনতায় তাবি সে প্রেমমুখ
ধেয়ানে যদি দিন না কাটে
গগন ব্যবধান, তবুও মনপ্রাণ
না সঁপি যদি বুক না ফাটে
...তাহারি নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস
স্বপন ভরে দিন নাহি যায়—
ভাঙিলে সে স্বপন, মরিতে নারো যদি,
বোলো না প্রেম তবে কভু তায়।"

দুঃখের বিষয়, এই রোমান্টিক প্রেমের রূপ এবং মূল্যমান সময়ের চক্রান্তে এতই বদলে যাচ্ছে, যে আজ তাকে দেখে মনে হবে Bottom thou art translated! যাকে 'দূরে রজত রেখা' মনে হত— তাকে আজ অতি স্পষ্ট দিবালোকে,—'নিকটে তরঙ্গ' রূপেই দেখা যাচ্ছে। কবি এই স্বপ্ন ও মায়ার রহস্যটি ধরে ফেলে বলেছেন :—

'নিকটে তরঙ্গ,—দূরে রজতরেখা'। যে 'প্রেম'কে আগে দেখা যেত দূর থেকে, অনেক সাধ্য সাধনায় অনেক পত্রের অনেক দৌত্যের প্রয়োগে এবং প্রযোজনায়, সে প্রেমকে আলোকিত পাশ্চাত্ত্য দেশে আজ টেলিভিশনেই দেখা যায় সুইচ টিপলেই। এখন আর গোধূলির আলো-আঁধারির—twilight-এ তাকে সেই আগের মত half revealed—half concealed—রহস্যময় অবগুণ্ঠনের অন্তরালে দেখতে হয় না।

নানা মতবাদ, নানাবিধ বিচিত্র টেকনিকের প্রয়োগাবর্তনে আধুনিক কবিদের ভাব, চিন্তা ও পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে। তাঁদের মনোরথারূঢ় আকাঙ্ক্ষা ও অভীপ্সা কোনো 'আনন্দলোকের মঙ্গলালোকের' রশ্মিরেখাও দেখতে পাচ্ছে না,—তাই তাঁদের ভাব অস্পষ্ট, ভাষাও দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরাও সম্পূর্ণ অচেতন নন।

কবিতায় মিল দিয়ে মিত্রাক্ষর, কিংবা মিল না দিয়ে তাকে অমিত্রাক্ষর করা যেতে পারে। বাঁধাধরা অক্ষরবৃত্তে বা মাত্রাবৃত্তে, সমপংক্তিতে বা বিষমপংক্তিতে কবিতা লেখা যেতে পারে,—কিন্তু

গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, তার একটা স্বচ্ছন্দ সুনিয়ন্ত্রিত সাবলীল গতিভংগী বা ছন্দ অপরিহার্য এবং তার ভারসাম্য রাখতেই হবে।

কবিতায় ছন্দ বলতে আমরা বুঝি,—এই সুনির্বাচিত, সুপরিমিত, সুপরিকল্পিত পদবিন্যাসের ললিত কলাকেই যার প্রভাবে কবিতার গতিভংগীতে একটি মধুর শ্রুতিসুখকর সংগীতময় নৃত্যভংগিমা সঞ্চারিত হয়। যে-কোন ভাষার—যে-কোন রসোত্তীর্ণ ছন্দোবদ্ধ উৎকৃষ্ট কবিতাকে ছন্দোবর্জিত করে গদ্যে রূপান্তরিত করে পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তার দৈন্য ও দুর্দশা তখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই ছন্দ···কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্য ছন্দ দরকার। এই ছন্দের বাহন যোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয় তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়। এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কি অপরূপতা লাভ করে তা হিসাব করে বলা যায় না। কাব্য-রচনা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা। সেই বিষয়ের চেয়ে বেশীটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি, কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।' 'শেষের কবিতা'য় অমিতের মুখে লাবণ্যের প্রতি, কবি যা লিখেছেন ঃ—

"পদে পদে তবু আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝ'রিণী
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়ে
নিজেরে চিনি।"

এই পংক্তিগুলি ছন্দভারতীর প্রসঙ্গেও উদ্ধৃতির দাবি রাখে।

কাব্যের ফুল ঃ—

অকস্মাৎ রাতারাতি পোয়াল ছাঁতুর মত কাব্যে ফুল ফোটে না, 'উর্বশী'র 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' নিরালম্বভাবে আশমানেও ফোটে না। এর পিছনে তাপ এবং তপস্যা, দুঃখশোক ব্যথা-বেদনার দহন-সহন এবং সহানুভূতি সবই থাকে। অন্তরের দীর্ঘ মৃণালবৃন্তের উপর তার আনন্দের অরবিন্দ দলগুলি, অরুণোদয়ের ক্ষণে, তার বল্লভ সূর্যের পানে মেলে ধরে,—অন্তর্গূঢ় পংকজিনী, তপস্বিনী মৃণালিনী হয়ে ফুটে উঠবে বলে,—তাই আমরা কবির মুখে শুনি 'আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে—গোলাপ হয়ে উঠবে'। জোর করে শুধু পাণ্ডিত্যের জোরে এ ফুল ফোটানো যায় না।

কাব্যের মানদণ্ড যাঁদের হাতে, তাঁরাই সহৃদয় পরিশীলিতমনা বিদগ্ধ সমালোচক। কাব্যের দোষগুণ বিচারের ভার তাঁদেরই হাতে।

নিষ্ঠুর সমালোচকের কশাঘাতে কবি কীট্স-এর তরুণ প্রতিভা অলৌকিক এবং অসামান্য হলেও, হতাশায় অবসিত হয়েছিল। গোঁড়া (dogmatic) সমালোচনা যেমন ক্ষতিকর, সহৃদয় বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনাও কবি তথা কাব্যসাহিত্যের পক্ষে তেমনি উপকারী।

কাব্যের মানদণ্ড রসের উৎকর্ষাপকর্ষেরই মানদণ্ড বা মাপকাঠি। গুণ বিশেষ না থাকলেও, এমন কি অল্প কিছু দোষবিশেষ থাকলেও তা কাব্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে,—যথা চন্দ্রমায় কলংকের মত —'শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না'। অথবা অপর কবির ভাষায় ঃ—

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

অর্থাৎ, অল্প দোষ হলে, শশীর কলঙ্কের মত তা গুণের সমুদ্রে ডুবে যায়। একথাও এই দোষগুণ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রসই কাব্যের প্রাণ, তার মাত্রামানই কাব্যবিচারের মানদণ্ড, তার তর-তম বিচারের রহস্যকুঞ্চিকা বা চাবিকাঠিটী বিশেষজ্ঞ সমালোচকের হাতেই ন্যস্ত আছে। তাই মহাকবি কালিদাসও বলেছেন—'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্'। কোন নতুন

এক্সপেরিমেণ্ট বা প্রয়োগ-বিজ্ঞান, রসোত্তীর্ণ হ'ল কিনা তা নির্ধারিত হবে পরিতুষ্ট বিজ্ঞজনের অনুমোদনের দ্বারা।

এই রসকে শুধু 'সুখময়' বললেও ঠিক বলা হবে না—কারণ করুণ রসও রস। 'সীতার বনবাস',—'ওথেলো', 'কিং লীয়ার', 'প্রফুল্ল', 'অভাগীর স্বর্গ', 'পণ্ডিত মশাই' প্রভৃতির মধ্যে যে করুণ রসাস্বাদনে অন্তর মুচড়ে ওঠে তার মধ্যেও এই চিন্ময় আনন্দময় অনির্বচনীয় রস আছে, যেহেতু 'কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি-স্যাত্তদুন্মুখঃ,— কারণ তা' না হলে অর্থ এবং সময় ব্যয় করে কেউ উৎকৃষ্ট বিয়োগান্ত নাটকগুলি দেখতে চাইত না। তাই কবিরাজ কৃষ্ণ দাস গোস্বামী বলেছেন,—'বাহ্যে বিষ জ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়'। তুলনা দিয়েছেন—'সেই প্রেমার আস্বাদন, তপ্তইক্ষু-চর্বণ,—মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।'

কবি হলেন কাব্যরসের পাচক,—প্রকাশক হলেন পরিবেশক, পাঠক তার আস্বাদক আর সমালোচক হলেন তার মূল্যমান নির্ধারক। রসিক পাঠক না হলে কবির চলে না,—কবি সব দুঃখ সহ্য করতে পারেন,—কেবল অরসিকের কাছে রস নিবেদন করে 'যেচে মান কেঁদে সোহাগ' পাওয়ার বিড়ম্বনা সহ্য করতে পারেন না ব'লে তা' থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বিধাতাপুরুষকে অনুনয় করেন—

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তাত সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

অতিসামান্য থেকে অসামান্য বা আলোকসামান্য সব কিছুই কবির বিষয়বস্তু হতে পারে। তাঁর সৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং প্রজাপতি এবং সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ। তিনি যেমন অভ্রবিদার তুষারশৃঙ্গ পর্বতমালা দেখে সার্থক কবিতা রচনা করতে পারেন, তেমনি আবার 'তুচ্ছের পরে তৃষিত দৃষ্টি' ন্যস্ত করে 'একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু'র রূপ বর্ণনা করেও শ্রোতৃচিত্ত মুগ্ধ করতে পারেন। কবিকে চলতে হবে,—ফাঁকির পথে নয়, মেকির পথে নয়, সস্তার

পথে নয়—তাঁকে সাধনা করতে হবে, তপস্যা করতে হবে,—কারণ 'চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সাধন' করা দুরাশা মাত্র।

কুম্ভমৌলী নর্তকীর মত—কবির মন থাকবে একান্ত নিবদ্ধ,—সকল সময়ে সঙ্গীতবাদ্য তালমান লয় সকলের ঊর্ধ্বে মাথার উপরে কাব্যরসের পূর্ণকুম্ভটির প্রতি,—নইলে সবকিছু থাকতেও তাঁর রসের কলসীটি ভেঙে পড়লে—তাঁর অপযশ এবং লজ্জার অবধি থাকবে না। আর যদি সেটিকে বাঁচিয়ে সুরে তালে লয়ে মিলিয়ে কাব্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন, তাহলে কবি কৃতকৃতার্থ হবেন।

উপসংহারে একটি কথা বলা প্রয়োজন—সেটি এই যে উৎকৃষ্ট কবিতার আবৃত্তির উপযোগিতা থাকলে সেটি অধিকতর উপভোগ্য হয়। কবিতাকে বলা হয় 'মিউজিক্যাল স্পীচ' বা 'সঙ্গীতময়ী বাণী'। এই সঙ্গীত 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ' করতে হলে নীরব অনুচ্চারিত পাঠের দ্বারা তা সম্ভব হয় না।

সুখপাঠ্য কবিতা স্মৃতির মালায় গাঁথা হয়ে থাকে, সহজে ভোলা যায় না। ভারতবর্ষ তাই তার জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির অধিকাংশকেই বিবিধ হৃদয়গ্রাহী সংস্কৃত ছন্দে গেঁথে রেখেছে।

লোকমাতা নিবেদিতা
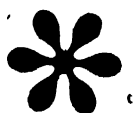
শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

ইংরাজী ১৮৮০ সালের কথা। চন্দননগরের গঙ্গার ঘাট। ঘাটে লেগে আছে একখানি সুসজ্জিত বজরা। তার মধ্যে তখন বাস করছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। একদিন বজরার মধ্যে একটি কক্ষে তিনি যখন আত্মমগ্ন—তখন দরজায় করাঘাত হলো। মহর্ষির ধ্যান ভেঙ্গে গেল। তিনি আগন্তুককে ভেতরে আসতে বললেন। আগন্তুক ভেতরে এলে তিনি দেখেন আগন্তুক সুন্দর বলিষ্ঠ এক কিশোর।

মহর্ষি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার নাম কি? কি চাও? যুবক বললোঃ আমার নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, আমি কাঁসারীপাড়ার শ্রীবিশ্বনাথ দত্তের পুত্র। আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। সকলে বলে আপনি ভগবানকে দেখেছেন—সত্যি বলুন, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন? যুবকের কথা শুনে মহর্ষি স্তব্ধ, তিনি ধারণা করতে পারেননি, কলকাতা থেকে এত কষ্ট করে কেউ তাঁকে এই প্রশ্ন করতে আসতে পারে। এতো পাগলের প্রলাপ নয়। তিনি স্থির হয়ে কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; তারপর ধীরে ধীরে যুবকটির মাথায় সস্নেহে হাত দিয়ে বললেনঃ তুমি ভগবানের সাক্ষাৎ পাবে—নিশ্চয় পাবে।

তরুণ বয়সে নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং অন্তরের এই নিদারুণ বেদনাময় অভীপ্সার তাড়নায় যেমন পীড়িত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আইরিশ দুহিতা মার্গারেট নোবেলকেও ঐ একই প্রশ্ন নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত করছিল। বুদ্ধিদীপ্ত জীবন মার্গারেটের। যা যুক্তি ও বুদ্ধির সকল

দাবীকে সন্তুষ্ট করে এমন কিছুকেই তিনি খুঁজছিলেন। সংশয়ের ঊর্ধ্বে নিঃসংশয়ে দাঁড়াবার মত ভূমি তিনি পাচ্ছিলেন না। তাই শিক্ষকতা, রাজনীতি, সাহিত্য-সাধনা, যশ, প্রতিষ্ঠা সব কিছু তাঁর জীবনের বহিরঙ্গনে পড়েছিল—অন্তরে ছিল এক না জানার বেদনা, এক না পাওয়ার শূন্যতা। এই সবের নিষ্পেষণে তখন একরকম দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল মার্গারেটের জীবন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ সালে লণ্ডনে যান। সেখানে একটি ধর্মীয়-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মার্গারেট নোবলও সেই সান্ধ্য-আসরে উপস্থিত ছিলেন। গৈরিক বসনাবৃত আত্মসমাহিত সন্ন্যাসীর প্রশান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি, অনুপম দেহকান্তি, প্রগাঢ় মুখমণ্ডল শ্রোতাদের মুহূর্তে রুদ্ধবাক্ করলো। সেদিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান। যখন তাঁর ললিতকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল শাশ্বত কল্যাণ মন্ত্র—"শিবঃ শিবঃ, নমঃ শিবায়" তখন চকিতে মার্গারেট অনুভব করলেন মঙ্গলকে। তাঁর পৌরুষদৃপ্ত ভাষণ শুনে তিনি বিস্মিত মুগ্ধ। তিনি যেন এমন একজন দৃঢ় প্রত্যয়ী মানুষকেই গুরু রূপে খুঁজছিলেন।

অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে, জ্ঞানের জ্যোতির্লোকে যিনি নিয়ে যান—তিনি গুরু, পিতা, আচার্য। শাস্ত্রে বলেঃ "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভঃ প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম" অর্থাৎ সুদুর্লভ নরদেহ হচ্ছে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার পক্ষে একমাত্র সুদৃঢ় তরণীতুল্য; গুরুদেবকে এই সংসার সমুদ্রে কর্ণধার করে পাড়ি দিলে ভগবান তাকে চিন্ময়রাজ্যে নিয়ে যান। তাই গুরু পরম আরাধ্য, পরম প্রিয়, আপন হতেও আপন—এই হল ভারতীয় গুরুবাদের সারকথা। শ্রীচৈতন্যদেবও বলেছেনঃ

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর প্রভাবে মার্গারেট ধীরে ধীরে নিবেদিতায় রূপান্তরিত হলেন। বিবেকানন্দের চরণতলে উপবিষ্ট

ছোট্ট শিশুটির মত তিনি নিজের কিছু পরিচয় রাখেন নি। এমন কি কোন চিঠিতে তাঁর একটি স্বাক্ষরের দরকার হ'লেও তিনি লিখতেন—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা (Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda)। রবীন্দ্রনাথের কথায় লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা, সমগ্র বিশ্বের নারী জাতির আদর্শস্থানীয়া ধর্মপ্রাণা সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের মানস কন্যা নিবেদিতার মধ্যে তাই আমরা পাই গুরুচরণগতা চিরউৎসর্গিতা অপরূপাকে।

যাঁরা প্রতীচ্যের ভাবধারায় মানুষ, তারা গুরুশিষ্যার এইরূপ পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক ঠিক বুঝতে পারে না। স্বামীজী ও নিবেদিতার বয়সের তফাৎ মাত্র চার বৎসর—স্বামীজীর জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারী আর নিবেদিতার ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর। তাই এঁদের পিতা-কন্যা হিসাবে স্থান নির্ধারণে অনেকে বিভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞানই আমাদের দেশে পূজ্য—বয়স নয়। তাই জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য বয়োবৃদ্ধ না হলেও পিতার বয়সী শিষ্যের পিতা।

স্বামীজী বলেছেন: যদি আমার একটি ছেলে থাকিত, তবে সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমি তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিতাম, "ত্বমসি নিরঞ্জনঃ" অর্থাৎ তুমি আপনাকে মহান বলে উপলব্ধি কর, তুমিও মহান হবে। স্বামীজীর প্রখর ব্যক্তিত্ব নিবেদিতাকে সম্মোহিত করেছিল একথা সত্য—কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য, তিনি নিজের আরব্ধ কাজ করার জন্য চেয়েছিলেন একটি সন্তান—তিনি নিবেদিতাকে সেই সন্তানরূপে গ্রহণ করে, তাঁকে নিজের মনের মতন করে গড়ে পরাধীন ভারতবাসীর কল্যাণ-সাধনে কেবল উদ্বুদ্ধ করেননি, তাঁকে ভারতবাসীর বিপদের বন্ধু ও ভারতের মুক্তি আন্দোলনের একজন মহিয়সী নেত্রী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে নিবেদিতাকে স্বামীজী তাঁর মনোগত অভিপ্রায় জানিয়ে যে চিঠি দেন, তার অংশ-বিশেষ এই:

> আমি একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের সেবায় তুমি সাফল্য লাভ করবে। ভারতের জন্য, আরো সঠিকভাবে

বললে, ভারতের নারীর মুক্তির জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর প্রয়োজন অনেক বেশী! ভারতবর্ষ এমন 'একজন নারীকে চায় যিনি হবেন সিংহিনীর মত তেজোদৃপ্তা। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতবর্ষ প্রাচীনকালের ন্যায় বীর-নারী-প্রসবিনী হতে পারছে না। তাই তাকে অন্য জাতি থেকে মহিয়সী মহিলা ধার করতে হবে। তোমার ধর্মপ্রাণতা, তোমার মুক্ত শিক্ষা, তোমার সাধনা, তোমার প্রাণপ্রাচুর্য, তোমার সবজীবে প্রীতি, তোমার রক্তে পরাধীনতার জন্য বেদনাবোধ নবভারতের সংগঠনের কাজে খুবই ফলপ্রসূ হবে। তোমার মত নারীকেই ভারতবর্ষ চায।"

পরে আরও সুন্দর করে একটি কবিতায় লিখেছেন :

ভবিষ্যত ভারতের সন্তানের তরে।
মাতা, সেবিকা, বান্ধবী তুমি একাধারে॥
"Be thou to India's future son
The Mother, Maid and Friend in one."

নিজমাতা ভুবনেশ্বরী ও মাতৃজাতির উপর স্বামীজীর শ্রদ্ধা ছিল অতুলনীয়। ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন ভক্তিমতী, শাস্ত্রজ্ঞা, গুণবতী মহিলা। জ্ঞানে-কর্মে, ধ্যানে-ধর্মে, ত্যাগে-প্রেমে মহান ভারতের সব জননী—পালয়িত্রী, রক্ষয়িত্রী রূপে ভারতকে সর্বকালে মহীয়ান করেছেন। তিনি সব সময়ে তাই বলতেন :

"It is my mother who has been the constant inspiration of my life and work. রঁমা রোঁলা লিখেছেন : In America, at the end of 1894, he rendered her public homage in his lectures in praise of Indian womanhood. He often spoke of her (mother) extrolling her self-mastery, her piety, her character.

স্বামীজীর মতন নিবেদিতার একদিকে ছিল যেমন শান্তি আনন্দ প্রেম, ঠিক অপরদিকে ছিল বজ্রকঠিন নির্মম নিরাসক্তি। মৃত্যুই

ত চিরন্তন সত্য—চারিদিকে আমাদের অহরহ মৃত্যুরই সমারোহ—রূপান্তরের অখণ্ড প্রবাহ। এই সত্যকে তিনি নগ্নরূপে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ সত্য আবরণহীন। মরণের ওপারেই মহাজীবনের ভাস্বর মহিমা। তাই নিবেদিতার বর্ণনায় মৃত্যুরূপা কালী যে রূপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তা অতুলনীয়।

"Strong, fearless, resolute—when the sun sets and the game is done, thou shalt know well little one, that I, Kali, the giver of manhood, the giver of womanhood, and witholder of victory, are thy Mother."

Kali the Mother—এর অনুবাদ করে "মৃত্যুরূপা মাতা" শীর্ষক কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যা লিখেছেন, তার কয়েক লাইন এখানে উদ্ধার করছি ঃ

মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাস প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

১৮৯৮ সালের ১৬ই মার্চ মার্গারেট ব্রহ্মচারিণী হলেন। তাঁর পিতা আচার্য গুরু শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ তাঁর নূতন নামকরণ করলেন—নিবেদিতা। তাঁর ধর্মশিক্ষার ভার পড়লো স্বামী স্বরূপানন্দের হাতে। ধর্মশিক্ষা শেষ হলে বিবেকানন্দ তাঁকে বাস্তব সমস্যা ও তৎকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করে দেন। প্রথম সাক্ষাত হলো মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে, যার কাছে নরেন্দ্রনাথ একদিন কৈশোরে তিনি ভগবান দেখেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে যান। তারপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়,

শিশির কুমার ঘোষ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতমা নেত্রী অ্যানী বেশান্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শত শত ভারতীয় মনীষীর সঙ্গে। নিবেদিতার প্রীতি-প্রসন্ন ব্যবহারে এঁদের সঙ্গে একটি আন্তরিকতার পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয় প্যারিসের এক চিত্রপ্রদর্শনীতে,—গুরু বিবেকানন্দের মাধ্যমে। জগদীশচন্দ্রের মনীষা নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছিল, তাই তিনি ভারতে এসে সব সময় নিজের সাধ্যমত জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করতেন। আমৃত্যু শুভানুধ্যায়ী জগদীশচন্দ্র এবং লেডি অবলা বসুও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁরা নিবেদিতার বিশেষ প্রিয় ছিলেন। এঁরা তিনজনে মিলে ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। শ্রীমতী বসুর দার্জিলিং-এর 'রায় ভিলা' ভবনে ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর যখন নিবেদিতার দেহান্ত হয় তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র দেবীদেহ শ্মশানে বহন করে নিয়ে যান।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। নিবেদিতার নির্ভীকতা ও দেশাত্মবোধ কবিকে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরে প্রকৃতির মাঝখানে বহুদিন অতিবাহিত করেন। সেই সময় কিছুদিন নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের অতিথি ছিলেন। তখন বাংলার ছায়াসুনিবিড় সুন্দর গ্রামগুলির সরল মানুষের সহজ জীবনযাত্রা তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল।

নিবেদিতা আবার ভারত পর্যটনে বেরোলেন। এবারের উদ্দেশ্য তীর্থদর্শন নয়—সারা ভারতের শিরা উপশিরায় স্বদেশের জন্য যে বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে—তা উপলব্ধি করা। বম্বে, বরোদা, নাগপুর, পুণা, লাহোর, সুরাট প্রভৃতি স্থান পর্যটন কালে তিনি

প্রখ্যাত দেশপ্রেমিকদের সংস্পর্শে আসেন। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হলো। অরবিন্দ বুঝলেন যে, স্বামীজীর মানসকন্যা তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার ধারক হবার যোগ্যতা রাখেন।

অরবিন্দ লিখেছেন, বাংলার রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা তাঁকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন।

তারপর তিনি বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। শিবাজী উৎসব ও স্বদেশী মেলার সময় নিবেদিতাকে তাই তিলকের পাশে দেখতে পাই।

১৮৯৮ সালের ১১ই নভেম্বর কালীপূজার দিন বাগবাজারে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় যথার্থ শিক্ষা হয়না এ কথা তিনি জানতেন। তাঁর শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল নারীজাতিকে নির্ভীক, সত্যসন্ধ এবং কুসংস্কার-মুক্ত করে তোলা। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ছাত্রীদের চরিত্র' গঠনের কাজে সব সময় তিনি ব্যস্ত থাকতেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতির সাধনায় আরো দুজন মহীয়সী নারী ছিলেন—একজন স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যা ভগিনী ক্রিশ্চিনা ও আর একজন জেজুরের শ্রীমতী সুধীরা বসু। বিবেকানন্দ ছিলেন সত্যসন্ধানী মুক্তিসাধক। তাঁর আবেদন মুখ্যতঃ ধর্মগত হলেও তাঁর প্রভাব রাজনীতিক—এ কথা বলা বোধহয় ভুল নয়। "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম সর্ত ও আগামী পঞ্চাশ বৎসরকাল জননী জন্মভূমিই তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা হোক"—এ কথা তিনি ভারতের অমৃতের পুত্রদের ক্লীবতায় অস্থির হয়ে বলেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন—**Through those years in which I saw him almost daily, the thought of India was to him like the air he breathed.** স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "স্বামী বিবেকানন্দ—পেট্রিয়ট-প্রফেট" গ্রন্থে লিখেছেন—১৯০২ সালে

স্বামীজী জনৈক অধ্যাপককে বলেছিলেন যে, ভারতে এখন বোমার প্রয়োজন। তাই বেলুড় মঠের প্রথম দিকে ছেলেদের "লৌহের মত পেশী" আর "ইস্পাতের মত স্নায়ু" তৈরীর চেষ্টাও স্বামীজী করেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেছিলেন: Vivekananda is a national movement.

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর তিরোধান হ'ল। মহা-প্রস্থানের আগে স্বামীজী তাঁর সমস্ত ব্রতের ভার ভগিনী নিবেদিতা ও ধীরা মাতার উপর অর্পণ করে বল্লেন—"পরমহংসদেব আমাকে যা দিয়েছিলেন সবই তোমাদের দিয়ে দিলাম। একটি নারীর কাছ থেকে যা পেয়েছি তা তোমাদের দিলাম। দিলাম নারীকেই। (ধীরা মাতা হচ্ছেন মিসেস ওলি বুল)।

স্বামীজী বৈরাগ্যকে সভ্যতার প্রাণশক্তি বলে মনে করতেন। 'The only civilisation were those that had been touched with voiragya.' এই দুঃসাহসিক নারীকে তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন তাই বিবেকানন্দের জীবন-দর্শনের শ্রেষ্ঠ বার্তাবহ ছিলেন নিবেদিতা, যাঁর মধ্যে সিংহবাহিনীর মত বিক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল দক্ষিণ সমীরণের মৃদুতা ও স্নিগ্ধতা।

দীনবন্ধু এণ্ডুস বলেছেন—Swamiji's intrepid patriotism gave a new colour to the national movement throughout India.

মহাত্মা গান্ধী বলেন—I have gone through his works, very thoroughly and after having gone through them, the love that I have for my country became a thousandfold.

নিবেদিতা নিজে ছিলেন পরাধীন আয়ার্লণ্ডের অধিবাসী—তাই পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেব রিচমণ্ড ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করলেও

আইরিশ জাতির মুক্তিযুদ্ধের তিনি ছিলেন অন্যতম হোতা। সুতরাং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার যুবশক্তি যখন দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনে তৎপর, তখন বিপ্লবী পিতার কন্যা নিবেদিতা তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন এবং ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত ইংরাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনিও বিদেশী শাসনের নগ্নতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা দৃপ্তকণ্ঠে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনিই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ও গুপ্তসমিতি গঠনে তিনি আজীবন উৎসাহ দিয়েছিলেন।

ধর্মনীতি, রাজনীতি ছাড়া ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনেও তাঁর অবদান অসামান্য বলা যায়। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যে যে সৌন্দর্য এবং শিল্প সুষমা আছে তার উদ্ধারের জন্য তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদারকে অজন্তায় "গুপ্তযুগের অমূল্য শিল্পকলার প্রতিলিপি অঙ্কনের জন্য পাঠিযে দেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু বলেন: তিনি একরকম জোর করে আমাদের পাঠিয়ে ছিলেন। দশ-বার দিন পরে তিনিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাদের অজন্তার ছবি নকল করার কাজ দেখে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না—শতমুখে তিনি প্রশংসা করলেন।

ধর্মসাধনার সঙ্গে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা—স্বামীজীর এই স্বপ্ন ও সাধনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য নিবেদিতা আজীবন চেষ্টা করেন। কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার শেষে মতবিরোধ ঘটলো—মিশনের উদ্দেশ্য খালি সেবাধর্ম, কিন্তু নিবেদিতার উদ্দেশ্য সমগ্র জাতির পুনরভ্যুত্থান। মিশন থেকে একটা পথ বেছে নেবার জন্য তাঁর কাছে প্রস্তাব গেলো। তখন এ সবের উর্ধ্বে, আপামর জনসাধারণের স্বাধীন সত্তার আশ্বাস তিনি শুনেছেন—ভারতমাতা তাঁকে ডাকছেন। তাঁর অন্তরলোক তখন দ্বিধায় টলমল, দু নৌকায় পা দেওয়া চলবেনা। তিনি মিশনের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিন্ন করলেন। বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও তাঁর

ভিতরের আধ্যাত্ম্য সম্বন্ধের সাযুজ্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বলেন: দেশের চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তা এখন এক সুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে। এখন ঐ পথ ত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুবরণ আমার কাছে সহজ। আর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন: আপনি ও মঠের আর সবাই রোজ আমার হয়ে আমার শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমার প্রাণের ঠাকুরের ভস্মাবশেষের বেদিমূলে।

সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সেণ্ট জোয়ান, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি মহিয়সী মহিলাগণ পৃথিবীতে এমন কিছু আদর্শ বস্তু দিয়ে গেছেন, যার জন্য যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সমস্ত লোক সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁদের মহতী কীর্তি স্মরণ করে। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে শিখাময়ী অগ্নীময়ী নারী নিবেদিতা তেমনি একটি স্মরণীয় পবিত্র নাম। নির্যাতিত নিপীড়িত অবহেলিত ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে পরজাতির কল্যাণ ও মুক্তিসাধনের জন্য এতবড় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাজীবনের পথিক গুরুর সকল ইচ্ছাই অনুপম সুন্দররূপে পূর্ণ করেছিলেন—গৃহ সমাজ দেশ ত্যাগ করে, সর্ববন্ধনমুক্ত মহামহিয়সী নারীকুলের সাম্রাজ্য লোকমাতা দেশ ও মানবসেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন ছিল তাঁর আদর্শপথের অবলম্বন। ভারতীয় উদার ধর্মমতের মধ্যে সর্বধর্মের মূলীভূত সত্য সেই হিরণ্ময় পাত্রের অভ্যন্তরে 'যত মত তত পথ' এই সারবস্তুকে তিনি ধ্যানে কর্মে ও মননে আয়ত্ত করেছিলেন। ঈশ্বরকে বহুরূপে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, তাই এ দেশের স্ত্রীশিক্ষা, মুক্তি আন্দোলন, শিল্পসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'লোকমাতা', দার্শনিক ব্রজেন্দ্রলাল শীল 'বিবেকানন্দের উপসংহার', দানবীর স্যার রাসবিহারী ঘোষ 'শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র', মতিলাল ঘোষ 'নারীকুলের সম্রাজ্ঞী', নাট্যকার মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'মানবী আকারে দেবী' আখ্যায় তাঁকে ভূষিত করেছিলেন।

ভক্তের মধ্যে অষ্টাদশ 'মহাদোষ' রহিত হ'য়ে, বৈষ্ণবের যে ষড়্‌-বিংশতি গুণ ভগবানের কৃপায় তিলে'তিলে উন্মেষিত হয়, সে সমস্ত লক্ষণই 'তিলোত্তমা নিবেদিতায়' পূর্ণমাত্রায় সঞ্চারিত হয়েছিল। "সর্বমহাগুণধর বৈষ্ণব শরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।" মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তের কি কি গুণ হয়, সে বিষয়ে বলেছেন :—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ।
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্রী, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

গুরুচরণগতা, ভক্তিমতী, জ্ঞানবতী, বৈরাগ্যবতী, লোকমাতা নিবেদিতার জন্মশতবর্ষে মহাপ্রভুর কথায় তাঁকে "সর্বমহাগুণধর পরমা বৈষ্ণবী" আখ্যায় ভূষিত করে তাঁর শ্রীচরণে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

শব্দে ও প্রবচনে প্রাণী-নাম

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

শব্দের ইতিহাস কেবল শব্দেরই উদ্ভব বিকাশ পরিবর্তন পরিণতির গতিপথ অনুবর্তন করে তাহা নহে, উহা মনুষ্যজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও বহু দুর্লভ এবং মূল্যবান্ তথ্য আপন প্রবাহের সহিত বহন করিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু যুগযুগান্তরের পলিমাটিতে অনেক সময় তাদের মুখের উপর মুখোশ আঁটিয়া দেয়, শত শতাব্দীর স্রোতোবেগ তাহাদের ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন রূপে রূপায়িত করিয়া তোলে। একদিন খালি চোখে দেখিয়া যাহার গোত্র নির্ণয় করা সম্ভব হইত আজ সাধারণ মানুষ তাহার দেহে বংশের কোনো লক্ষণই দেখিতে পাইবে না। প্রত্নতাত্ত্বিকের মত ভাষাতাত্ত্বিকও আজ এক-একটি শব্দের গা হইতে মাটি ছাড়াইয়া তাহার মৌলিক রূপের সন্ধান করিতেছেন, ভগ্ন দীর্ণ টুকরাগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া জুড়িয়া তাড়িয়া মৌলিক অঙ্গসংস্থানের রূপনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। তাহার কিছু কিছু ফল আমরা পাইতেছি। পুরাতনের সহিত নূতনের সংযোগ সূত্র প্রতিদিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে।

মনুষ্যজাতির সহিত মনুষ্যেতর জীবজগতের সম্পর্ক একদিন বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। মনুষ্যজাতি যখন বানরত্ব হইতে নরত্ব লাভ করিয়াছিল সে যে কত লক্ষ বৎসর আগেকার কথা তাহার হিসাব বৈজ্ঞানিকরা দিয়াছেন। সে হিসাব নির্ভুল না হইতে পারে, কিন্তু ভুল যদি কিছু থাকিয়াও যায় তাহাতে আসল তত্ত্ব খণ্ডিত হয় না। অসভ্য মানুষ আরণ্যক ছিল এবং সভ্যতা লাভের পরেও যে সে অরণ্যজীবনের অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ অদ্যাবধি অবিরল। মানব সভ্যতা বিশেষ পরিণতি লাভ করিবার পূর্বে

যে নগরের জন্ম হয় নাই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আর নগর নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই সকল মানুষ যে নগরে চলিয়া যায় নাই— তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিংশ শতাব্দীর এই তৃতীয় পাদেও সমগ্র পৃথিবীতে নগরবাসীর তুলনায় পল্লীবাসীর সংখ্যা অনেক বেশী এ বিষয়ে কি কাহারও সংশয় আছে?

অরণ্যজীবনের অভ্যাস লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভ্যাস। মানুষ যখন কথা বলিতে শিখিল তখন পশুপক্ষীই তাহার প্রতিবেশী। তখনও সে সমাজ গঠন করিতে শিখে নাই, জীবজন্তুর মত নিজের উপরেই তাহাকে নির্ভর করিতে হইত, জীবজন্তুর জীবনযাত্রাই ছিল তাহার আদর্শ। এই সকল জীবজন্তুর মধ্যে কেহ ছিল তাহার ভক্ষ্য কেহ বা ভক্ষক, কাহাকেও সে ভয় পাইত কেহ বা তাহাকে ভয় করিয়া চলিত, কোনো জন্তু স্বভাব-গুণে তাহার বন্ধুতা পাইল, কেহ বা স্বভাবদোষে তাহার শত্রু বলিয়া গণ্য হইল। শত্রুই হউক মিত্রই হউক এই জীবজন্তুই হইল তাহার সঙ্গী সহচর। ভাষার তত্ত্বসন্ধানীদের মধ্যে যাঁহারা বলেন পশুপাখীর কণ্ঠস্বর হইতেই মনুষ্যভাষার জন্ম তাঁহাদের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

মানুষ যখন পুরাপুরি সভ্য হইল তখনও সে জীবজন্তুকে পরিত্যাগ করিল না। পরিত্যাগ করার উপায় নাই। খাদ্যের প্রয়োজন বড় প্রয়োজন। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলে মিলিয়া আমাদের সেই প্রয়োজন মেটায়। স্থলচর জলচর খেচর সকল জাতীয় প্রাণীই আমাদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্য প্রয়োজনেও জীবজন্তুর ব্যবহার আরম্ভ হইল। কেহ হইল বাহন, কেহ হইল প্রহরী, কেহ হইল বার্তাবহ। কেহ তাহার লজ্জা নিবারণ করিল, কেহ বা শীতাতপের হাত হইতে তাহার দেহটিকে রক্ষা করিল, কেহ বা তাহার অসুখে বিসুখে ঔষধ জোগাইল। অদ্যাবধি মানুষ কাহাকেও খাঁচায় পুরিয়া মজা দেখিতেছে, কাহাকেও হত্যা করিয়া বাহবা পাইতেছে, কাহাকেও পূজা করিয়া ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে, কাহাকেও কোলে বসাইয়া স্নেহরসে সিক্ত করিয়া

তুলিতেছে। সে কাহাকেও আদর করে, কাহাকেও গালি দেয়, কাহাকেও ঠেঙ্গায়, কাহারও পিঠ চাপড়ায়, আবার কেহ ঘরে ঢুকিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। মানুষের কাছে ইহাদের মধ্যে কেহ নির্বোধ বলিয়া নিন্দিত, আবার কেহ বা বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসিত হয়। দুর্বল অসহায় বলিয়া কাহারও প্রতি আমরা করুণা দেখাই, প্রবল অনিষ্টকারী বলিয়া কাহারও উপর ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করি।

এইভাবে একান্ত সান্নিধ্যবশতঃ জীবজন্তুরা মনুষ্যজীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভাষার মধ্যে তাহারা কিছুটা স্থান করিয়া লইবে ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি? ভাষার শব্দগঠনে প্রাণীজগতের দাম কম নয়। জীবজন্তুর নাম অবলম্বন করিয়া কত শব্দ যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররা তাহার হিসাব লইয়া দেখিতে পারেন। কোনো কোনো প্রাণী বহুসংখ্যক নাম গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। এক এক প্রাণীর অনেক নাম কেন হইল তাহা আলোচনা করিবার বিষয়। কেবল শব্দে নয় প্রবাদে প্রবচনে রূপকে উপমায় পশুপক্ষীর সাক্ষাৎ সর্বদাই পাওয়া যায়।

মানুষ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তাহার পরিচিত প্রাণীদের প্রকৃতি সম্বন্ধে এক এক রকম ধারণা করিয়া বসিয়াছে। প্রাণীনাম বাচক বহু শব্দ তাই এখন উক্ত প্রাণীর গুণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

গাধাকে ধরা হয় স্থূলবুদ্ধির প্রতীক। যাহাকে বোকা বলিয়া গালি দিতে চাই তাহাকে 'গাধা' বলি; বলি—তুমি একটি 'আস্ত গাধা'। জগতে অসাধু অসৎ লোকের অভাব নাই কিন্তু যাহারা চালাক চতুর তাহারা ধরা পড়ে না, বোকারাই ধরা পড়ে। 'সব জন্তু মোট বয় ধরা পড়েছে গাধা। সবাই সতী কবলায় ধরা পড়েছে রাধা' —এই প্রবাদে 'গাধা'র বোকামিই প্রকট। 'আদা বেচে গাধা', 'হাঁচি টিকটিকি বাধা যে না মানে সে গাধা' প্রভৃতি প্রবাদের গাধা আসলে নির্বোধের প্রতিশব্দ। 'ঘোড়ার পেট গাধার পিঠ খালি থাকে কদাচিৎ' —এই প্রবাদেও গাধার নির্বুদ্ধিতাই প্রকট। গাধাকে

'গর্দভ' করিলে ভাষাটা সাধু হয় বটে কিন্তু তাহার বুদ্ধির মান আদৌ বাড়ে না। গাধাকে পিটিয়া কেহ কখনো ঘোড়া করিতে পারে নাই। তবে লোকমুখে শুনিয়াছি 'অশ্বেরে পিটিলে হয় গাধা'। গাধার পিঠে যত বোঝাই চাপানো হউক সে নীরবে বহন করে, 'ধোপার গাধা'য় সেই অর্থ প্রচ্ছন্ন। 'গাধা বোট' না 'গাদা বোট'? গাদা বোটই বোধ হয় ঠিক। তবে 'ধোপার গাধা' সম্মুখে থাকায় সম্ভবতঃ 'গাদা'র 'দ' মহাপ্রাণ হইয়া গিয়াছে। বোকামি অর্থে 'গাধামি' ভাষায় অপ্রচলিত নয়। 'গর্দভরাগিণী' শুনিলে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন। সংস্কৃত বৈয়াকরণ গর্দভ শব্দের মূল গর্দ্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গর্দ্ ধাতুর অর্থ শব্দ করা। ব্যাকরণের নির্দেশ মানি বা না মানি গর্দভের স্বর যে নিতান্ত সুশ্রাব্য নয় ঈশপ্ হইতে বিষ্ণুশর্মা পর্যন্ত সকলেই সে বিষয়ে একমত। ফলে গর্দভ শব্দের সহিত উৎকট চীৎকারের একটা যোগাযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। 'রাসভরাগিণী' গর্দভরাগিণীরই সানুপ্রাস রূপান্তর। 'দূর থেকে মনে হয় নহবতের বাণী, বারবাড়ীতে গিয়ে শুনি গাধার চেঁচানি।'—গাধার চেঁচানি দূর হইতে নহবতের বাণী বলিয়া ভ্রম হইবার কোন কারণ নেই। মন্দ জিনিসকেও দূর হইতে ভাল মনে হইতে পারে,—এই হইল তাৎপর্য। ইংরাজী ass শব্দের কথাটা এই প্রসঙ্গে ভাবুন। যখন কোনো লোক makes an ass of himself তখন বঙ্গীয় বা ভারতীয় গাধার সহিত ইংলণ্ডীয় ass-এর বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। গাধা—যে নামেই হউক না কেন—পৃথিবীর তাবৎ দেশে ছিল এবং আছে এবং থাকিবে। লোকরহস্যের গ্রন্থকার 'গর্দভ'-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নানা দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে।" বঙ্কিমের বক্তব্য সেদিনও যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্য আছে।

গোস্তনের মত আকার বলিয়া সংস্কৃতে দ্রাক্ষাফলের এক নাম 'গোস্তনী'। 'গোষ্ঠ' পশুচারণের মাঠ; তাহা হইতে মিলনক্ষেত্র,

সভাস্থল। 'গোষ্ঠী' শব্দের অর্থও সভাসমূহ, দল, গণ, পরিবার, পোষ্যবর্গ। 'ইষ্টগোষ্ঠী'র অর্থ এক গুরুর শিষ্যদের মধ্যে ভাববিনিময় ও আলাপ-আলোচনা। 'গোরোচনা' পিউড়িরঙের নাম। জনশ্রুতি ইহা গোমস্তক বা গোপিণ্ডজাত। কিন্তু আজ যাহাকে গোরোচনা বলি তাহার সহিত গোজাতির কোনো সম্বন্ধ নাই। 'গো' শব্দ একদিন শ্রেষ্ঠ শব্দের সমার্থক হইয়াছিল। ''গোতম' 'গৌতম,' শব্দ তাহার পরিচয় আছে।

'গোয়াল' আসিয়াছে গোশালা হইতে। 'গোঠ' শব্দ গোষ্ঠজাত। দুষ্ট গোরুর জন্য ভিন্ন 'গোয়াল' বা ''গোঠের' ব্যবস্থা লোকশাস্ত্রের বিধান।

সংস্কৃতে গোশব্দের বহু অর্থ। গাভী বৃষ পশু মাতা গায়ত্রী বাণী স্বর্গ চক্ষু ইন্দ্রিয় দৃষ্টি দিক্ কেশ কিরণ জল বাণ সূর্য চন্দ্র ইত্যাদি। গো শব্দ যে অতি প্রাচীন তাহা আমরা জানি। ইংরাজী Cow জর্মন Gau প্রভৃতি শব্দ জ্ঞাতিসূত্রে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। গোবাচক একটি ইন্দো-ইউরোপীয় মূল শব্দ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। লক্ষ্য করিবার বিষয় ইউরোপে উহাদের মৌলিক অর্থের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু ব্যঞ্জনার লক্ষণার বলে সংস্কৃতে গো শব্দ অনেক নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। এমন অর্থও গ্রহণ করিয়াছে মূলের সহিত যাহার সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এরূপ অর্থের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

'গো' শব্দের প্রসঙ্গে বৃষ শব্দের কথা উঠে। সংস্কৃতে ইহারও নানা অর্থ। যেমন—ইন্দ্র, ধর্ম, বিষ্ণু, ময়ূরপুচ্ছ, কন্দর্প, বলশালী ব্যক্তি, জল, শুক্র ইত্যাদি। রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশির নাম বৃষ। লাতিন Taurus-এর অর্থও বৃষ। শিবের নাম বৃষবান বা বৃষধ্বজ। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধবিশেষ। আলংকারিক অর্থে আড়ম্বর বুঝাইতে 'বৃষোৎসর্গ' শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। বৃষোৎসর্গে বৃষবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠস্তম্ভের নাম 'বৃষকাষ্ঠ'। অতিশয় শীর্ণলোককে বিদ্রূপ করিয়া বলা হয় বৃষকাষ্ঠ। 'বৃষ্য' শব্দের অর্থ বলকর, বাজিকর,

মাষকলাই। 'বৃষ্যা'র অর্থ শতাবরী, আমলকী। স্থূলস্কন্ধশালী ব্যক্তিকে বৃষস্কন্ধ বলা হয়।

গোরুকে আমরা যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি প্রবাদে প্রবচনে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল মূল্যবান সম্পত্তির মত গোরুকেও সাবধানে রাখিতে হয়। গোধন হরণের অনেক কাহিনী পুরাণে পাওয়া যায়। বাংলা দেশের সীমান্তে একালেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। তাই লোকশ্রুতির উপদেশ,—'গোরু জরু ধান রাখ বিদ্যমান', নহিলে চুরি যাইবার ভয় আছে। জরুর সহিত গোরুকে এক পংক্তিতে বসাইয়া লোককবি জরুকে হয়তো কিছুটা খাটো করিয়াছেন কিন্তু তাহার ফলে গোরুর মূল্য কিন্তু অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। 'ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে গোয়ালার গরু টেঁকে বসে'। এই বাক্যে গোরুর মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে শকুনির চরিত্রেরও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 'গোমড়ক' এদেশের পক্ষে একটা বিষম বিপর্যয়। কোনো স্থানে এক সঙ্গে অনেক গোরু বিনষ্ট হইলে সেখানকার অর্থনীতিতে গুরুতর সঙ্কট দেখা দেয়। 'গোমড়কে মুচির পার্বণ'-এর অর্থ 'কারও পোষ মাস কারও সর্বনাশ'।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে আজ সর্বসাধারণে গোরু পোষে না। দুধের জন্য পল্লীর গৃহস্থেরাও কখনও কখনও দুইটা একটা গোরু পুষিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাকে সম্পত্তি বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। চাষী এবং গোয়ালা জীবিকার জন্য গোরু রাখে। কলের ব্যবহার বাড়িলে একদিন চাষের কাজেও হয়তো গোরুর দরকার হইবে না। তবে দুধটা যতদিন কলে তৈয়ারি না হইতেছে ততদিন কেবল দুধের জন্যই গোরুর প্রয়োজন থাকিবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে যেদিন গোরু ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল সেদিন ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গে তাহার নাম নানাভাবে চলিত ছিল। আজও ভাষায় তাহার প্রয়োগ প্রচলিত।

গ'ড়ে গোরু, কুঁড়ে গোরু, কানা গোরু স্বভাবতই কেহ কিনিতে চাহে না। কিন্তু বাজারে বিক্রেতার সুনাম (good will) থাকিলে যেমন বাজে মালও কাটিয়া যায় তেমনি 'গাঁয়ের গুণে গ'ড়ে গোরু বিকায়'। বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া বোকা লোকে 'কড়ি দিয়ে কানা গোরু' কেনে। এবং যখন বোঝে এ গোরু দিয়া কোনো কাজ হইবে না তখন তাহা 'বামুনকে দান' করিয়া ভ্রম সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পুণ্যার্জনও করিয়া লয়। এ যুগেও সে রীতি বর্জিত হয় নাই, তবে গো-ব্রাহ্মণের রূপটা কিছু বদলাইয়া গিয়াছে এই যা।

গৃহস্থের ঘরে গাই না থাকা সেদিন ছিল দারিদ্র্যের চিহ্ন। যাহার 'গোয়ালে গোরু মরায়ে ধান' সেই সংগতিপন্ন। দারিদ্র্যের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য মানুষ যাহা নাই তাহাই আছে বলিয়া ভান করে এবং অনভিজ্ঞতা বশতঃ ধরা পড়িয়া লজ্জা পায়। 'কোনো কালে নাইকো গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই'—প্রবাদটির ইঙ্গিত লক্ষ্য করুন।

গোরুর গুণাগুণ প্রসঙ্গে অনেক প্রবাদের জন্ম হইয়াছে। কুঁড়ে গোরু অতিশয় নিন্দাভাজন। কাজ করিবে না অথচ সকলের সমান খাইবে—সেটি যাহাতে না হয় সে জন্য 'কুঁড়ে গোরুর ভিন্ন গোঠ'-এর ব্যবস্থা। 'কলুর বলদ' কোনো কাজের নহে শুধু ঘানিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া মরে।' সে জন্য প্রবাদের নির্দেশ 'গাই নেবে দুয়ে বলদ নেবে বেয়ে'। 'বেয়ে' অর্থাৎ লাঙ্গল চালাইয়া।

কেবল নির্বুদ্ধিতা নয়, গাধার দুর্বুদ্ধিতার অখ্যাতিও মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। 'ঘুলিয়ে খায় গাধা নাম হারামজাদা' অথবা 'সেই গাধা জল খায়, তবু গাধা ঘুলিয়ে খায়'—এই দুইটি প্রবাদ লক্ষ্য করুন। গাধা মোট বয় বলিয়াই তাহার মূল্য। খোঁড়া গাধার মত অদরকারী বস্তু আর কিছুই হইতে পারে না। অবস্থার তেমনধারা অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটিলে 'খোঁড়া গাধারও ঘোড়ার দর' হইতে পারে।

নির্বুদ্ধিতার দিক্ দিয়া গোরুকেও গাধার শামিল করা হয়। গোমূর্খ শব্দ গোরুর গোত্বের প্রাচীন প্রমাণ। 'গো-বৈদ্যে'র গো

আক্ষরিক অর্থে যতটা চলে আলংকারিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার অনেক বেশী। গোরুর নিরীহতার আভাস আছে 'গোবেচারা' শব্দে। এ শব্দটা যে খুব বেশী পুরাতন নয়, ফারসী বেচারা তাহার প্রমাণ। 'গোবেড়েন'—প্রাদেশিক 'গো বাড়্‌তান'—প্রয়োজন হইলে মানুষের পৃষ্ঠেও পড়িয়া থাকে এবং যাহার সে আঘাত ফিরাইয়া দিবার শক্তি নাই সেই তাহা সহ্য করে।

গো-জাত 'গোবা' 'গোবু' প্রভৃতি শব্দ নির্বোধের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। হবুচন্দ্র রাজার যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার নাম 'গোবুচন্দ্র'। যে হাবা সে গোবাও বটে।

দুর্বল নিরীহ নির্বোধ প্রভৃতি অর্থে 'গোরুর' ব্যবহার আছে বটে কিন্তু এই জীবটির প্রতি আমাদের আনুকূল্যেরও অভাব নাই। এই শব্দের সহিত সংযুক্ত বহু শব্দ আমরা সংস্কৃত হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইযাছি।

পুংগব শব্দের অর্থ পুরুষ গো অর্থাৎ বৃষ, ষাঁড়। বৃষকে যে ভারতবর্ষ একদিন শ্রেষ্ঠতার প্রতীক বলিয়া মনে করিত তাহা নরপুংগব প্রভৃতি শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। John Bull কথাটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

গোমাতা শব্দে গোজাতির প্রতি ভারতবাসীর প্রতি অনুকম্পা-মিশ্রিত কৃতজ্ঞ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গোহত্যা তাহার কাছে পাপ। গোঘাতকের জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। 'অবোধেরই গোবধে আনন্দ'। যে গোমাংস অতি প্রাচীনকালে ভক্ষ্য ছিল তাহাই একদিন হিন্দুর কাছে অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইল। নিরক্ষর মূর্খ লোকের কাছে 'ক অক্ষর গোমাংস'।

'গোকুল' হিন্দুর কাছে পবিত্র স্থান। কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ 'গোকুলেই বাড়িয়াছিলেন'। গোরুর পায়ের ধূলি উড়ে বলিয়া সন্ধ্যার নাম 'গোধূলি'। কেহ অনেক খাদ্য মুখে পুরিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া খাইলে বলি 'গোগ্রাসে' গিলিতেছে। এক জাতীয় সাপের নাম হইল

'গোক্ষুরো'—তাহা হইতে গোখরো। কেন? না, তাহার মাথায় যে চিহ্ন আছে তাহা দেখিয়া কাহারও কোনো কালে গোরুর ক্ষুরের মত মনে হইয়াছিল। অতিক্ষুদ্র 'আধারের নাম 'গোষ্পদ'। 'গোধিকা' ছোট কুমিরের মত এক প্রকার স্থলচর প্রাণী। ইহা সাপও নয় এবং গোরুর সঙ্গেও ইহার কোনো সম্পর্ক নাই। তবু ইহার নাম হইয়াছে 'গোসাপ'। সংস্কৃতেও 'গোসর্প', 'গোসর্পিকা' পাওয়া যায়।

গো হইতে 'গোপ গোপী গোপিনী গোপীচন্দ্র' ইত্যাদি আসিয়াছে। 'গোপাল' হিন্দুর দেবতা। 'সাক্ষীগোপাল' 'নাড়ু-গোপাল'ও দেবতা বটেন, তবে নাম দুইটি ব্যঙ্গ্যার্থেও ব্যবহৃত হয়। গোরুর মত মুখ বলিয়া কুমিরের নাম 'গোমুখ'। হিমালয়ের যে প্রসিদ্ধ গহ্বরের মধ্য দিয়া গঙ্গা নদী বাহির হইয়াছে তাহার নাম 'গোমুখী'। সেও এই কারণে। জানালার নাম 'গবাক্ষ'। এক সময়ে গোরুর চোক্ষের আকৃতি অনুসারে বাতায়ন নির্মিত হইত। দুধের নাম 'গোরস'। 'গোবিষ্ঠা'র আধুনিক রূপান্তর 'ঘুঁটে'। গোবিষ্ঠারই অন্য নাম 'গোবর'। গোবর নানা অর্থে ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গোবরগাদায়' পদ্মফুল—এখানে গোবরগাদা অর্থে নীচকুল। অকর্মণ্য লোককে বলি ষাঁড়ের গোবর। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে ষাঁড়ের গোবর ব্যবহারের বিধান নাই বলিয়া এইরূপ অর্থপ্রাপ্তি। এখানে লৌকিক স্মৃতিশাস্ত্র ক্রিয়াশীল। স্থূলদেহ অলসপ্রকৃতি লোককে বলি 'গোবরগণেশ'। 'গোকুলের ষাঁড়' স্বেচ্ছাচারী অনিষ্টকারী ব্যক্তি। 'ধর্মের ষাঁড়'ও এতৎসহ তুলনীয়। ন্যায়শাস্ত্রেও উপমা প্রয়োগের জন্য গোজাতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। 'অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায়' একটি অতি প্রচলিত উপমা। 'গোবিষাণন্যায়' এতটা প্রচলিত না হইলেও একেবারে অপরিচিত নয়। ইহার অর্থ,—যেমন গোরুর একটি শিং আগে ধরিয়া তাহার পর দ্বিতীয় শিংটি ধরিতে হয় তেমনি।

গোহত্যা যে পাপ বলিয়া জানি তাহার প্রমাণ আছে 'গোরু মেরে জুতা দান'-এ। গোরু মারিয়া যে গুরুপাপ হয় জুতাদানের পুণ্য তাহার অনুপাতে নিতান্তই নগণ্য।

যে লোভের বশে বৃত্তি পরিবর্তন করিতে চায় সে ঠকিয়া মরে। 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে কাল করল এঁড়ে গোরু কিনে' অথবা 'আগে ভাল ছিল জেলে জালদড়ি বুনে, কি কাজ করিল জেলে এঁড়ে গোরু কিনে'।

আর একটি প্রবাদ দেখুন,—'এঁড়ে গোরু না টেনে দো'। এঁড়ে গোরু বলা সত্ত্বেও যে টানিয়া দুহিতে বলে, সে হয় বধির নয় নির্বোধ। অনুরূপ আর একটি প্রবাদে গাই না থাকিলে বলদ দুহিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

তত্ত্বোপদেশমূলক প্রবাদেও গোজাতির সমাগম ঘটিয়াছে। 'আপন আপন যত কর, চিনির বলদ বয়ে মর।' পরের অর্থ লইয়া যে নাড়াচাড়া করে তাহাকে 'চিনির বলদ' বলা হয়। চিনি বহাই সার হয়, খাইবার অধিকার নাই।

বোকা অর্থে 'গোরু' শব্দের ব্যবহার হয় সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি, রাগ বেশী হইলে কেবল 'গোরু' বলিয়াই মনের ঝাল মিটে না, কেহ কেহ তাহার আগে একটা 'বন' বসাইয়া দেয়। যেমন,—'ওঝার বেটা বন গোরু'। অর্থ পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ। পোষা গোরু অপেক্ষা বুনো গোরুর বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম এই অনুমানের উপরেই প্রবাদটির জন্ম।

গৃহস্থ গাই ও বাছুরকে নিজের স্বার্থে পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। তবু সুযোগ পাইলেই বাছুর গাইয়ের কাছে আসিয়া দুধ খাইয়া যায় অথবা গাই বাছুরের নিকটে আসিয়া দুধ দিয়া যায়, গৃহস্থ তাহা টের পায় না। গাই বাছুরের এই সম্পর্কটিকে একটি প্রবাদে রূপ দেওয়া হইয়াছে। —'গাই বাছুরে পিরীত থাকলে মাঠে গিয়ে দুধ দেয়'। বাৎসল্যের এই উদাহরণটি মধুর রসের ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 'পিরীত' কথাটির মধ্যেই তাহার ইঙ্গিত আছে।

গণনাবিষয়ক প্রবাদেও গোরুর নাম পাওয়া যায়। যেমন,— 'গোনা গোরু বাঘে খায় না'। পাঠান্তর 'হিসাবের গোরু বাঘে খায়

না'। অর্থ এই,—গোরু চরাইতে পাঠাইবার সময় গুনিয়া পাঠাইতে হয়, এবং মাঠ হইতে ফিরিলে গোয়ালে ঢুকাইবার সময় গুনিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে হারাইবার ভয় থাকে না। গোয়ালে ঢুকাইবার সময়ই যদি দেখা যায় দুই একটা কম পড়িয়াছে তাহা হইলে তখনই খোঁজ করা সম্ভব হয়। পরে খোঁজ করিলে ফিরিয়া না পাইবার আশঙ্কাই বেশী। এই প্রবচনটি এখন আমাদের মুখে রূপান্তর লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছে,—'হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না'—গোরু শব্দের যাহা ব্যঙ্গার্থ তাহাই বাচকের মুখে স্বাভাবিকভাবে আসিয়া গিয়াছে, যদিও সমগ্র বাক্যটির আক্ষরিক বিচারে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষে গোরুর এমন মহিমা যে গোময় গোমূত্রও উপেক্ষিত হয় নাই। 'গোবর' শব্দের আলোচনা আগে করিয়াছি। গোময় গোমূত্র পঞ্চগব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে স্থান পাইয়াছে। গুণদোষের বিচার প্রসঙ্গে দুগ্ধ ও গোমূত্রের তুলনা করা হইয়াছে এই প্রবাদটিতে—'এক কলসা দুধে এক ফোঁটা চোনা'।

একজনের দুঃখ দেখিয়া অন্যজন যদি নিজের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা না করিয়া হৃষ্টমনে কাল কাটায় অথবা বিপন্ন জনকে উপহাস করে তাহা হইলে আমরা বলি 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে'। 'ঘসি' শব্দটি আঞ্চলিক, ইহা 'ঘুঁটে'রই প্রতিশব্দ। 'ঘসি ঘাঁটা' একটি নিকৃষ্ট কর্ম। প্রাচীন সাহিত্য হইতে একটা উদাহরণ দিই। কৃষ্ণ স্বীয় বংশী উৎকোচ দিয়া রাধার প্রেম প্রার্থনা করিলে রাধা ঘৃণাভরে উত্তর দিলেন, 'তোর বাঁশি মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ'। শব্দগঠনে প্রাণী-নাম প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায় গো-গর্দভ প্রসঙ্গ এইখানে সমাপ্ত হইল।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

প্রফুল্লকুমার সরকার

[আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, খ্যাতনামা সাহিত্যিক, পরম-ভাগবত, বৈষ্ণব-চূড়ামণি, স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার আজীবন রবিবাসরের সদস্য ছিলেন। তাঁরই পুণ্যস্মৃতিতে বর্তমান সংকলন গ্রন্থখানি উৎসর্গীত হয়েছে।

রবিবাসরে তিনি তাঁর অনেক মূল্যবান রচনা পাঠ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" গ্রন্থখানির সূচনাও রবিবাসরেই হয়েছিল। রবিবার ৪ঠা চৈত্র, ১৩৪৬ তারিখে কলকাতা করপোরেশনের কিউরেটর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য রোডের 'আর্ট চেম্বার' ভবনে 'রবিবাসর'-এর একাদশ বর্ষের একবিংশ অধিবেশনে প্রফুল্লকুমার "বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে বহুতথ্যপূর্ণ একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটিতে ৬-৪০ হতে ৭-৪০ মিনিট মোট এক ঘটা সময় লেগেছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলেন,—

"বাঙ্গলাদেশে এক কালে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৮৭২ খৃঃ সেনসাস কমিশনার রিজলি সাহেব বলেন যে, সমগ্র বঙ্গের লোক-সংখ্যা ২$\frac{1}{2}$ কোটি, তন্মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই হিন্দু, মাত্র এক তৃতীয়াংশ মুসলমান। ১৮৮১ খৃঃ-এর সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায়, হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান—প্রত্যেকে বাঙ্গলার সমগ্র লোক-সংখ্যার শতকরা ৪৯ ভাগ। কিন্তু তারপর হইতেই বাঙ্গলায় হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, এবং মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৯৩১ সালের সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাঙ্গলায় হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪৩ ভাগ এবং মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৫ ভাগ। অর্থাৎ ১৮৮১-১৯৩১ খৃঃ এই পঞ্চাশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগ কমিয়াছে, মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগ বাড়িয়াছে। ইহা আকস্মিক নহে। বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ ইহা ঘটিয়াছে।

বাঙ্গলার হিন্দুর এই ক্ষয়ের কারণ কি? একই দেশে, একই জলবায়ুর মধ্যে এবং একই রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া হিন্দু কেন কমিতেছে আর মুসলমান কেন বাড়িতেছে? সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, হিন্দু সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এমন সব ত্রুটি ও দৌর্বল্য আছে, যাহার ফলে হিন্দুরা ক্ষয় হইতেছে। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়, গ্রামবাসী অনুন্নত ও নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরাই বেশী ক্ষয় হইতেছে। কতকগুলি জাতি প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম।

"প্রফুল্লবাবু নানা তথ্য আলোচনা করিয়া অবশেষে বলেন-যে হিন্দু সমাজে বহু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহের অপ্রচলন, হিন্দুদের ধর্মান্তর গ্রহণ, কৃষক শ্রমিক ও শিল্পী হিন্দুদের শ্রমবিমুখতা এই সমস্তই হিন্দুদের ক্ষয়ের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কন্যাপণ ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে এবং বিধবা বিবাহের অপ্রচলনে তাহারা অধিক পরিমাণে ক্ষয় হইতেছে। সর্বোপরি তাহাদের মধ্যে যে জীবনের প্রতি একটা ঔদাসীন্য, will to live-এর অভাব ঘটিয়াছে, তাহাই হিন্দু সমাজের পক্ষে মারাত্মক। যদি এখনও হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে জাতি রক্ষার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প না হয়- তবে বাঙ্গালী হিন্দু আগামী এক শতাব্দীর মধ্যেই লুপ্তপ্রায় হইবে, অথবা নগণ্য সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে।"

"বক্তৃতার অন্তে যে আলোচনা হয় তাহাতে স্যার যদুনাথ সরকার, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি যোগদান করেন। স্যার যদুনাথ এই প্রসঙ্গে গ্রামের হিন্দুদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন,—একদল সেবাব্রতী কর্মী যদি গ্রামে যাইয়া প্রচার ও সংগঠন কার্য করেন, তবে এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের আশা করা যায়। তাঁহার মতে জাতিভেদের কঠোরতা দূর এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব উপজাতি ও শ্রেণীভেদ আছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া বিবাহের ক্ষেত্র প্রসারিত করা উচিত।"

"সর্বশেষে সভাপতি (অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র) মহাশয় বক্তৃতাটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন

করেন। তিনি বলেন—বিগত পঞ্চাশ বৎসরের আদমসুমারীর হিসাব হইতে বক্তা বেশ সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু জাতি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং সেই ক্ষয়ের অনুপাতও বিশেষ উদ্বেগজনক। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ইহার কতকগুলি সুচিন্তিত কারণও নির্দেশ করা হইয়াছে। তবে মনে হয় যে, সেগুলি ছাড়াও ইহার অপরাপর কারণ আছে। সে সকলের অনুসন্ধান ও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিরূপে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে সে বিষয়ে সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয়ে গবেষণায় নিরত হওয়ায় বক্তা সকলেরই ধন্যবাদার্হ।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই চৈত্র, ১৩৪৬

রবিবাসরে সেদিনকার আলোচনার পরেও প্রফুল্লকুমার এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁর গবেষণার বিষয় ধারাবাহিক ভাবে "হিন্দুসমাজের ব্যাধি" নামে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর একাধিক প্রবন্ধ রবিবাসরেও পাঠ করেন। পরে সেই প্রবন্ধসমূহের সংকলন "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সমগ্র ভারতের মনীষীবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), রাজশেখর বসু, রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লেঃ কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মনীষী ডঃ ভগবান দাস (কাশী) যে মন্তব্য করেন তার কিয়দংশ তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টেই দেওয়া আছে। আর আচার্য স্যার যদুনাথ সরকার রবিবাসরের অধিবেশনেই তাঁর এই প্রচেষ্টায় সাধুবাদ জানান।

এখানে আমরা প্রফুল্লকুমারের মূল্যবান গ্রন্থের কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি।]

—সম্পাদক।

বর্ণাশ্রম ধর্ম ও জাতিভেদ

ডাঃ ভগবানদাসের মতে জাতিভেদই হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্গতির মূল কারণ। যাহা পূর্বে সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় "বর্ণাশ্রম ধর্ম" ছিল, তাহাই কালক্রমে বিকৃত হইয়া এই ঘোর অনিষ্টকর জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবং আরও কোন

কোন মনীষীও এইরূপ কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছেন। কথাটা অনেকটা সত্য হইলেও আমাদের মনে হয়, ইহার সবখানি ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের মধ্যে বর্ণাশ্রম বা কর্মবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদ যে একেবারেই ছিল না এমন কথা বলা যায় না। জাতি-ভেদের আরম্ভ হইয়াছিল সেই কালে, যে কালে দ্বিজাতি ও শূদ্র এই দুই বৃহৎ শ্রেণীবিভাগ হইযাছিল। দ্বিজাতি বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝাইত। ইহারা সকলেই ছিলেন আর্য। এই তিনবর্ণের মধ্যে আহার ব্যবহারে, বিবাহের আদানপ্রদানে বিশেষ কোন ভেদ ছিল না। ইহার পরেই একটা দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডী টানিয়া দেওয়া হইয়াছিল—আর সেই গণ্ডীর অপর পারে ছিল শূদ্রেরা। শূদ্র বলিতে সাধারণত 'অনার্যদের' বুঝাইত। আর্যেরা ভারতে আসিয়া আদিম অধিবাসী অনার্যদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কতকাংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। যে সব অনার্য আর্যদের শরণাপন্ন হইল, তাহাদের দাস বা অনুগত হইয়া বাস করিতে সম্মত হইল, তাহারাই আখ্যা পাইল শূদ্র। তাহারা আর্যদের পরিচর্যা করিয়া তাহাদের সমাজের আওতায় কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ('পরি-চর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং')। কিন্তু শুধু পরিচর্যার অধিকারটুকুই তাহারা পাইল,—আর্যেরা তাহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার মেলামেশা করিতেন না, বৈবাহিক আদানপ্রদান তো দূরের কথা। 'অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার' সূচনা হইল এইখানেই।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। শূদ্রদের মধ্যেও আবার একটা গণ্ডী টানা হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত হীন, অধম বা বর্বর বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহারা হইল 'অন্ত্যজ'। ইহারা আর্যদের অধ্যুষিত গ্রামে বা নগরে থাকিতে পারিতনা, উহার বাহিরে প্রান্ত-সীমায় থাকিতে বাধ্য হইত। শূদ্রেরা চতুর্থ বর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আর এই অন্ত্যজদের বলা হইত 'পঞ্চম বর্ণ'। ভারতের সকল প্রদেশেই এই পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব এক কালে ছিল। এখনও দক্ষিণ ভারতে,

বিশেষত মাদ্রাজে তাহার জীবন্ত নিদর্শন বিদ্যমান। এই পঞ্চম-বর্ণীয়েরা এমনই 'হীন' ও অধম' যে, তাহারা গ্রাম বা সহরের এলাকার বাহিরে বাস করিতে বাধ্য হয়, রাজপথ দিয়া হাঁটিতে পারে না। সাধারণের ব্যবহার্য কূপ হইতে জল তুলিতে পারে না। ব্রাহ্মণ দেখিলে পলায়ন করে, পাছে তাহাদের গায়ের বাতাস লাগিয়া ব্রাহ্মণ অশুচি হয়। আমাদের বাঙালা দেশেও অন্ত্যজদের বংশীয়েরা আছে কিন্তু তাহাদের এতটা সামাজিক নির্যাতন বা দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয় না।

এই যে দ্বিজাতি, শূদ্র এবং অন্ত্যজ—ইহাই হিন্দু সমাজে জাতিভেদ। আর্যেরা অবশ্য নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধি তথা সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার ফলে যে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে বর্ধিত ও শাখা-প্রশাখা সমন্বিত হইয়া সহস্র-শীর্ষ জাতিভেদরূপে প্রকট হইল।

হিন্দু সমাজে যে 'অস্পৃশ্যতারূপ' ব্যাধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভিত্তি পূর্বোক্ত আর্য-অনার্য ভেদের উপর। দ্বিজাতিরা শূদ্র ও অন্ত্যজদের স্পর্শ করিতেন না, করিলে 'ধর্মহানি' হইত, তাহাদের প্রস্তুত বা স্পৃষ্ট আহার্য-পানীয় গ্রহণ তো দূরের কথা। কালক্রমে পরিচর্যার গুণে শূদ্রদের মধ্যে কেহ কেহ দ্বিজাতিদের স্পৃশ্য ও আদরণীয় হইল বটে, কিন্তু অনেকে পূর্ববৎ অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়ই রহিয়া গেল। অন্ত্যজদের তো কাহারও ভাগ্যের কোন উন্নতিই হইল না। বাংলা দেশের হিন্দু সমাজে 'অস্পৃশ্য' ও 'অনাচরণীয়' উভয়ই আছে। কতকগুলি জাতি 'অনাচরণীয়' (যাহাদের জল 'চল' নহে) কিন্তু 'অস্পৃশ্য নহে—অপর কতকগুলি উভয়ই।

সুতরাং ডাঃ ভগবানদাস যে বলিয়াছেন, প্রাচীন কালে হিন্দু-সমাজে বর্ণাশ্রম ছিল, জাতিভেদ ছিল না,—আহার ব্যবহার, বৈবাহিক আদানপ্রদান তাহাদের মধ্যে চলিত। একের 'বংশধরেরা অন্যের

বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত। কিন্তু এরূপ "বিশুদ্ধ" বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা খুব বেশীদিন অব্যাহত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতের যুগেও দেখি,—দ্বিজাতিদের, মধ্যে বৃত্তি অনেকটা বংশানুক্রমিক হইয়া উঠিযাছে অর্থাৎ বর্ণাশ্রম জাতিভেদের আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বংশধরেরা ব্রাহ্মণের বৃত্তিই অবলম্বন করিত, কেহ কদাচিৎ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিত। আবার ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও কেহ কদাচিৎ ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ক্ষত্রিযবৃত্তি অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণেরা 'ক্ষত্রিয' বলিয়া গণ্য হইতেন না, ব্রাহ্মণই থাকিযা যাইতেন। যথা দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি। পরশুরামের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বৈশ্য অধিরত-পুত্র কর্ণ ক্ষত্রিযবৃত্তি গ্রহণ করিলেও ক্ষত্রিয বলিয়া গণ্য হন নাই। ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান চলিত বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত অল্প। এই সমস্ত হইতে বুঝা যায, মহাভারতের যুগেই দ্বিজাতিদের মধ্যে জাতিভেদ বেশ দানা বাঁধিযা উঠিযাছিল এবং অনেকটা পাকা-পাকিভাবেই 'বৃত্তি' বংশানুক্রমিক হইযা দাঁড়াইযাছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপার ঘটিল—'যাহাতে জাতিভেদের কাঠামো আরও দৃঢ়তর হইল। আর্য সমাজের প্রথমাবস্থায দ্বিজাতিদের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ বিশেষ ছিল না, সকলেরই মর্যাদা সমান ছিল। কিন্তু কালক্রমে নানা কারণে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা খুব বাড়িয়া গেল, তাঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা ব্রাহ্মণের পরে এবং বৈশ্যের মর্যাদা ক্ষত্রিয়ের পরে নির্দিষ্ট হইল। ফলে, পরস্পরের মধ্যে আহারব্যবহার, বৈবাহিক আদানপ্রদান ক্রমশ লুপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়ের চেয়ে বেশী মানী হন, তাঁহার বাড়ীতে অন্নগ্রহণ না করেন, তবে তিনি ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে বিবাহ করিবেন কিরূপে? মহাভারতে যে সমাজের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে, যাহাতে এই সব প্রথা তখনই যে অনেকটা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এইভাবে দ্বিজাতিদের মধ্যে জাতিভেদ যখন বেশ পাকারকম হইয়া দাঁড়াইল, তখন আর একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইল। বর্ণবিভাগকে গণ্ডী টানিয়া জাতিভেদে পরিণত করা যায়, কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করা যায় না। সে ক্ষেত্রে জীবপ্রকৃতি মানুষের সকল বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ শাসনের অনভিপ্রেত কাণ্ড করিয়া বসে। সুতরাং বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বৈবাহিক মিলন ঘটিতে লাগিল। ফলে, বিভিন্ন মিশ্র জাতি বা সঙ্করজাতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। বলাবাহুল্য, এই প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে অনার্য শূদ্রেরাও বাদ গেল না, তাদের যুবক-যুবতীদের সঙ্গেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈবাহিক মিলন ঘটিতে লাগিল। কালক্রমে এই যে সব সঙ্করজাতির সৃষ্টি হইল, তাহাদিগকে সমাজের কোথায় স্থান দেওয়া হইবে, ইহা এক মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। এই সমস্যার বিপুলতা ও জটিলতার প্রমাণ 'মনুসংহিতা' হইতে পাওয়া যায়। সঙ্করজাতির সৃষ্টি অবশ্য মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না, বরং অত্যন্ত নিন্দনীয়ই ছিল। গীতায় অর্জুন বলিয়াছেন, "সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ'। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্ণসঙ্করদের কিছুতেই অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করা গেল না, সমাজে তাহাদিগকে স্থান দিতেই হইল; চারিবর্ণ বা চারিজাতি ভাঙ্গিয়া বহু বর্ণ বহু জাতিতে পরিণত হইল। এইরূপে জাতিভেদ বেশ জাঁকালো রকমে বহু বিচিত্র মূর্তিতে হিন্দুসমাজে তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিল।
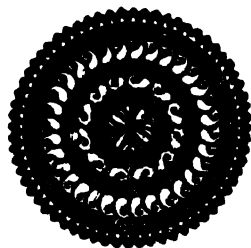
এক-দুই-তিন
(একাঙ্ক নাটিকা)
শ্রীমন্মথ রায়

[বালিগঞ্জে ক্যাপ্টেন সেনের বাসভবন। রাত্রিবেলা। ক্যাপ্টেন সেন তাঁহার সদ্য-পরিণীতা স্ত্রী মেঘনা সেনকে লইয়া ডাইনিং টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন]

সেন ॥ এ আমাদের পৈতৃক বাড়ী। পছন্দ হল কি মেঘনা ?

মেঘনা ॥ তা মন্দ কি, তবে বড় পুরনো। যদি কিছু মনে না কর বলব ?

সেন ॥ বল মেঘনা, বল।

[বাহিরে হঠাৎ একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল]

মেঘনা ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] ও কি !

সেন ॥ একটা নেড়ী কুত্তা।

মেঘনা ॥ কী বিশ্রী ডাক !

সেন ॥ ওটাকে আজ সকালে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখছি আবার এসেছে। বোধহয় অনেক কাল এ বাড়িতে আছে। হ্যাঁ, বাড়িটা সম্বন্ধে তুমি যেন কি বলতে গিযে থেমে গেলে ?

মেঘনা ॥ বলছিলাম কি, বাড়িটাতে কেমন যেন একটা ভুতুড়ে ভাব আছে।

সেন ॥ আমরা কেউ থাকি না তো। আমার তো সারাটা জীবন বিদেশেই কেটেছে। বিয়ে করতে কলকাতায় আসতে হল। তাই কতকাল পর আসা হল এই পৈতৃক ভিটায়। খাবার দিতে বলেছি, এস বসি।

[বাহিরে পুনরায় কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। মেঘনা চেয়ারে বসিল বটে কিন্তু ক্যাপ্টেন সেন ছুটিয়া জানলায় গিয়া কুকুরটির উদ্দেশ্যে বলিলেন—]

সেন ॥ I say, Neri, Stop.

মেঘনা ॥ (খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) কুকুরটা খুব বুঝল।

সেন ॥ ও, বেশ, স্পষ্ট বাংলাতেই বলছি—নেড়ী, আমি কারও অপরাধ দু বারের বেশী ক্ষমা করি না। তিনবার অপরাধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করি। আমি ক্যাপ্টেন সেন।

মেঘনা ॥ My God—তুমি কি বলছ ?

সেন ॥ আমার যা স্বভাব তাই বলছি। নেড়ী, বেশ লক্ষ্মীটির মত চুপ করে থাক। আমি নতুন বিয়ে করে বউ ঘরে এনে তুলেছি আজ। কেলেঙ্কারি করো না এখন। আমাদের একটু আরাম করে খেতে দাও।

[জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া ডাইনিং টেবিলে বসিলেন]

সেন ॥ সিমলা গিয়ে দেখবে মেঘনা, সেখানে আমার দু-দুটো অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে। কিন্তু দেখবে তারা কি ভদ্র !

মেঘনা ॥ সিমলা খুব সুন্দর, না ?

সেন ॥ সে তুমি নিজে গিয়ে দেখে বলবে। কিন্তু খাবার দিতে দেরী করছে কেন ? (চীৎকার করিয়া ডাকিলেন) বয় !

মেঘনা ॥ একটা কথা বলব ?

সেন ॥ বল। বল না।,

মেঘনা ॥ তুমি বড্ডো চেঁচিয়ে ডাক। আমি চমকে উঠি।

সেন ॥ (হাসিয়া) ও। আচ্ছা।

[বয়ের প্রবেশ]

সেন ॥ আমি দু-বারের বেশী কারও কোন অপরাধ ক্ষমা করি না। তিনবারের বার গুলি করি। পনের মিনিট আগে তোমাকে খানা দিতে বলেছিলাম। এখনও খানা এল না। মনে রাখবে এটা হল এক। আর দশ মিনিটের মধ্যে খানা না এলে সেটা হবে দুই।

বয় ॥ জি।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল)

মেঘনা ॥ রিভলবারটা তাই তুমি সব সময় কাছে রাখ ?

সেন ॥ হ্যাঁ। না না, তুমি ভয় পেয়ো না।...আজ রাতটা বড় বিচিত্র মনে হচ্ছে আমার।

[নেড়ী কুত্তাটি বাহিরে আবার ডাকিয়া উঠিল]

সেন ॥ (চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া নেড়ীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া) নেড়ী, এক—

[সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া মেঘনার সহিত আলাপ শুরু হইল]

সেন ॥ বিচিত্র নয় কি মেঘনা ? দু-দিন আগেও তোমাকে চিনতাম না, কিন্তু কাল তোমাকে বিয়ে করার পর থেকে মনে হচ্ছে তোমাকে যেন কতকাল চিনি, কতকাল জানি।

মেঘনা ॥ আমিও তাই ভাবছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে : পাত্রী চাই। আমার ফটো পাঠিয়ে বাবা লিখলেন তোমাকে চিঠি, কিন্তু বাবা স্বপ্নেও হয়তো ভাবেন নি যে তোমার মত একজন জবরদস্ত মিলিটারী অফিসার সেই চিঠি পেয়ে, ফটো দেখে, ঝড়ের মত এসে বলবে—

সেন ॥ ওঠো খুকী, আজকেই তোমার বিয়ে। এটা হচ্ছে মিলিটারী ট্রেনিং। বুঝলে খুকী ?

মেঘনা ॥ খুকী ? (খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল) আমি খুকী ?

[বাহিরে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল]

সেন ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নেড়ী, তুই। (আবার বসিয়া পড়িলেন)

মেঘনা ॥ একটু জল।

সেন ॥ খাবে ? বয় ! (হাতঘড়ি দেখিয়া) আচ্ছা, আমি দিচ্ছি।

[টেবিলে রক্ষিত জলপাত্র হইতে গ্লাসে জল ঢালিয়া মেঘনাকে দিলেন. মেঘনা জল পান করিল]

সেন ॥ তোমার ক্ষিধে পেয়েছে honey. (হাতঘড়ি দেখিয়া) খাবার এল বলে।

মেঘনা ॥ আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

সেন ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমার কথা শুনতেই তো আজ চাই মেঘনা।

মেঘনা ॥ তুমি লড়াইয়ে গেছ ?

সেন ॥ নিশ্চয়। এই তো সেদিন—কাশ্মীরে।

মেঘনা ॥ কত লোক মেরেছ তুমি ?

সেন ॥ অগুন্‌তি। অগুন্‌তি। লেখাজোখা নেই।

মেঘনা ॥ আচ্ছা, তোমার মনে এতে এতটুকু কষ্ট হয় না, না ?

সেন ॥ কষ্ট ? ফুঃ ! I am a military man.

[সঙ্গে সঙ্গে মেঘনা জলপাত্র হইতে জল ঢালিয়া খাইতে উদ্যত হইল]

মেঘনা ॥ বিশ্রী গরম পড়েছে।

সেন ॥ কিন্তু অত জল খাওয়াও বিশ্রী। এটা এক নম্বর দোষ।

মেঘনা অ্যাঁ ?

সেন ॥ হ্যাঁ।

[বাহিরের কুকুরটি আবার ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন সেন রিভলবার লইয়া বাহিরে ছুটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

মেঘনার হাত হইতে জলের গ্লাস সশব্দে পড়িয়া গেল। সে ভয়চকিতা হইয়া কক্ষান্তরে ছুটিয়া গেল। বাহিরে গুলির শব্দ এবং কুকুরের আর্তনাদ শোনা গেল। পরক্ষণেই ক্যাপ্টেন সেন ডাইনিং টেবিলে ছুটিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বয় খাবারের একটি ট্রে লইয়া ঘরে ঢুকিল]

সেন ॥ এ কি! (ডাকিলেন) মেঘনা!

বয় ॥ মেমসাব চলা গিয়া হুজুর।

সেন ॥ কাঁহা চলা গিয়া?

বয় ॥ মালুম নেহি হুজুর।

সেন ॥ মালুম নেহি? কিঁউ? ইয়ে তুম্‌হারা দো নম্বর কসুর হুয়া।

বয় ॥ মেমসাব ভাগ গিয়া।

সেন ॥ ভাগ গিয়া! তব্ কিউ নেই পাকড় লিয়া? ইয়ে তুমহারে তিন।

[সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার দিয়া বয়কে গুলি করিলেন। কিন্তু দেখা গেল বয় যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে এবং বাহিরে কুকুরটিও পুনরায় ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল]

সেন ॥ মেমসাব কো পাকড়াও। বলো, ইয়ে হামারা ব্লাঙ্ক ফায়ার। ফাঁকা আওয়াজ।

বয় ॥ জি সরকার। ইয়ে তো হাম দশ বরষ দেখতা হ্যায়। আপ তো নেহেরুজীকি চেলা হ্যায়।

সেন ॥ Yes, this is our milltary tactics. We will be firm : we will fire : but blank. মেমসাব কা পাকড় লে আও জলদি।

[যবনিকা]
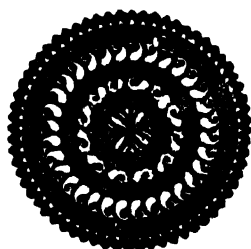
জলধর

বাঙালীর প্রীতি মধ্যে যে দীর্ঘ জীবনের তরী
স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারসে নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।
আজি সংসারের পারে, দিনশেষে অস্তাচল লোকে
প্রশান্ত তোমার স্মৃতি উদ্ভাসিত অন্তিম আলোকে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরী
১১।৫।৩৯

রবিবাসরের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেনের মৃত্যুসংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ পুরী থেকে উক্ত কবিতাটি লিখে পাঠান।

তুমি এসেছিলে ভালো বেসেছিলে

নরেন্দ্র দেব

(১)

তুমি এসেছিলে ভালো বেসেছিলে কবি,
এই ধরণীব ধূলো, মাটি, জল, হাওয়া,
শালের বনের তরু তৃণে নানা ছবি,
নদী কূলে কূলে পাল তুলে তরী বাওযা।
আষাঢ আকাশে এলায ববষা আসি
মেঘের বরণ সুনিবিড় কালো চুল,
গোধূলি বেলায পূরবীযা বাজে বাঁশী
শ্যাম সমারোহে অরণ্য সমাকুল।

(২)

তুমি এসেছিলে ভালো বেসেছিলে কবি
অশোকে পলাশে ফাল্গুন ফুলছ্যুতি
নীলমণি লতা, মুকুলিকা যে মাধবী,
মধু মল্লিকা, মালতী, বকুল, যুথী।
শিথিল শেফালী, কামিনী, কমল, নীপ,
চিকণ শ্যামল কিশলয় পল্লব,
সাঁঝের ললাটে তারকা পরায় টিপ,
প্রকৃতি সাজিছে ভুলাইতে বল্লভ ?

(৩)

তুমি এসেছিলে, ভালো বেসেছিলে কবি,
দখিনা বাতাস, সোনালী শারদ আলো,
তরুণী উষার প্রণয়ী তুমি যে রবি,
আঁধার হৃদয়ে আশার প্রদীপ জ্বালো।।
তোমার কণ্ঠে জীবনের জয়গান
ছন্দ দোদুল নৃত্যের তালে তালে,
যৌবন রসে উচ্ছল তব প্রাণ
জাগায় নবীনে যুগে যুগে কালে কালে।

(৪)

তুমি এসেছিলে, ভালো বেসেছিলে কবি
যত অসহায় অনাথ আতুর জনে,
দীনের বুকের বেদনাটি অনুভবি
সমবেদনায় ব্যথিত হয়েছো মনে।
মুক্তি কামনা ছিল না তোমার জানি
চাহনি ছাড়িতে আমাদের এ ভুবনে,
বৈরাগ্যের সাধনা লহনি মানি
সুখী হয়েছিলে মিলিযা সবার সনে।

(৫)

তুমি এসেছিলে, ভালো বেসেছিলে কবি,
শ্রমিক, মজুর যারা শুধু কাজ করে,
হে মহা মানব! তোমার আপন সবই,
ঠাঁই নিয়েছিলে বিশ্বের ঘরে ঘরে।
পেয়েছি আমরা সীমাহীন তব দান;
অতুল প্রতিভা শ্রদ্ধায় আজি স্মরি,
দিয়েছো দেশের দুর্লভ সম্মান;
চরণে তোমার লুটায়ে প্রণাম করি।

ছাপ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মন থেকে ময়লা ছাপ ঘসে তোলার
কোনো রবার নেই,
হৃদয় থেকে বেয়াড়া ছোপ মুছে দেওয়ার
কোনো চুনকাম।

দগদগে ঘাগুলোর রগরগে রং
সময় একটু ফিকে করে দেয় শুধু
ঢাকা দেয় মরা চামড়ার কিণাঙ্কে।

কিন্তু প্রতিদিনের
আপাততুচ্ছ গ্লানি আর যন্ত্রণাগুলো
রক্তের মধ্যেই লুকিয়ে ফেরে
ঘুমন্ত জীবাণুর মত
কখন হঠাৎ বিরস রসনায়
জীবনের স্বাদ বিষিয়ে দিতে,
কিংবা আচমকা জ্বলে উঠতে
সংক্রামক বিস্ফোরণে।

ভুলতে চাই, তবু পারি কই,
বড়বাজারের ঠেলায় রিকশায়
লরীতে মোটরে ঠাসা
পাঁওদলে কিলবিল সেই বুকচাঁপা গলিটা,
নোংরা রুগ্ন কামুকতার চেয়ে
বীভৎস এক লুব্ধতা
পান জরদার উগ্র সুবাস ছড়িয়ে
ফিনফিনে আদ্দির উদ্ধত শুভ্রতায়
নির্লজ্জভাবে যেখানে আস্ফালিত,
আর ভয়ে সিঁটোনো
অঝোর কান্নায় ঝাপসা চোখে
একটা চেনা মুখ খুঁজে-না-পাওয়া
এক রত্তি সেই ছুটো বেওয়ারিশ মেয়েকে,
হাওড়া ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে
দুনিয়ার জমজমাট উনিশশো আটষট্টি
অকাতরে যাদের ফেলে পালিয়ে গেছে।

শিকড়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শিকড় মাটির থেকে অগোচরে রস নিয়ে আসে
পরার্থজীবিত বৃক্ষ ভরে তোলে পত্রপুষ্পোচ্ছ্বাসে
সুবাসে-নির্যাসে।

নতুনের বন্যা আনে প্রতি বর্ষে বসন্ত বিহ্বল—
সমস্ত নতুন হয়, ডালপালা ফুলপাতা অস্থিচর্ম পল্লব-বল্কল,
খসার ঝরার দেশে বয়ে আনে সবুজের জয়ন্ত ফসল
অজস্র প্রোজ্জ্বল।

কিন্তু তার শিকড় শিকড় থাকে, অব্যাহত, ধ্রুবলগ্ন মৃত্তিকার ভিতে
সুদূর অতীতে;
থাকে গূঢ় দৃঢ়বদ্ধ শক্ত ও আসক্ত থাকে, থাকে সে পুরোনো,
নতুনের অবান্তর তৃষ্ণা নেই কোনো।

সে যদি নতুন হতে চায়
ঐতিহ্য যে মুখ ঢাকে পরম লজ্জায়।

সত্তায় শক্তিতে স্বপ্নে সমূলেই গাছ মরে যায়।

তেমনি তোমার সর্ব নতুনের প্রাচুর্যের প্রসাদের ঘরে
অব্যয় অক্ষুণ্ণ থাকো অনাহত গভীরের স্তরে,
অব্যর্থ শিকড়ে॥

হারানো সন্ধ্যা

কবিশেখর শ্রীকৃষ্ণধন দে

পাখীব পালক ছুঁয়ে সন্ধ্যা নামে এ সবুজ মাঠে,
এখানে ঘাসেব গন্ধে ধরা দেয় মাটির আহ্লাদ।
উত্তুরে বাতাস লেগে কাপাসেব ফসগুলি ফাটে,
এখানে নদীব পাবে উঠি উঠি জাফরানি চাঁদ।

এখানে আসবে তুমি? আকাশ গলানো নীল বঙ,
কত কালো হয়ে গেছে চুপিসাড়ে বনেব আসরে,
আধগাওয়া সেই গান শেষ কবো তুমিই ববং
যে টুকু ভুলেছ তুমি, শুনে নাও পাতাব মর্মবে।

যে ম্লান নিঃসঙ্গ তারা ইসারায ডেকেছে সন্ধ্যারে
গোধূলির শেষ রঙ আলগোছে তাবে ছুঁয়ে যায,
একটি লাজুক লগ্ন ফিরে যায এসে অভিসারে
ঝিঁঝিঁ-ডাকা ঝাউ বনে নীড় ফেরা পাখীর ডানায়।

তার কথা বলো শুধু ডুব দিয়ে মনের গভীবে
যে সন্ধ্যা হারায সে তো জেগে থাকে তারার তিমিরে

রথযাত্রা*

সংগ্রাহক—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

চার্চ চার্চ, বড় উডেন চার্চ,
অলমাইটি হ্যাজ নো হাত ॥

অল ম্যান ক্রাই ক্রাই
বলে সব জয় জগন্নাথ যাই ॥

'সি' করব মাহেশের মেলা,
টানব রথ, হবেনা রিবার্থ ॥

ছুটি দাও সাহেব, খুসী হয়ে
করব তোমায় সেলাম শত সাত ॥

পুরাবো ডিউটি ওভার টাইমে,
চল যাই সবে জয় জগন্নাথ ॥

(* ১৭৫ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী কেরাণীরা এইরূপ কথায় ইংরাজ বণিকদের মন জয় করত।)

২৫শে বৈশাখ

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

তোমার সৃষ্টি আমার দৃষ্টি-চেতনা দিয়েছে খুলে
তাই ধরণীর ধূলার পরশ কত না লেগেছে ভালো,
তোমার ছন্দে সুর আনন্দে জীবন উঠেছে দুলে
শত হতাশার অমানিশা রাতে তাইতো দেখেছি আলো।

তোমার তুলির পরশে পেয়েছে কত আলেখ্য প্রাণ,
ভ্রমর পেয়েছে গুঞ্জন আর পুষ্প পেয়েছে মধু,
সাগর শুনেছে দিগন্ত পারে মিলনের কলতান—
সোহাগে সলাজ আনন তুলেছে বালিকা পল্লীবধূ।

দীন সঙ্কোচে কণ্ঠে তোমার মালিকা পরায়ে বলি—
এ ফুল তোমার উদ্যান হতে এনেছি চয়ন করি,
শ্রদ্ধাসূত্রে এ দীন কেবল রচিয়াছে অঞ্জলি
ধন্য মানিব চরণধূলিরে পরশিতে যদি পারি।

এ জন্মতিথি বিশ্ব স্মরণে হয়ে থাক অম্লান,
গ্রহে উপগ্রহে জানি অহরহ ধ্বনিছে তোমার গান॥

কবি-প্রয়াণ

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এমন শ্রাবণ, স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল ভুবন
এত অনুরাগে-ভরা মানুষের মন,
রৌদ্রে তবু ঝরে কেন বৈরাগ্যের সুর?
প্রকৃতি করুণাময়ী, নিয়তি নিষ্ঠুর।

নিস্পন্দ অতল সিন্ধু, নিস্তব্ধ বাতাস,
নিঃশব্দ আকাশ, শুধু মৃদু দীর্ঘশ্বাস,
ধীরা ধরণী—যেন অতি নিঃসহায়
মূর্চ্ছিত মুহূর্ত সাথে মিলাইয়া যায়।
যেথা শান্ত জীবনের অশ্রান্ত মর্মর,
অসীম সাগর আর অনন্ত অম্বর
রচিয়াছে লীয়মান দিগন্তের রেখা
পার হয়ে তাহা—আসে যেন, যায় দেখা,
অচেনা দেশের কোন্ সোনার তরণী।
বিমূঢ় চাহিয়া থাকে বিস্মিত ধরণী।
সমাপ্ত কি কাজ, কবি, সমাপ্ত কি গান?
কে ডাকে ইঙ্গিতে দূরে? কাহার আহ্বান?

এ নহে শীতের রাত্রি ঘন অন্ধকার
ঝিল্লী মুখরিত। কত পথ হয়ে পার
কৃষ্ণবাসে অঙ্গ ঢাকি, কৃষ্ণ অশ্বে চড়ি,
অপূর্ব রহস্যময় বধূবেশ ধরি
আসেনি সে দ্বারদেশে কৃষ্ণাবগুণ্ঠনা,
নীরবে অঙ্গুলি তুলি করেনি উন্মনা।

কে এল তরণী বেয়ে পারে ? গুরু গুরু
ডাকে মেঘ। এবার কি যাত্রা হ'ল সুরু
নিরুদ্দেশ পানে ? দূর দিগন্তের শেষে
মিলাইয়া যায় তরী সূর্যাস্তের দেশে।

এখনো মধ্যাহ্ন বেলা, এখনো যে দিন,
পূরবীর ছন্দে শেষ আরতির বীণ
এখনি বাজালে কেন ? চেয়োনা বিদায়,
এখনো যে এ পৃথিবী রহে প্রতীক্ষায়—
শুনিতে তোমার বাণী। না ফুরাতে কথা
কোথা তারে নিয়ে যাও জীবন দেবতা ?
স্তব্ধ বিশ্ব নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভরে।
কন্যারূপী বঙ্গবাণী কহিছে কাতরে,
"যেতে নাহি দিব"। ব্যথা-বিধুর অন্তর
উঠিছে করুণ কণ্ঠে সমবেত স্বর,
"যেতে মোরা দিব না তোমায়"। শোন শোন,
মনে মনে অভিমান রেখো নাকো কোন,
ওগো বন্ধু, ওগো কবি, ওগো অভিমানী।
অন্তর উজাড় করি তারা দিল আনি
প্রীতির সম্ভার, ভরা অসীম বিশ্বাসে
নির্ভরতা, তারা তোমারেই ভালবাসে।

মনোরাজ্যে তব অভিষেক, ওগো কবি,
প্রাণের সম্রাট তুমি। জীবনের ছবি
আঁকিয়াছ অপরূপ তব কাব্যে গানে,
জীবন ঐশ্বর্যশালী তোমারি যে দানে।
কোটিপতি শ্রেষ্ঠী নহ দুর্ধর্ষ সেনানী,
নহ রাষ্ট্রনেতা, তব অগ্নিময়ী বাণী
জগতে জাগালো এক নূতন বিস্ময়।
গাহিলে "সুন্দর ধরা," জীবনের জয়।

অনুপম, সৌম্যকান্তি, সুন্দর-দর্শন,
চোখে প্রতিভার জ্যোতি, প্রশান্ত বদন,
শুভ্রবেশ শুভ্রকেশ, প্রাণ স্পর্শে তব
জেগে ওঠে এ সংসারে সৃষ্টি নব নব।
হে ভাস্বর সঞ্জীবনী তোমার কবিতা,
প্রাণলোকে আলো তুমি, সুন্দর সবিতা।

দুর্যোগের ঘনঘটা ঘনাইয়া আসে
ভাগ্যহত ভারতের আকাশে বাতাসে।
ভেঙে পড়ে সভ্যতার বিরাট্ প্রাসাদ,
বিচূর্ণ শিক্ষা ও শিল্প, সাধনা ও সাধ,
ধূমাচ্ছন্ন নভস্তল। কে আলো দেখাবে?
কে করিবে পথ প্রদর্শন? কে শিখাবে
অগ্নিমন্ত্র? কার বাণী বল দেবে বুকে?
কার পানে চাহি আজ দুঃখে আর সুখে?

যার চেয়ে সত্য, শ্রেয়, প্রিয় কেহ নাই,
সে মানুষ। অমৃতের পুত্র সে যে তাই,
সে মানবধর্ম তুমি করিলে প্রচার।
নৈরাশ্যের মাঝে করি আশার সঞ্চার
অন্তর ছাপিয়া আর জগৎ প্লাবিয়া
করুণার গান তুমি বেড়ালে গাহিয়া।
পূজামন্ত্রে তব—নরনারী মাঝে জাগে
নিদ্রিত সে নারায়ণ, নবারুণ রাগে
দীপ্ত প্রাণ, জেগে ওঠে সত্য ও সুন্দর
জাগে শিব, পরিপূর্ণ—আনন্দ-অন্তর।

মনে পড়ে সেদিনের অস্ফুট কৈশোরে
অর্ধ-জাগরণে আর অর্ধ-স্বপ্নঘোরে

তোমারে লভিয়া হইলাম আত্মহারা,
অন্তরে সহস্র তন্ত্রী সুরে দিল সাড়া।
প্রিয়জন হতে মোর হলে তুমি প্রিয়,
একান্ত আপন হ'লে আত্মার আত্মীয়।

তুমি এলে আকস্মিক বিস্ময়ের মত
আমাদের মাঝে। উড়ে গেল ইতস্তত
ঝরা পাতা। বহিল দক্ষিণা। ফুলে ফুলে
ভরে গেল কানন-কান্তার। কূলে কূলে
ভরা নদী ছুটে চলে সাগরের পানে
উল্লসিয়া হৃদিতট উচ্ছ্বসিত গানে।

বঙ্গের অঙ্গনে হ'লা বিশ্ব উপস্থিত
সুরের সভায়। শ্রান্ত জীবন সম্বিৎ
ফিরে এল। মিটে গেল সকল অভাব।
কোন দেবতার আজি হ'ল আবির্ভাব?
পূর্ণিমা ফুরায়ে যায়। বিষণ্ণ অন্তর
নত দৃষ্টি, নিষ্পলক, পাণ্ডুর অধর
ক্লান্ত চাঁদ চেয়ে থাকে ধরণীর পানে—
বিলুণ্ঠিতা বাক্যহারা ধূলির শয়ানে।

সভাভঙ্গ হয়ে গেছে। নিরুৎসব ধরা।
তপোহীন তপোবনে আসে না অপ্সরা।
জাগো রবি! নিবে গেল পূর্ণিমার শশী।

জাগো রবি, অস্তাচলবাসিনী ঊর্বশী
অস্ত গেছে ফিরিবে না আর। জাগো রবি,
অন্ধকারে বিলুপ্ত পৃথিবী। ~~জাগো রবি।~~
খোল আঁখি, কথা কও, হে আমার কবি।

মেল আঁখি, মানসে যে মুদিল কমল।
মেল আঁখি, চেয়ে দেখ কত যে দুর্বল
মোরা, আজ কত নিঃস্ব, কত নিঃসহায়,
বিক্ষুব্ধ হৃদয় কাঁদে দুঃসহ ব্যথায়।
জাগো, জাগো, জাগো, রবি, জীবনের জয়
গাও পুনর্বার। দাও বল হে নির্ভয়,
জাগো—নব প্রেরণায় জাগাও জাতিরে।
জাগো রবি! এস ফিরে এ শূন্য মন্দিরে।

তোমারে হারাতে পারি? শুধু এ সান্ত্বনা
রচয়িতা আছে সেথা যেথায় রচনা।
হৃদয়ের অফুরন্ত উৎসের ধারায়—
বাজে সুর চন্দ্রে সূর্যে তারায় তারায়,
তৃণে তৃণে পত্রে পুষ্পে কম-কিশলয়ে,
বিক্ষুব্ধ ঝটিকাবর্তে, মধুর মলয়ে,
তটিনীর কলনাদে, সিন্ধুর ক্রন্দনে,
জনারণ্যে, অন্তরের নিভৃত নির্জনে
বাজে ছন্দে অন্তহীন আনন্দের গান।
নেবে না, নেবে না আলো, রবি অনির্বাণ।

হে অম্লান জ্যোতির্ময়, হে চির সুন্দর,
তোমার সৃষ্টির মাঝে তুমি যে অমর।
সৌন্দর্যের, আলোকের, আনন্দের কবি
মনের আলোকে দীপ্ত চিরন্তন রবি।

সারনাথ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাণসী হতে দূর নয়
সারনাথে কতিপয়
সারঙ্গের দল
পেয়েছে আশ্রয়স্থল।
চারিপাশে তার
উঠেছে প্রাকার
হিংস্র প্রাণী যদি আসে হানা দিতে
তাহারে রোধিতে।

কত কাল আগে
হিমালয় প্রান্তভাগে
জন্মেছিল রাজকুলে রাজার কুমার।
জীবনের পাত্রখানি তাঁর
ভরা ছিল সব সুখে ;
জননীর বুকে
প্রবাহিত ছিল স্নেহধারা,
পিতার সম্পদ তাঁর ছিল সীমাহারা,
বধূ ছিল নব পরিণীতা '
রূপে অনিন্দিতা।
তবু তাঁর বসিল না মন,
অনুক্ষণ
মানবের জীবনের শত দুঃখভার

স্পর্শিল হৃদয় তার,
করুণায় বিগলিত হিয়া
ভাবিয়া ভাবিয়া
করিলেন পণ—
মানবের মুক্তি লাগি কবিব সাধন।
পিতার সম্পদ তাঁরে নাবিল বাখিতে
প্রিয়া তাঁরে নারিল বাঁধিতে,
সব ডোর ছিন্ন করি
রজনীর অন্ধকারে নিজেরে আবরি
ত্যজিল সংসার
লাগি সাধনাব।

তারপর দীর্ঘ বর্ষ কত
হল গত,
তপস্যার ক্লেশে দিন দিন
তনু হল ক্ষীণ।
অবশেষে একদিন মিলিল সন্ধান তাঁর
প্রজ্ঞার সীমার ;
যে প্রশান্তি অশান্তির ঘটায় বিলয
লভিলেন তার পরিচয।
জানিলেন সেই ধর্ম সার
যা করে প্রচার
হিংসা হতে মন মুক্ত করি
হৃদয়ে করুণা ভরি
সর্ব জীবে ভালবাসা।
শুনি সে নূতন ভাষা
সেদিন ভারতবাসী
শ্রদ্ধাভরে আসি

জানাইল তাঁহারে প্রণাম
দিয়া বুদ্ধ নাম।
সে ধর্ম প্রচার লাগি
উপযুক্ত স্থান মাগি
পার হয়ে 'অসি'
প্রভু আসিলেন বারাণসী।

তাহার উত্তরে
সারঙ্গের নিরাপদ বিচরণ তরে
করুণায় বিগলিত হিয়া
রেখেছে রচিয়া
কাশীরাজ শান্তিময় ধাম
মৃগদাব নাম।
সেই স্নিগ্ধ পরিবেশখানি
মনোরম মানি
সারঙ্গ দলের মাঝে হয়ে সারঙ্গের পতি
প্রভু করিলেন মতি
লইবেন ঠাঁই ;
সারনাথ নাম হল তাই।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পরে
সে কাহিনী স্মরে
রচিল ভারতবাসী নব মৃগধাম
জন্মদিনে তাঁর পদে জানাতে প্রণাম।

এইখানে দাঁড়াইলে হয়
স্মরণে উদয়,
এই সেই পুণ্য ভূমি যেথায় প্রথম
অমৃত নিস্যন্দ সম

প্রচারিত হল সেই করুণার বাণী
হিংসার কলুষ হানি
যাহা বিশ্ববাসী জনে
বেঁধেছিল মরি'মরি প্রীতির বন্ধনে।
আজি বিংশ শতাব্দীর শেষে
সে বাণী গিয়াছে ভেসে
অকুল পাথারে কোন খানে
কেহ নাহি জানে।
হিংস্রার প্রেরণা
সর্বাত্মক ধ্বংস লাগি করিছে সাধনা।
অশান্তির উন্মাদনা ভরেছে আকাশ
বিদ্বেষ অনলে আজি কলুষিত বিশ্বের বাতাস।
মনে শঙ্কা মানি,
নিজের কল্যাণ বুঝি নিজ করে হানি
আপন বিলয
বিশ্ববাসী ঘটাবে নিশ্চয
তাই ভাবি মনে
এই উপবনে
শান্তির যে গীত
তথাগত কণ্ঠ হতে হইল নিঃসৃত,
তা কি শুধু স্মৃতি হয়ে রবে
একান্ত নীরবে
মানবের মনে
সঙ্কটের এই সন্ধিক্ষণে?

বর্ষা বন্দনা

চারণকবি শ্রীহেমেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

আসিয়াছি বরষার বারিধারা গানে
ধরণীর শিশু হয়ে শ্রাবণের শেষ অবদানে।
নাহি জানি এই যত আসা যাওয়া মম
হয়েছি কি—আজিকার বরিষণ সম!
ফিরি ফিরি হেথা বারে বারে
ধরার কোলের পরে,
কে বলিতে পারে!
আজ, এ কি লীলা হেরিছে সকল আকাশব্যাপী।
দিক-দিগন্ত ছাপি'
ধেয়ে চলে ঐ যত শ্যাম মেঘদল।

কভু হাসে আলো-হাসি, কভু যে ঝরায় অশ্রুজল,
কভু সাথী মন্দগতি যাত্রী বলাকার
কভু তারা ভবনময়ুরদত্ত নৃত্য উপহার
করিয়া গ্রহণ—কেকার সঙ্গীতে
ধীরে ধীরে চলি যায়,
মৃদঙ্গের তাল দিতে দিতে।

ওই মেঘদল,
ক্ষণে ক্ষণে যবে করে বরিষণ গান
তাদেরে যে চিনি লয় আমারি পরান।
তারা যে গো জনমদিনের মোর সাথী—
তারা মোর আপন স্বজাতি।

ওই যত নামহীন মরুজয়ী সেনা।
গানে গানে দানে দানে
শুধি' যায় ধরণীর দেনা।
ক্ষণিক জীবনমাঝে ধরিত্রীরে করি ভরপুর।
কণ্ঠে ভরা তাই বুঝি নিত্য নব সুর।
তাই তারা পৃথিবীর চির মুসাফির
চলিবার পথখানি যাহাদের নীড়।
মোর পানে তারা যেন কানে কানে কয়
আমার তরেও নহে ঘরের আশ্রয়॥

তাই বুঝি তাদেরি মতন এক কবি সেনা আমি
সুদূর করেছে মোরে চিরপথগামী
কণ্ঠে মোর ভরি ভরি করিয়াছে দান
পথচারী চারণের গান।
আজি ওই আকাশের পান্থ বন্ধুদল
সঙ্গীতে সঙ্গীতে ধায় ঝরাইয়া সকল সম্বল
সর্বপুঁজি রিক্ত করি শূন্য ভরি হাসে
তার পরে আপনারে ভাসায় বাতাসে॥

———
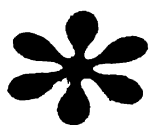
গামবুট

শ্রীমনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত)

রবিবাসরেতে এসে যোগ দেওয়া বড়ো দায়,
কলকাতা ছেড়ে দিয়ে যাওয়া ভালো বরোদায়।

ট্রাম বাস সহযোগে দেহটাকে নড়াবার
উপায়টা ক্রমশই তিরোহিত ; নড়া ভার!

বেলগেছে রুটটার তুটো পথই আছে ঠিক
ট্রাম ডিপোটার-ই শুধু অবস্থা প্যাথেটিক!

ত্বশো গজ পথটুকু ডিপোটার সম্মুখ
জুড়ে আছে নিষেধের 'হাঁ' করিয়া যম মুখ।

ডিপোটার তুই গেট জোড়া হাঁ-র বিস্তার
ট্রাম বাস যেতে গেলে নাহি পায় নিস্তার।

খোলা ড্রেন থেকে নিচু ওই টুকু ভাঙা পথ
বাদ বাকি রুটটার আর সবই ডাঙা পথ।

খোলা ড্রেন উপছানো বদ্ ঘ্রাণে জ্বলে নাক
ট্রাম-ট্র্যাক প্লাবি বয় 'নরময়' পচা পাঁক।

যার ফলে 'ট্রাম বন্ধ' লেগে রয় বারো মাস
বাড়ে শুধু পচা জলে আরো মশা, আরো ডাঁশ।

জল যদি জমে শুধু চার-আঙুল ছ'আঙুল
কুকুরেরা অবহেলে পার হয় সলাঙুল

মোটামুটি শুকনোই চলে যায় ভ্যাং ভ্যাং,
করে নাকো ভ্রূক্ষেপ নোংরাতে ভেজে ঠ্যাং।

বাবুদের বেলা তাতে অসুবিধা কী যে, হায়!
পা ত্বখানি ডোবালেই জুতো জোড়া ভিজে যায়।

লভিয়া অভিজ্ঞতা বার বার ক'বারের
কিনে ফ্যালে গামবুট তৈরী সে রবারের।

বার কোরে কুড়ি টাকা—মানিব্যাগ করে ফাঁক
পচা জল পার হয়, হাতে টিপে ধোরে নাক।

"আহাহা! তাইতো!" ব'লে কিছু দেশ সেবাইৎ
করুণায় গলে গিয়ে করে জনসেবা, হিত—

টেরিলিন শার্টে টাই, আর ক্রীজলেস স্যুট
নিখুঁত সাহেবী সাজে পায়ে পোরে গামবুট -

বারেক মোটরে গিয়ে বস্তী মহল্লায়
দূর থেকে দ্যাখে লোকে গেছে কত গোল্লায়

খোলা ড্রেন উপচানো বীভৎস বর্ষায়
ভাসা চৌকিতে ব'সে বিলীফের ভরসায়।

বর্জ্জন ও গ্রহণের দুই হাঁড়ি একাকার
ভেসে ভেসে ঠোকাঠুকি! চোখ মেলে দ্যাখা ভার।

কাছাকাছি যেতে গেলে গামবুটে ঢুকে জল
বাদ সাধে শৌখিনী দেশসেবাতে কেবল।

গামবুটে পা বাঁচায়ে যে-টুকুন হয় ঢের.
গাড়ি ঘুরে চলে যায় আপন আলয় ফের।

দেশহিতে, সেবাব্রতে বুঝি নাকো কে যে কম।
বর্ষাতে খোলা ট্রাকে চালানের ভেজে গম।

একে একে সমাপিত গোটা তিন যোজনাই
এত শত বুঝিয়াছ, এটুকু কি বোঝ নাই?

গামবুটে হবে না কো, ফিশিং বুট-ও নয়
ডুবুরীর সাজ চাই, একটা বা দুটো নয়

কয়েক লাখই চাই—এবং লাইফ বেল্ট—
ভেবে মাথা জ্বলে উঠে, পোড়ে কি হ্যাটের ফেল্ট?

ত্র-হিসেব কলকাতা-সমস্যা মেটাবার;
--সারা বাংলার বেলা হবে মাথা হেঁট আবার!

এখানে তো এইটুকু! হোথায় গ্রামের হাল
কী বিষম! দ্যাখো গিয়ে! ডুবেছে ঘরের চাল!
দেখবে না কিছু আর একাকার জল বৈ!
অথৈ অগাধ জলে চারিদিক থৈ থৈ!
নদী গ্রাসে মাঠ দীঘি পাইকারী বন্যায়
পশু-পাখী-মানুষের কত প্রাণ পণ নেয়!
ভিজ্‌ছে গাছের ডালে স্বামী-হারা বৌ কার!
কোনো দিকে দ্যাখা নাই একখানা নৌকার!
আঁকড়ে গাছের ডাল দিনে দ্যাখে রোজ ভূত!
কত ক্রোশ দূরে? কোথা পাকা বাড়ি মজবুত?
দৈবে যদিও কেহ করে তাকে উদ্ধার—
উঁচু কোনো আশ্রয়ে,—কেবা দেবে ক্ষুদ ধার?
কারো ভেসে গ্যাছে গোরু, ভেসে গ্যাছে ছেলে-বৌ
কোথা গ্যালো স্বামী-পুৎ? কাঁদে হোথা জেলে বৌ!
খবরের কাগজের রিপোর্টার ফোটো নেয়
মোটা টাকা কবুলিয়ে ভাড়া-খাটা বোট-ও নেয়।
ওরা ভাবে রিলীফের নৌকো সে এইটাই;
রিপোর্টার কাঁচুমাচু, বলে, "কিছু নেই ভাই!"
তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পলায়ন শ্রেয় তার
আফিসেতে ছবি আর বিবরণ 'দে-অ' তায়।
'মুভি'তেও ওঠে ছবি, শহরে 'রিলীজ' হয়
প্রমোদ-প্রেক্ষাগৃহে—দেখে 'দিল্' 'ঈজ' নয়!
ও-টুকু ক্ষণস্থায়ী; মূল ছবি শুরু হয়
নায়িকার হাবভাবে নাড়ি দুরু দুরু বয়!
'শো'-র শেষে লঘু মন; দুঃখের তাপ নেই
স্মৃতিপটে বন্যার বেদনার ছাপ নেই!
মনটা খুসিই আছে; ছবিটা হয়েছে বেশ!
বিবেকের দায়টুকু চ্যারিটি শো-এতে শেষ!
তোমার আমার বলো কী করার আছে আর?
করা তো হয়েই গেল আমাদের যা 'শেয়ার'!

—:—

কাঠ ও কবিতা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

এনেছি নিলামে কিছু মিছু কিনে পুরানো কাঠ
ঘুন ধরা আর উই ধরা দোর জানালা খাট।
নক্‌সা পালিশ জলুশ কিছুটা রয়েছে তার
নূতনে কিরূপ ছিল তার রূপ বুঝানো ভার।
কাজে লাগিবে না হবে না গড়ন সেই কাঠের
লেগেছে মজুর জ্বালানি করিতে সেই খাটের ॥
ভাবি মনে মনে কবে সে কাহার ভবনে হায়!
গড়েছিল কোন ছুতারে কত না যতনে তায়।
বয়স তাহার কত ছিল, তার মজুরি কত
ঘর সংসার ছিল কি তাহার মোদেরি মত?
ব্যয়ের বহরে আয়ের অঙ্কে কুলাতো কি তা?
ভাত কাপড়ের খরচ, বৌয়ের আলতা ফিতা?
ছুতারের কথা ছেড়েদি বাড়ীর মালিক যিনি
রুজি রোজগারে কত কিছু করেছিলেন তিনি।
কিন্তু কেমনে গেল খাট গেল জানালা দোর
পড়িল ছিঁড়িয়া বাড়ীর স্নেহের নাড়ীর ডোর।
ফুল তোলা খাটে কারুকার্যের কত না রূপ
কত না দিনের চিন্তা হেথায় হইত চুপ ॥
হয় তো বধূটী এসেছে পারায়ে গৃহের দ্বার
পেতেছে প্রথম মিলন শয্যা হেথাই তার।
এই খাটে শুয়ে কত না রজনী হয়েছে ভোর
অশিথিল বাহুবন্ধে বেঁধেছে প্রেমের ডোর।
ঘুণ ধরা খাটে হাড়ের ভিতরে লেগেছে দাগ
তরুণ তরুণী বক্ষ রাঙালো যে অনুরাগ ॥

আজি তারা নাই কেটে পলায়েছে মায়ার জাল
কি ছিল কাহিনী কবি জানে না কো বকেয়া হাল।
মেয়াদ ফুরালে ফুরালো স্বপন, ধরিত্রীর
নিভে গেল শিখা মাটির দেহের প্রদীপটীর।
কিন্তু কখন সে স্বপন হল কেমনে শেষ
কেমনে নীরব হল সে গানের সুরের রেশ ?
অসুখে মৃত্যু কিম্বা বিসুখে দেনার দায় ?
বিকালো নিলামে শয্যা ও সাজসজ্জা হায় !
রূপসী তরুণী হল তোবড়ানো জরতী বুড়ি
হাঁটি হাঁটি করে লাঠি ধরে হাঁটে সে থুৎ থুড়ি।
তেমনি হইবে সেগুনের গুণ আগুনে ছাই
জ্বলে পুড়ে যাবে কাব সারকুঁড়ে কে জানে ভাই !

সহসা নিরখি নিঃশ্বাস ফেলে, লিখেছি যত
কাব্য কবিতা সবই তাবা এই কাঠেরি মত।
খাতা হতে বই ছাপা হযতো বা ছিঁড়িয়া পরে
কাহার ঘরণী পোড়াবে সে পাতা এমনি করে !
তাহার ছেলের হুধ গরমের জ্বালানি হবে
তাহা দেখিবারে কবি কি তখনো বাঁচিয়া রবে ?
খাট চৌকাঠ কেটে কুটে হয শতেক খান
দৈব বিগুণে সকলেরি গুণ হারায় মান।
কবি কল্পনা ঝর্ণা কলমে কাটিল দাগ
বাসন্তী রঙ্‌ গুলিযা গুলালে খেলিল ফাগ।
সে-রঙ্‌ সে-ফাগ হুদিনের দাগ হুদিন পরে
পোড়া কাঠ আর মরা পাতা সম যাবে সে ঝরে ॥

পৌরাণিক ছবি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আকাশের আড়ম্বরে হেরিলাম পৌরাণিক ছবি।
মেঘদল চলিয়াছে সুসজ্জিত বাহিনীর মত
বীরগর্বে বহি চলে দলে দলে সুকৃষ্ণ কেতন।

দিগন্তের প্রান্তে কার তীব্রদ্যুতি আরক্ত নয়ন,
চণ্ডিকার খড়্গ সম মুহুর্মুহ বিদ্যুৎ-উদ্ভাস,
ঝঞ্ঝার হুঙ্কারে কাঁপে টলমল কম্পিত ভুবন।

ছিন্নভিন্ন মেঘরাশি পলায়ন উদ্যত অধীর,
শোনিত-কর্দমলিপ্ত রণক্ষেত্র গগন-প্রাঙ্গণ।

বিভূতি-ভূষণ-স্মরণে

দেড়কড়ি শর্ম্মা

সৃষ্টির প্রথম হতে বিচিত্র কালের গতি
বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে
মানব-ললাট পরে মৃত্যুর দেবতা ঐ
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হানে।

মহাকাল মহোৎসাহে খেলা করে নিরন্তর
মানবের অদৃষ্টের সনে—
সাগরের বেলা-ভূমে বালুকার পুত্তলিকা
ভাঙে গড়ে আপনার মনে।

এরি নাম কর্ম্মফল, এরি নাম লীলাখেলা,
এরি নাম মঙ্গল-বিধান,
এরি নাম ঐশী শক্তি, মানস-মোহিনী মায়া,
অচিন্ত্য, অব্যক্ত ভগবান্!

এরি ফলে কত ঘরে হরিষে বিষাদ হেরি,
আনন্দের কল-কোলাহল
মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনের কলরোলে রূপায়িত—
অমৃত হইল হলাহল।

এরি ফলে কত শত মনের মাধুরী-ভরা
শান্তি-পূর্ণ সাজানো সংসার
কালের নির্ম্মম হস্তে অজানিতে হয়ে গেল
মরুভূমি—শুষ্ক ছারখার!

উৎসব-প্রাঙ্গণে তাই হের ঐ জ্বলিতেছে
চিতাগ্নির·লেলিহান শিখা—
চির তরে স্তব্ধ হোলো কত না মধুর বাণী,
নিভে গেল কত না বর্তিকা।

এই ভাবে চলে গেল মোদের আপন জন—
ভারতীর পরম সাধক—
'পথের পাঁচালি' গেযে জীবনের রাজপথে
অর্ধপথে মিলালো আলোক।

জীবনের জয-গানে উৎসাহ-মুখর তাঁর
সুধা-কণ্ঠ ছিল ভরপুব—
তাই তো লেখনী তাঁর আঁকিযাছে কত শত
জীবনের বিচিত্রিত সুর।

বিভূতি-ভূষণ ছিল আমাদের সবাকার
অতি প্রিয পবিচিত জন—
তাঁহার মধুর স্মৃতি ভবিয়া রাখিবে চির
বঙ্গবাসি-জনগণ-মন।

অনির্বচনীয়

দিব্যেন্দু লাহা

বিস্মৃতির তীর ঘেঁষা আসন্ন সন্ধ্যায়, মনে হয়
পারি না ভুলিতে স্মৃতি, জাগে সে যে পরম বিস্ময় !
মধুমাখা দুই বাহু প্রসারিয়া রেখেছে জড়ায়ে
রঞ্জিত করেছে পথ সে বর্ণালী কুসুম ছড়াযে ;
মুগ্ধ দুটি নেত্রে মোর পরাযেছে অঞ্জন অক্ষয়
ভেঁঙেছে ঘুমের ঘোর ঘুচিযাছে সকল সংশয় ।
হেরেছি তাহাবে আমি চাঁদ-গলা পূর্ণিমার রাতে
নিবিড় আঁধাব মাঝে দাঁড়াযে সে প্রীতি দীপ হাতে !
বুলায পরশ তাব মৃদু মন্দ বসন্ত সমীরে
স্পন্দিত নূতন সুর শুনায সে মন্দকিনী তীরে ।
জীবনে জোযার আসে উষ্ণ স্পর্শে ছন্দে লাগে দোল
অঙ্গে অঙ্গে, রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, খেলে যায তড়িত হিল্লোল
মদালসে মত্ত হৃদি, পেযেছি যে অমৃত-আস্বাদ
ঢেলেছে লাবণ্য প্রাণে সুধামাখা সুদূরের চাঁদ ।
পারিনি বুঝিতে আজো, বিপুলের রহস্য গভীর
আছ তুমি, সমীরণ বযে আনে স্পর্শ সুরভির ।
আত্মায় সত্তায় ঘিরে সুষমায আজো স্মরণীয
মধু হতে মধুময় প্রেম, সে যে অনির্বচনীয ।

কোকিল

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

কোকিলটা ডেকে চলে
দূর থেকে কাছে, আরো কাছে—
বসন্ত যে চলে যায়
খর রৌদ্রালোক
দগ্ধকায় নীল ঘুম
অষ্টাদশী বাসন্তী শরীর
মৃদুস্বর গুনগুন মৌমাছির মন,
সীমান্তের পরপারে বসন্ত যৌবন।

সময়কে পিছে রেখে পাণ্ডুর ললাট—
পাতা ঝরে
গ্রীষ্ম তাপ
মাটি হাহাকার !
প্রার্থনা আমার—
কোকিলের ডাক
থাক,
আহা থাক
ইন্দ্রজাল বরে—
বাড়িঘর, গাছপালা,
নীল ঘুম
তোমার নয়নে
বসন্তের চেতনা আবেশে
আহা থাক,
কোকিলের সুর ভালোবেসে ॥

—:—

ভালবাসি আমি এই ধরণীর ধূলি

কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শাস্ত্র মানিছে ঊর্ধ্বে স্বর্গলোক
আমি জানি সেথা আছে যত কিছু শোক
যা আছে সেথায় থাকুক মাথার পরে
আমার চেতনা আমারে যেন না হরে।

ছিল কিনা সেথা আমাব অবাধ গতি
ভাবিযা দেখেছি স্থির করি মোর মতি
সাড়াটি পাইনি অবোধ মনের দ্বারে
দেবতা থাকুন প্রণাম জানাই তাঁরে।

আমার স্বর্গে আমিই দেবতা আছি
একথা সত্য মনে মনে আঁচিযাছি
লোকে বলে ওরে, মিথ্যাবে করি ডর
ত্রিদিবের পানে ঊর্ধ্ব নযন কব।

যা কিছু তোমার দেনা পাওনার শেষে
কষে মেজে ধর স্বর্গেব দ্বারদেশে
হযতো তোমার মিলিবে স্বর্গে ঠাঁই
নয়তো তোমার সেথায জাযগা নাই।

আমি বলি কেন মিথ্যারে করি জয
সত্যের পথে চলিতে রে তোব ভয
মিথ্যা থাকুক মিথ্যারে লযে সুখে
অমর মানুষ কেন রে মরিস দুখে।

এই ধরণীর যা কিছু পেয়েছি আমি
যা কিছু দেখেছি সম্মুখে দিবা যামি
তাহাই স্বর্গ সুন্দর মোর কাছে
অনাদি কালের দেবতা হেথায় আছে।

ঊর্ধ্ব গগনে দেখেছি আলোর খেলা
শুনেছি ভোরের বিহগ কণ্ঠ মেলা
আবতির সুরে ভরেছে হৃদয় মন
যেন কার সর্ব অযাচিত আয়োজন।

বৈশাখে আমি দেখেছি দাঁড়ায়ে দূরে
ঘন কুন্তল ছড়ায়ে আকাশ পুরে
বিজলী আঁখির ইশারায় কেবা ডাকে
গুরু গম্ভীর জলদ মেঘের ফাঁকে।

শ্রাবণ সন্ধ্যা যখন ঘনায়ে আসে
নূপুর চরণে কে যেন ঘুরায় পাশে
চুপি চুপি আসি কে না গাথা গায়,
উদাস নয়নে শুধু চেয়ে থাকি হায়।

ভাদ্রের দিনের বর্ষণ যবে কাটে
ছেঁড়া ছেঁড়া নব শুভ্র মেঘের হাটে
সোনালী রোদের কণা যখন পড়ে
চিত্তের মাঝে কতই স্বপন গড়ে।

কার্ত্তিকে ভরে মাঠে মাঠে পাকা ধান
গ্রাম বাটে বাটে দোয়েল ফিঙের গান
মনের গহনে সে যে কি স্বর্গ সুখ
পেয়েছি আমি যে, ভরেছে আমার বুক।

ফালগুনে আমি দেখেছি ফুলের বনে
লজ্জা জড়ানো কার পদ ক্ষণে ক্ষণে
অপরাজিতার নীল রঙে রঙা শাড়ী
করবীর ডালে কে যেন রেখেছে ছাড়ি।

অশোকের শিরে অস্ত রবির ছায়া
নয়নে আমার ঘনায় কতই মায়া
অবাক হইয়া যে ধারে ফিরিয়া চাই
সকলই স্বর্গ তুলনা ইহার নাই।

পল্লীর বুকে মাঠ পথে যবে চলি
কে যেন কানেতে চুপি চুপি চলে বলি
এইত স্বর্গ ইহারে প্রণাম কর
যা কিছু তোমার চরণে ইহার ধর।

অবাক হইযা শুধু চেয়ে থাকি আমি
ক্ষণিকে আমার পথ চলা যায় থামি
সত্যি যে কথা চোখের সামনে আঁকা
কেমনে তাহারে বলিব এসব ফাঁকা।

গণ্ডীবদ্ধ মানব আত্মা সব
ঊর্ধ্ব নয়নে খালি দেহি দেহি রব
যা কিছু পেয়েছ তাই লয়ে হও সুখী
বৃথা ক্রন্দনে কেন গো এমন দুখী।

শুধু যাহা ভালো যাহারে করিনি ভয়
সেইটুকু শুধু আমারে করিবে জয়
তাহার অমর বাণীটি মিশিযা রবে
চির সুন্দর এই এ বিপুল ভবে।

মাটিতে জনমি মাটিকে বেসেছি ভালো
মাটির স্বর্গে জ্বেলেছি মাটির আলো
মোর যাহা কিছু ফিরিয়াছি চিনে চিনে
রেখে যাব হেথা আমার যাবার দিনে।

সত্যরে আমি দেখেছি নয়ন তুলি
ভালবাসি তাই এই ধরণীর ধূলি।

—:—

এসেছে বৈশাখ

বিভা সরকার বি. এ.

জীবনেরে ডাক দেয়
এ নব বৈশাখ
'চরৈবেতি চরৈবেতি"
চলো ক্লান্তিহীন !

বৎসরের শেষ ঝড়ে
ঝরে যাওয়া পত্রপানে
শ্রান্তিহীন দুর্নিবার
চলো রাত্রিদিন ।

এ মন নদীর স্রোত
সঞ্জীবনী মন্ত্রে স্রোতস্বিনী,
শুধু চলে আগে চলে
শুনি কার দূর পদধ্বনি !

যখনি সে চলা থামে
থেমে যায় হৃদয়ের ধারা
হারায় সে নদী প্রাণ
ব্যর্থ পল গণি ।

একমাত্র লক্ষ্য যার
ছুটে চলা অনিবার
ঝঞ্ঝা ঝড়ে তুচ্ছ করি
চির রাত্রি দিন ।

বয়সে প্রবীণ তবু
আলস্য জাগেনা কভু
মরজন্মে জ্যোতিষ্মান
ধন্য সে প্রবীণ !

নব সূর্য ধারা স্নানে
যৌবনের জয় গানে
বরমাল্য নিয়ে এল
এ নব বৈশাখ ।

আকাশ ভৃঙ্গারে ভরি
অনন্তের সুধা
ভরাল বসুধা—
"চরৈবেতি" দিল এই ডাক !

তাণ্ডবের রূপধ্বনি
কাঁপায় রে থরহরি
রুদ্র শিষ্য
যে কাল বৈশাখী ।

গোপনে সে ধরে আনে
নব নবীনের গানে
অনাগত বসন্তের
মিলনের রাখি ।

অঙ্কুরে ধরণী জাগে
চির বরাভয় মাগে
হে রুদ্র তাণ্ডবে শেষে
সাজো উমাপতি !

বিপন্ন ধ্বংসের বুকে
আবার জাগুক সুখে
সহস্র অঙ্কুর বীজ
আশার আরতি।

তৃষিত মর্ত্যের প্রাণ
কর প্রাণধারা দান
দিগন্ত ভৃঙ্গারে ভরি
অনন্ত সে সুধা—।

চির প্রাণধারা দানে
শূন্যেরে জাগাও প্রাণে
রঙে রসে গন্ধে ভরি
সাজাও বসুধা।

"চরৈবেতি" মন্ত্র জানি
দীর্ণ শীর্ণ জীর্ণে হানি
আগে চলিবার ডাক
দিয়েছে বৈশাখ—।

পিঙ্গল, শ্যামলে ঢাকি
ধূসরে আল্পনা আঁকি
বসুন্ধরা মনোহরা
পূর্ণ হয়ে থাক।

———:———

আনন্দরূপ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বিকেলে হেলানো রোদ দেবদারু গাছের মাথায়
সুচারু পাতার ফাঁকে আলোড়িত ঝালর ঝোলায়—
ঘন কচি সবুজের বর্ণালীর ছুঁয়েছে দু'চোখ,
ছায়া ছায়া সারি গাছে অস্তিত্বের ঘোষণা চমক।

গোধূলি গোলাপী রঙে পশ্চিমের সীমিত আকাশ,
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে যত চাঞ্চল্যের অজস্র উচ্ছ্বাস;
বাতাসে গতির বেগ, পুকুরের জলে দেখি কত
অশ্রান্ত মসৃণ স্রোত—জীবনের রূপকারে রত।

মেঘ চলে, ঢেউ চলে, দিন চলে রাত্রির গভীরে;
আমরা জলের ধারে দু'চারটি ফড়িঙের ভিড়ে
নিজেদের মন রাখি,—তাদের ডানার জাফ্‌রানী
গাঢ় রঙ, আমাদের অবয়বে দু'চোখ ধাঁধানি।

জীবন জটিল তবু অনেকের কুটিল কলাপে!
ফড়িঙের জলসিঁড়ি ধাপে ধাপে ওড়ার বিলাপে
গোধূলির ফিকে রঙ, বাতাসের সুমসৃণ ঢেউ,
কিছু নয়; তবু তাতে আনন্দের সুর পাবে কেউ

Rabindra Thought

(Titbits)

Sudhangshu Mohan Bandopadhyaya

(যখন র'ব না আমি মর্ত্য কায়ায়...... . যেথা এই চৈত্রের শালবনে)

When I shall no longer be here
in my mortal frame
And you like to remember me and my name
Call not a meeting in commemoration
Come out in the open and hold a congregation
Where the shadow lengthens in the forest
under the Sal trees
And a Chaitra glory slowly creeps.

* * *

(তোমরা রচিলে যারে নানা অলঙ্কারে.........
কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙ্গিয়া হবে চুর ।)

The man you have built up and embellished
I do not know him nor does my inner being
That fame of name signed and sealed
Oversteps the Creator's limit
Who knows not, that it is transient
And will be smothered to pieces under the
wheels of time.

* * *

(প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল ....পেল না উত্তর ।)

The fiirst day's Sun had querried
At this novel manifestation of being
In the glory of the primeval morn
Adorned in dewy dawn
Who art thou ?
Unanswered it remained.
Years rolled and tolled, toiled and thundered.
The golden embers of the dying sun
Put this question once again
For the last time in the quite evening
Over the western seashore
Who art thou ? What is the know -how ?
It was the same
Nothing in reply came.

রবিবাসরের স্মৃতি

(সম্পাদক সন্তোষকুমার দে-কে লিখিত
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণ)

ওঁ

২৩, রজনী সেন রোড
কলিকাতা-২৬
৪.১১.৬৮

প্রীতিভাজনেষু,

ভাই সন্তোষ, তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। তুমি রবিবাসরের মানুষ, তারপর নামটিও সন্তোষ, উত্তরে-নিরুত্তরে দুই অবস্থাতেই আশা করি সমচিত্ত। তবু রবিবাসরের কথা যে ভাবে, যে লেখে, যে শোনে সে-ই পুণ্যবান। রবিবাসরের কথা ভাবতে গেলে মনে হয় যেন প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠের এক প্রান্তে একটিই মাত্র ডালপালা-মেলা ঘনপত্র গাছ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, আর তারই ধার ঘেঁসে বয়ে চলেছে একটি স্বাদুসলিলা স্বচ্ছ নদী। জায়গাটি যেন অনেক স্নিগ্ধতা ও হৃদ্যতা দিয়ে তৈরী। নদীটি যেন কোন অতীত স্মৃতির আশীর্বাদ দিয়ে ভরা। মনে হয়, সমস্ত মাঠের শূন্যতার দাহ পেরিয়ে এখানে এসে বসলে শুধু শান্তি পাব তা নয়, কৃততীর্থ হয়ে যাব।

ভাবতে অবাক লাগে, কোন একদিন, স্বপ্নময় অতীতে, আমাদের তিরিশ-গিরিশের বাড়িতে রবিবাসরের আসর বসেছিল। স্বয়ং তীর্থপতি জলধরদা* উপস্থিত ছিলেন—শস্য ফলাতে পারে অথচ আপাত-উষর কোন্ মাঠের উপরে সেই মেঘ না স্নেহবর্ষণ করেছে—আর তাঁকে ঘিরে আমরা সেকালের অতি আধুনিকেরা বসেছিলাম আপনজনের মত—প্রেমেন[১], প্রবোধ[২], মনোজ[৩], ভবানী[৪] আর হেম বাগচী।

---

* সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন।

১ প্রেমেন্দ্র মিত্র, ২ প্রবোধকুমার সান্যাল, ৩ মনোজ বসু, ৪ ভবানী মুখোপাধ্যায়।

"পুরোনো সে দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়—
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায় ?"

ভাবতে অবাক লাগে, প্রফুল্ল সরকার[1] কি করে আমাদের সঙ্গে পরিহাস-সরস বন্ধুতার সমতলে এসে বসতেন অন্তরঙ্গ হয়ে। তখন বুঝিনি, তাঁর সেই অনহংকারের মাধুর্য তাঁর বৈষ্ণবতারই স্বাদ-সুবাস। আর নরেনদা[2] —তখনো যেমন ছিলেন আজও তেমনি সুন্দর আছেন। ভাবতে অবাক লাগে, তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে, এই দগ্ধ তিক্ত লবণাক্ত সংসারে, এক জনও শত্রু করতে পারলেন না, চিরকাল সকলের শুধু গুণ দর্শন করে গেলেন ? মনে হয় তিনিই যেন আরেক রবিবাসর—যে বাসরে খালি দীপ্তি, খালি আনন্দ, খালি সৌহার্দ্য সঞ্চয়।

মনে পড়ে শৈলেন্দ্রকৃষ্ণকে[3] —যিনি প্রতি সভার প্রারম্ভেই একটি অদীর্ঘ অনবদ্য কবিতা পড়তেন। তাঁর সেই মধুবর্ষী পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ এখনো যেন কানে লেগে আছে। মনে পড়ে আরো এক কবিকে, যিনি আসতেন অথচ প্রায়ই কিছু পড়তেন না, সবার পিছনে দেয়ালের দিকে বসে নিঃশব্দে অনন্ত আনন্দে শুধু হাসতেন—আমাদের সেই আরেক হেমেনদা, হেমেন্দ্র লাল রায়কে। কালিঘাটের সেই সদানন্দ স্বাস্থ্যবান বন্ধু নিধিরাজ হালদারকে ভুলতে পারছি না, যার বাড়িতে বারে বারেই আসর বসানোর জন্যে আমরা বিশেষ উৎসাহ দেখাতাম, যেহেতু সে প্রচুর মাংস খাওয়াত। যদিও সেটা শ্লোগানের যুগ নয়, তবু আমরা বব তুলতাম—নিধিরাজের মাংস চাই, আর তাতে নিধিরাজের কী আনন্দ !

চারুচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি দত্তকে মনে পড়ে, মনে পড়ে শিল্পী যোগেশ রায়কে, আরেক শিল্পী যিনি পূর্ণকে পূর্ণ করতেন অর্থাৎ পূর্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গী হয়ে আসতেন সেই হাস্যময় ফণী গুপ্তকে—ছবির

---

১ আনন্দবাজার পত্রিকা-সম্পাদক স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার, ২ কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, ৩ স্বর্গত কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

উপর যাঁর স্বাক্ষরের বিশেষ ভঙ্গিটি এখনো তাঁর হাসির রেখাটির মতই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কী জাতুমন্ত্রে বাংলা দেশে একটা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান এত দীর্ঘকাল ধরে শুধু বাঁচতে নয়, প্রাণময় থাকতে পারে, সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার। রহস্য আর কিছুই নয়, এ বৈঠকের কোন পরিচালক কমিটি নেই, কোন লিখিত বিধি-বিধান নেই, কারু একনায়কত্ব বা কোন দলের প্রভুত্ব নেই—এ বৈঠকে শুধু প্রীতির বসতি—সাহিত্যের প্রীতি, সাহিত্যিকের প্রীতি—আর সেই প্রীতিই এমন বস্তু যার কোন ইতি হয়না।

ইতি—

তোমাদের অচিন্ত্যকুমার

স্বর্গত জলধর সেন

(সংক্ষিপ্ত জীবন কথা)

নরেন্দ্রনাথ বসু

১২৬৬ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৬০) ১লা চৈত্র কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী কুমারখালি গ্রামে কায়স্থ-পরিবারে জলধর জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের তিন বৎসর পরে পিতা হলধরের মৃত্যু ঘটে। এই সময় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বয়স ৫ বৎসর ও অনুজ শশধরেব বয়স ৬ মাস মাত্র। প্রথমে জ্যেষ্ঠতাত ও পবে তদীয় পুত্র তাঁহাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বাল্যজীবন অতিশয় দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়।

পাঠারম্ভ—কুমারখালি বাংলা স্কুলে কাঙাল হরিনাথের নিকট। ১৮৭৫ খ্রীঃ গোয়ালন্দ মাইনর স্কুল হইতে মাইনর পাশ ও ৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ। এই বৎসরেই ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাওয়ায় একটী রৌপ্যপদক পান। ১৮৭৮ খ্রীঃ কুমারখালি ইংরেজী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ ও ১০৲ টাকা বৃত্তি লাভ। ১৮৮০ খ্রীঃ জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু প্রবল জ্বরে পরীক্ষায় অনুপস্থিত হওয়ায় অকৃতকার্য হন।

অর্থাভাবের দরুণ অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া তরুণাবস্থায় গোয়ালন্দ ইংরেজী স্কুলে ৩য় শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ। ছয় সাত বৎসর এই চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন। এই চাকুরী করিবার সময় ১৮৮৩ খ্রীঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের প্রপৌত্রীর সহিত বিবাহ। ১৮৮৫ খ্রীঃ (বৈশাখ ১২৯৩) পত্নীবিয়োগ, অতঃপর এক মাস পরেই মাতৃবিয়োগ।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশধর বি. এ. পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে চাকুরী পাইলে শোকবিহ্বল জলধর নিজেকে বন্ধনমুক্ত মনে করিয়া ১২৯৬ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে (১৮৮৮ খ্রীঃ) প্রবাসযাত্রা করেন। প্রথমে দেরাদুনে গিয়া শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৮৯০ খ্রীঃ ৫ই মে হিমালয়যাত্রা শুরু হয়। বৈরাগীর বেশে নানা তীর্থ ও দুর্গম স্থান পর্যটনে বহুদিন কাটাইয়া দেন।

১৮৯৩ খ্রীঃ হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন এবং মহিষাদল-রাজ-স্কুলের ও মহারাজকুমারদ্বয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। মহিষাদলে ১৮৯৪ খ্রীঃ ডায়মণ্ডহারবারের রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। ১৮৯। খ্রীঃ তাঁহাদের প্রথম পুত্র অজয়ের জন্ম হয়। মহিষাদলে ৫ বৎসর কাটাইয়া কলিকাতায় আগমন ও সংবাদপত্র ও সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

অল্প বয়স হইতেই বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের প্রতিষ্ঠিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামক সংবাদপত্রে তাঁহার সাহিত্যচর্চার হাতে-খড়ি। মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি 'দুঃখিনী' নামক উপন্যাস রচনা করেন। ইহাই জলধর-রচিত প্রথম পুস্তক।

'গ্রামবার্তা' ও 'সোমপ্রকাশে' নিয়মিত তিনি লিখিতেন। গোয়ালন্দে শিক্ষকতা কার্যে রত থাকিবার সময় কাঙ্গাল হরিনাথ অসুস্থ হইয়া পড়ায় এক বৎসরকাল গ্রামবার্তার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। মহিষাদলে শিক্ষকতা করিবার সময় হিমালয় ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। সেই সময় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায়ও ভ্রমণবৃত্তান্ত ও ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন।

সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শানুযায়ী মহিষাদলের চাকুরী ছাড়িয়া আসিয়া

'বঙ্গবাসীর' সরকারী সম্পাদক হন এবং ছয় মাস কার্য করেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ 'বসুমতী'র সহকারী সম্পাদকের কার্য গ্রহণ করিবার অল্পকাল পরেই ঐ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৮৯৯ । সুদীর্ঘকাল ইনি 'বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। পরে কাব্যবিশারদের মৃত্যু হইলে 'হিতবাদী'র সম্পাদকীয় বিভাগের কার্য গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল পরে উক্ত পত্রের সম্পাদক হন (১৯০৮ জানুয়ারী)। দুই বৎসর পরে 'হিতবাদী'র সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিয়া সন্তোষের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষকরূপে তাঁহাদের দেশে গমন করেন। শেষে ঐ জমিদার ষ্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ২ বৎসর সেখানে কাটাইয়া ম্যালেরিয়ায় বিশেষভাবে পীড়িত হইয়া পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত 'সুলভ সমাচার' পত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিন মাস পরে উক্ত পত্রের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হইলে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন (১৯১১)।

১৩২০ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন।

ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপন্যাস, ছোট গল্প ইত্যাদিতে তাহার রচিত পুস্তকের সংখ্যা ৬০ খানিরও অধিক। তন্মধ্যে প্রবাসচিত্র, হিমালয়, নৈবেদ্য, দুঃখিনী, বিশুদাদা, অভাগিনী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকখানি শিশুপাঠ্য এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। অর্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার অসংখ্য লেখা বাহির হইয়াছে।

১৩২৯-১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সরকারী সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে ১৩৩১ বঙ্গাব্দে এবং প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের ইন্দোর অধিবেশনে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-শাখার সভাপতি হন।

বহু সাহিত্য-সভার সহিত তাঁহার বিশেষ সংস্রব ছিল। রবি-বাসরের তিনি সর্বাধ্যক্ষ এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৩২৩ হইতে ১৩৭১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত হাওড়ায় গোবর্ধন-সাহিত্য ও সঙ্গীত-সমাজের সভাপতিত্ব করেন।

বহু প্রতিষ্ঠান হইতে জলধরবাবুকে সংবর্ধিত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র রবিবাসর (সভাপতি, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এবং নিখিল-বঙ্গ-জলধর সম্বর্ধনা সমিতি কর্তৃক সংবর্ধনা (সভাপতি ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজ সরকার হইতে তিনি [illegible] বঙ্গাব্দে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান। দেশবাসীর নিকট হইতে তিনি যে 'দাদা' উপাধি লাভ করেন সেই গৌরবময় উপাধিলাভ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

১৩৭১ বঙ্গাব্দের ৮ই মাঘ দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং অল্পকাল পরেই ৭৯ বৎসর বয়সে ১৬ই চৈত্র রবিবার বেলা তিন ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ বাসাবাটিতে তিনি পরলোক গমন করেন।

—[illegible]পত্র, চৈত্র, ১৩৪৭

অভিযোগ

আশাপূর্ণা দেবী

অভিজাত বিপণি নয়, ফুটপাথে চট পেতে পাতিয়ে বসা স্বল্পক্ষণ-স্থায়ী তুচ্ছ দোকান। তবু রকমারি মনোহারীর বিচিত্র সমাবেশে অনেকগুলি মাথাকে টেনে এনে সেখানে ঝুঁকিয়ে ফেলেছে।

তা অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু এখানে মেলে।

যেমন চিরুনী, মাথার কাঁটা, সেফটিপিন, তালাচাবি, দুধের ছাঁকনি, মশারির ফিতে, বোতাম, সুতোর রিল, আরো এটা ওটা। তবে অপ্রয়োজনীয়ের সংখ্যাই বেশী।

কিন্তু অপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয়ের থেকে আকর্ষণীয় করে তোলার নামই তো ব্যবসার আর্ট। আর সে ব্যাপারে এই ফুটপাথের দোকানীরাও কম আর্টিষ্ট নয়। এ দোকানের দোকানী প্ল্যাষ্টিকের অজস্র সম্ভার ছাড়াও কাঁচ কাঠ লোহা পিতল টিন পুঁতি ইত্যাদিতে গড়া, মালা চুড়ি কানের ফুল পিন লকেট আংটি বোতামের সম্ভার এমন মোহনীয় করে সাজিয়ে রেখেছে যে, পথচলতে লোক অকারণেও একবার দাঁড়িয়ে না পড়ে পারবে না।

অবশ্য প্রধানতঃ মহিলাকুল। বস্তুর আকর্ষণের কাছে যাঁরা চিরশিশু। অস্বীকার করে লাভ নেই। দরকার না থাকলেও মনোহর দোকানের সামনে একবার দাঁড়িয়ে না পড়ে পারেন না তাঁরা। আর—রঙিন খেলনার দোকানের সামনে সহসা দাঁড়িয়ে-পড়া ঠাকুমা এবং নাতনীর চোখে কি একই আহ্লাদের আলো জ্বলে ওঠে না? শাড়ীর দোকানের সামনে দাঁড়ানো মা-মেয়ের চোখে একই প্রেমাকুল দীপ্তি?

আমার খানিকটা মশারির ফিতের দরকার ছিল, তাই ভিড় কমার অপেক্ষায় একটু দাঁড়িয়ে ছিলাম, কমার বদলে ভিড় বেড়েই গেল। বছর ছয়েকের একটা মেয়ে বোধ করি বাপের সঙ্গেই অনর্গল কথা বলতে বলতে পথ চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পুরনো কথায় ছেদ টেনে বলে উঠল, 'বাবা, তুমি যে একদিন বলেছিলে মালা কিনে দেবে!'

বলতে কি, বাবাব প্রতিশ্রুতি রক্ষার ইচ্ছের আভাসমাত্র দেখতে পাওয়া গেল না। মেয়েকে টানবার চেষ্টা করে বলে উঠলেন ভদ্রলোক, 'হবে হবে, তাড়া কি? চল চল।'

'না, আমি মালা নেব।'

মেয়েটা পাদমেকং ন গচ্ছামি-র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে বাবাকে টেনে ধরে রাখলো সেই দোকানের কাছে। এবং পিতা-কন্যার দ্রুত বাক্যালাপ চললো। মেয়েব স্বরে অভিযোগ, বাপেব স্বরে প্রবোধ।

''তুমি কেবল বলো পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না! এই তো কত মালা!'

'দূব, ও মালা আবার ভাল নাকি? ও তো ফুটপাথের।'

'হোক ফুটপাথের, আমি ওই নীল মালাটা নেব।'

'আরে, ছি, ওই নীল মালাটা? এই তোর পছন্দ? নাঃ, তোর কোনো বুদ্ধি নেই—খুকু, এর থেকে অনেক ভাল ভাল মালা নিউ মার্কেটে পাওয়া যায়।'

বাপের এই প্রবোধ বাণীতে ভুলবে, খুকুটিকে এমন অবোধ বলে মনে হল না। এ যুগের সব খুকুর মতই যে সে প্রবলা, তা তার প্রতিবাদেই বোঝা গেল। স্বর তীব্র তীক্ষ্ণ উচ্চ।

'নিউ মার্কেটের মালা চাই না, আমি ওই নীল মালাটাই নেব।'

'নাঃ, তোকে নিয়ে দেখছি রাস্তায় বেরোবার জো নেই, এত ইয়ে! বেরোলেই কেবল 'এটা নেব, ওটা নেব।'

'বলি তো শুধু, তুমি দাও না কি? খালিতো বল, 'হবে হবে।' আমি ওই নীল মালাটা চাই।'

অগত্যাই ভদ্রলোককে মাথা ঝোঁকাতে হয়, 'কী হে, কত দাম এটার?······এ্যাঁ, কী বললে? তিন টাকা চার আনা? পাগল না কি! এযে গলাকাটা দর! আছে কি এতে? গোটাকতক কাঁচের গুলি, এই তো! ঠিক কত হবে বল!'

দোকানী আরো অনেকগুলি খদ্দেরের 'ম্যাও' সামলাচ্ছিল, মালাটা ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে সংক্ষেপে বললো, 'ওই ঠিক স্যার।' তারপর অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

ফুটপাথের দোকান বলে যে মালিক কিছু কম অহঙ্কারী তা নয়। কম হবেই বা কেন? খদ্দেরেব সংখ্যা তো আর কম নয়।

মশারির ফিতের জন্যে আর অপেক্ষা করা উচিত কি না ভাবছি, আবার ক্ষুদে মহিলাটির কণ্ঠ তীক্ষ্ণ বাঁশীর মত বেজে উঠল। 'বাবা, দোকানী যা বলছে দিযে দাওনা, তোমার তো কত টাকা আছে। ওই মালাটা আমার পছন্দ—

বাবা বোধ করি কত টাকার উল্লেখে ঈষৎ বিব্রত হয়ে বলে ওঠেন, টাকার জন্যে কি, ওটা কি এত ভাল? এই—এইটাতো বেশ, এই সাদাটা—'

'না! ওটা বিচ্ছিরি, ওটা ছাই পচা! আমি ওই নীল মালাটাই চাই।'

'কী মুস্কিল! নীলটা তোর এই লাল জামার সঙ্গে মানাবে? মোটেই না। অথচ শাদাটা দেখ! লালের ওপর······

'আঃ' বলছি শাদাটা বিচ্ছিরি! আমি কি রোজই লাল জামা পরবো'।

ভদ্রলোক বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বলেন, 'এই এক ফ্যাচাঙে মেয়ে হয়েছে! যা ধরবে তা করবে! আর দোকানীরাও একেবারে—ওহে বাপু দিয়ে দাও, এইটাই দিয়ে দাও! ওই শুধু তিন টাকা, চার আনা ফার আনা দেবনা।'

দোকানী মালাটারে আর একটু কাছে টেনে নিয়ে মদগর্ব চালে বলে, 'কমবেনা বাবু! একদর!'

'একদর! বললেই হল একদর! কী একেবারে সাহেব পাড়ার দোকান! তিন টাকা ছু'আনায় দেবে?'

দোকানী কান দেয় না।

দোকানী তখন অন্য একটি মহিলার সঙ্গে ঘোরতর বচসায় ব্যস্ত। মহিলাটি একগাছা স্টেন্‌লেস ষ্টীলের বালা তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রায় দিয়েছেন, 'এটা ভালো ষ্টীল নয়, দস্তা মেশানো। জল লাগলেই কালো হয়ে যাবে।'

দোকানী দৃপ্ত প্রতিবাদে ঘোষণা করছে, তার দোকানের জিনিসে ভেজাল নেই। আসল ষ্টীল।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম কোন অসতর্কতার অবসরে যুগ উল্টোমুখো হাঁটছে, খেয়ালও করছিনা আমরা। মেয়েরা দিব্যি স্বেচ্ছায় পরমানন্দে লোহার বালা হাতে পরছে, লোহার মল পায়ে গলাচ্ছে। এমনি করেই আমরা কোন ফাঁকে হয়তো রন্ধন-শিল্পকে পরিত্যাগ করে ফিরে যাব কাঁচা ফল মুলে, ফিরে যাব শিব ধর্ম থেকে জীব ধর্মে।

হঠাৎ যেন এই অন্যমনস্কতার সুযোগেই হুড়মুড়িয়ে ঝড় উঠল। উঠল একেবারে আচমকা।

বিশ্রী এলোমেলো সব কিছু তোলপাড়করা ঝড়। কখন যে আকাশে মেঘ জমেছিল, আর কখন যে বাতাস প্রস্তুত হয়েছিল তার

সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে, কে জানে। ঝড়টা এলো দিশেহারা করে তোলার মত।

পথের দোকানীরা সকলেই মালপত্র গুটিয়ে তাড়াতাড়ি রবাররুথের টুকরো চাপা দিতে থাকে, কারণ এ ঝড়ের পিছনে বৃষ্টি অনিবার্য। এ সন্ধ্যায় বিক্রির আশায় জলাঞ্জলি।

আমিও মশারির ফিতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দ্রুত পা চালাই বাসের রাস্তার অভিমুখে।

* * *

সবাই ছুটতে সুরু করেছে। ধূলোর ঝড় ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে।

মাঝে মাঝে ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে ছুটন্তদের এক একটা টুক্‌রো কথা বেজে উঠছে…'এই চোখ বুজে ছোট্‌, চোখে বালি ঢুকবে।' 'থাক থাক,—রাখো এখন জুতো কেনা—' 'এই পাজী ছেলে, একা দৌড়াচ্ছিস যে? হাত ধর আমার!'

আবার ঝড়ের গর্জন তাড়া দিচ্ছে তাদের। ক্রুদ্ধ তীব্র অভি-যোগের মত ভঙ্গী সে ঝড়ের।

হঠাৎ একেবারে পিছনে একটা শিশুকণ্ঠের ক্ষুব্ধ অভিযোগ যেন ওই ঝড়ের উপরেই আছড়ে পড়লো, 'মালাটা এমনি নিলে কেন বাবা?

অজ্ঞাতসারেই ফিরে তাকালাম, দেখলাম সেই পিতা-কন্যা।

ঝড়ে মেয়েটার চুল উড়ছে, ফ্রক উড়ছে, বাপের সঙ্গে তাল দিয়ে ছুটতে হাঁফিয়ে উঠছে, তবু গলার স্বর তীব্র তীক্ষ্ণ।

'ও বাবা, মালার দাম দিলে না?'

বাবার কানে যে এ অভিযোগ প্রবেশ করল, এমন মনে হলনা, তিনি অম্লান চিত্তে বলে উঠলেন, 'এইটুকু ছুটতেই হাঁফিয়ে পড়েছিস ? কী তবে তুই দৌড়ে ফার্ষ্ট হস খুকু ? আয় আয়, তাড়াতাড়ি আয়।'

মেয়েটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই আসে, কিন্তু নালিশটা ছাড়েনা, 'বাবা, মালাটা অমনি নিলে কেন ?'

বাবা কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে ব্যস্ত, 'এই খুকু, রাস্তার ওই লাল আলো গুলো হঠাৎ-হঠাৎ জ্বলে ওঠে কেন বল দেখি ? জানিস না তো ? জ্বলে ওঠে গাড়ীদের থামিয়ে ফেলার জন্যে'—।

'বাবা ঝড়ের মাঝ খানে মালাটা এমনি তুলে নিলে তুমি ?'

'আচ্ছা খুকু, কাল তোদের পরীক্ষা না ? কিসের পরীক্ষা ? 'তুইতো তাতে ফার্স্ট হবি—'

ঝড়ের শব্দ কমে আসছে, মানুষের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃই জয়ী হচ্ছে, 'বাবা, দোকানীকে না বলে মালা নিলে কেন' ?

বাবা যেন এতক্ষণে সচকিত হন।

যেন এতক্ষণে মেয়েব অভিযোগ তাব কানে পৌঁছয। সস্নেহ করুণায বলে ওঠেন, 'কি বলছিস ? দোকানীকে না বলে ? এই দেখ বোকা মেয়ের কথা, না বলে কি রে ? বললাম না ? যখন ঝড় উঠল—'

বড় বড় ফোঁটা নিয়ে বৃষ্টি দেখা দিল। বাসের দিকে ছুটতে সুরু করেছি, পিছন পিছন উড়ে আসছে সেই লাল ফ্রক।

'তুমি বাজে কথা বলছ—তুমি না বলে নিয়ে নিলে'—

বাবা এবার বিরক্ত হয়ে ধমক দেন, 'দেখ খুকু, বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ করিসনে। না বলে আবার নেওয়া যায় ? দোকানী কি তোর মামা যে আমায় অমনি দেবে ? চল না বাড়ি গিয়ে দেখবি কী সুন্দর।'

'আমি দেখবনা'—খুকু ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে, 'আমি চোখ বন্ধ করে থাকবো। তুমি পয়সা না দিয়ে নিয়েছ।'

বৃষ্টি জোরে এসে গেছে, প্রার্থিত বাসটি কখন আসে কে জানে, বাস স্টপের একটা সেডের নীচে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। পিছন পিছন লাল ফ্রকও এসেছে বাবার সঙ্গে। ভঙ্গী অধিকতর বিদ্রোহাত্মক।

আমি দাঁড়াচ্ছি—, তুমি ছুটে গিযে পযসা দিয়ে এস।'

এখন আর পথে ছুটতে ছুটতে কথা নয় যে, বাতাসে ভেসে যাবে। এখন কথা এতগুলো দাঁড়িয়ে পড়া কৌতূহলী মানুষের দৃষ্টির সামনে। ধৈর্যের বাঁধ আর কতক্ষণ থাকে? তারওতো একটা সীমা আছে? অনেকক্ষণ থেকেই ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছিলেন ভদ্রলোক, এবার ফেল্ করে বসলেন।

সহসাই মেয়েটার গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে চাপা গলায় গর্জন করে উঠলেন, 'খালি খালি এক কথা; বলছি দিয়েছি, তুই দেখতে পাসনি, তা' হচ্ছে না।

চড়টা বোধকরি একেবারেই অপ্রত্যাশিত, তাই মেয়েটা হঠাৎ যেন 'কাঠ' হয়ে গেল।

শুধু ক্রন্দন সংবরণের চেস্টাটুকু ধরা পড়তে লাগল পাতলা-ঠোঁট দুটোর কম্পনের মধ্যে। অতটুকু মেয়ের এই সংযমের ভঙ্গীটা আশ্চর্য?

না দেখতে পাওয়ার ভান করতে হয়, নচেৎ ভদ্রলোক অপদস্থ হন। তবু মেয়েটা তীব্র আকর্ষণে সমস্ত চেতনাকে টেনে রেখেছে ওর দিকে।

দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকদের মধ্যে দু একজন অস্ফুটে বলে উঠলেন 'আহা আহা বাচ্চা—'

অতএব মেয়ের বাপ ভদ্রলোককে অপ্রতিভ হতেই হয়। বকুনির পথ ছেড়ে তোয়াজের পথ ধরেন অতএব, 'এই দেখ, একটুতেই অমনি মেয়ের কান্না এসে গেল। এই না বলিস বীর হবি, যুদ্ধে যাবি। খালি খালি বাজে কথা বলছিস, আমার বুঝি রাগ হয় না? বলছি ঝড়ের সময় তাড়াতাড়ি পয়সা দিয়েছি, দেখতে পাসনি তুই। আর তুই কেবল—তা, যাই বলিস পছন্দ আছে তোর, নীলটাই ভাল। আমিতো বোকার মত শাদাটা নিতে বলছিলাম। তা নীল রং লালের ওপরও মানায়, এইতো দেখনা—'

নিজের মতবাদই খণ্ডন করেন ভদ্রলোক মেয়ের মন রাখতে। এবং বোধকরি চাকচিক্যে শুধু মেয়েমনকে জালে আবদ্ধ করে ফেলতেই পকেট থেকে মালাটা বার করে মেয়ের গলায় পরিয়ে দেন।

কিন্তু পর মুহূর্তেই একটা বিপর্যয় ঘটে গেল।

মেয়েটা দু হাতে প্রবল টান দিয়ে মালাটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দানা গুলো ছুড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিতে দিতে এতক্ষণের আটকে রাখা কান্নাটাকেও ছড়িয়ে দিল।

'চাইনা, চাইনা আমি মালা পরতে। আমি তো কিনে দিতে বলেছিলাম! তুমি কেননি, তুমি এমনি নিয়েছ! তুমি মিথ্যে কথা বলেছ! তুমি খারাপ হয়েছ! ······ ·· ·····'

প্রার্থিত বাসটা এসে পড়েছে; ছুটে গিয়ে উঠে পড়তে হয়। ছেড়ে দেয় গাড়ী, ছুটতে থাকে আকাশভাঙা বৃষ্টির মধ্যে। মাইলের পর মাইল······!

কিন্তু মেয়েটার সেই অভিযোগের আর্তনাদটা শোনা যাচ্ছে কেন? ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অথচ নিরুপায় অভিযোগ। আকাশটাই কি তবে বৃষ্টির মূর্তিতে পৃথিবীর উপর এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে ওই একই অভিযোগ নিয়ে?

সাংবাদিক

জরাসন্ধ

বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা। লড়াই বেধেছে দূর পশ্চিমে শাদা মানুষের দেশে। তার আগুন এসে লাগল পূর্ব দেশের কালো মানুষের গায়। রাতারাতি উধাও হল গৃহস্থের যেটা নিত্য প্রয়োজন, চাল-চিনি-কাপড়-কেরোসিন। ঠিক উধাও নয়, খোলা বাজার থেকে জড়ো হল গিয়ে কালো বাজারে। সাধারণ কালো মানুষ তার চাবির সন্ধান জানে না।

বনগাঁ স্কুলের কনিষ্ঠ মাস্টার গণেশ পাল। বয়সে নয়, বেতনে। মাস গেলে তিরিশটি টঙ্কা। মা, বৌ আর গুটিতিনেক ছেলে মেয়ে নিয়ে ওতেই কোন রকমে চলে যেত। এবার আর চলে না। আশে পাশে সকলেরই প্রায় সেই অবস্থা। সবাই ভাবছে, কী করা যায়। হঠাৎ শোনা গেল মিলিটারী আসছে। সর্বনাশ! এতদিন প্রাণ গেলেও মানটা ছিল। এবারে তাও বুঝি যায়।

দেখতে দেখতে ময়দানবের মন্ত্রবলে সারা মাঠ জুড়ে গড়ে উঠল পল্টনের পাকা ছাউনি। তৈরী হল পীচ্‌ঢালা রাস্তা। বড় বড় ট্রাকে করে দরকারী আর অদরকারী নানা পণ্যের সম্ভার এসে জড়ো হল ছোট্ট শহরের পথে ঘাটে। শুধু ভয় নয় কিঞ্চিৎ ভরসাও এল সেই সঙ্গে। যত ছিল বেকারের দল, তাস পিটে আর তামাক টেনে দিন কাটাত, অমেরিকান-কাট্ ট্রাউজারের উপর হাওয়াই সার্ট চড়িয়ে ভিড় করল আফিসে, দোকানে, ক্যান্টিনে। প্রত্যেকের পকেটে সদ্যছাপা চকচকে নোট। গণেশের দুজন ছোকরা সহকর্মীও মাস্টারি ছেড়ে জুটে গেল সেই দলে।

স্থানীয় ইউনিটের বড়বাবু ছিলেন গণেশের কোন দূর সম্পর্কের দূরতর আত্মীয়। সেই সূত্র ধরে একদিন সে ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাতজোড় করে বলল—যাহোক একটা চাকরি-টাকরি দিন, দাদা। ছেলেপিলে নিয়ে আর কতদিন উপোস করে থাকব।

—চাকরি কোথায়? ঠিকাদারি চান তো চেষ্টা করতে পারি।

সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

—মাল যোগাতে পারলে টাকার জন্যে আটকাবে না। দেখুন, এর মধ্যে কোন্‌টা কোন্‌টা দিতে পারেন আপনি। বলে একখানা টেণ্ডার ফর্ম এগিয়ে দিলেন গণেশের হাতে। গণেশ বুঝল, সুবিধা হল না। নিতান্ত অনিচ্ছাভরেই ফর্মখানা নিয়ে পকেটে রাখল। তারপর কী মনে করে দু'চারটা জিনিসের পাশে যাহোক একটা দর ফেলে দু'দিন পরে দিয়ে এল বড়বাবুর সেরেস্তায়। সাতদিন না যেতেই তার নামে এক সরকারী চিঠি এসে হাজির। পড়েই মনটা বিগড়ে গেল। বড়বাবুর কাছে গিয়ে সোজা বলে দিল, এ কাজ তার দ্বারা হবে না। দুনিয়ায় এত জিনিষ থাকতে তার ঘাড়ে চাপল কিনা 'Ten thousand brooms of one seer each!'

বড়বাবু বললেন, কি করবো, আপনার কপালে ঐ ঝাঁটা ছাড়া আর কিছুই যে উঠল না। না দিতে চান তো লিখে দিন, পারবো না। কম্যাণ্ডাণ্ট্ সাহেবকে অ্যাড্রেস করবেন।

একখানা কাগজ দিলেন ওর হাতে। গণেশ ঐখানে বসেই লিখল—

শ্রীল শ্রীযুক্ত কম্যাণ্ডাণ্ট সাহেব বাহাদুর বরাবরেষু—বহুসম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন, হুজুর বাহাদুরকে দশ হাজার ঝাঁটা দিবার জন্য অধীনের উপর যে আদেশ হইয়াছে, তাহা পালন করিতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম বিধায়, উক্ত গুরুভার হইতে তাহাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি—।

কাগজখানা রেখে চলে যাচ্ছিল। বড়বাবু ডেকে ফেরালেন, আপনার আপত্তিটা কিসে বলুন তো? লাভের অঙ্কটা একবার ভেবে দেখেছেন?

—না, মশাই, ওরকম লাভ চাই না। লোকে বলবে ঝাঁ্যাটাওয়ালা!

—বললই বা। ভটচায্যি বামুন, পেশা পুরুতগিরি, পাইখানার মগ যুগিয়ে লাল হয়ে গেল, খবর রাখেন?

কথাটা শুনে একটু যেন নরম হল গণেশ পাল। বলল, তাছাড়া কোথায় পাব অত নারকেলের শলা?

—সবটা তো নারকেলের নয়, আধাআধি কাগজের।

—কাগজের মানে?

—মানে, (গলা খাটো করলেন বড়বাবু) দিতে হবে না, শুধু কাগজে উল্লেখ থাকবে। অর্থাৎ আপনার 'বিল'-এ এবং আমাদের খাতায়।

গণেশ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল। বড়বাবু বললেন, মাস্টারি করছেন কদ্দিন?

—বছর দশেক।

—আজ্ঞে না; হিসেব করে দেখুন বারো বছর পেরিয়ে গেছে। তা না হলে এই সোজা কথাটা মাথায় ঢোকে না?

বলে, একটা কি নাম ধরে ডাকলেন। একজন কেরানী এসে দাঁড়াতেই গণেশকে বললেন, যান ওর সঙ্গে, সব বুঝিয়ে দেবে।

ব্যাপারটা বুঝবার পর গণেশ প্রথমটায় বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। হাজার হলেও মাস্টার মানুষ। কিন্তু গরজের কাছে বিবেক আর কতক্ষণ! অনশনের কাছে হার হল আদর্শের। ঐখানে বসেই এক-সেরি ওজনের দশ হাজার ঝাঁ্যাটার কনট্রাক্ট সই হয়ে গেল। ভিতরে

ভিতরে ব্যবস্থা হল, অর্ধেকের বেশী দিতে হবে না। পেমেণ্ট হবে পুরো মালের—অবিশ্যি ভুয়ো বিল্-এর মোটা বখরা বড়বাবুর। আর একটা সুবিধা পাওয়া গেল। ওজনের ব্যাপারে যথাসম্ভব মা গঙ্গার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

নৌকা গরুর গাড়ি আর লোকের মাথায় চড়ে যত রাজ্যের ঝ্যাটা এসে জড় হল গণেশের বৈঠকখানায়। ছেলেরা নাক সিটকায়, গিন্নী তো রেগেই আগুন—'পেট চালাতে না পার ভিক্ষে কর না বাপু! এসব অলক্ষুণে কাণ্ড তো বাপের বয়সেও শুনিনি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

পাড়া পড়শীরা কেউ বলে ঝাড়ুদার, কেউ বলে ঝ্যাটামাস্টার। কিন্তু গণেশ পালের ওসব কথা গায়ে মাখলে চলে না। নেমে যখন গেছে, এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

যে যাই বলুক, ঐ ঝ্যাটা থেকেই কপাল ফিরল। ঝ্যাটার পরে পেল ঝুড়ি, তার সঙ্গে এল ঝুড়িঝুড়ি করকরে নোটের তাড়া।

যুদ্ধ চিরস্থায়ী নয়। যেমন সহসা আসে তেমনি হঠাৎ চলে যায়। তার আগে মানুষের জীবনটাকে সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত দু'হাতে ঝাঁকানি দিয়ে ওলট-পালট করে রেখে যায়। কিন্তু একটানা ধ্বংসই মহাযুদ্ধের দান নয়, তার সঙ্গে এখানে ওখানে রেখে যায় বিপুল ঐশ্বর্য। মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। যার স্কন্ধে ছিলেন শনিঠাকুর তার গলায় ঝুলিয়ে দেয় লক্ষ্মীর বরমালা। লক্ষ্মীর বরপুত্রের ভাগ্য-স্থানে রেখে যায় শনির দৃষ্টি। কারো প্রাসাদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেয়, কাউকে আবার বসায় বলির আসন থেকে রাতারাতি প্রাসাদের চূড়ায় গণেশ পাল সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যমন্তদের একজন। যুদ্ধ থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই যখন ফিরে গেল যেখান থেকে এসেছিল তারও কয়েক মাইল পেছনে, অজ্ঞাত অন্ধকারে, গণেশ তখন সামনের লাইনে এগিয়ে গিয়ে সদর রাস্তায় বাড়ি তুলেছে তিনতলা। তার উপর একটি পাঁচ অঙ্কের বৃহৎ সংখ্যা বসে আছে ব্যাঙ্কের খাতায়, এবং নানা কারবারে যে অঙ্কটি খাটছে তার আকার আরো বড়ো।

বাইরে থেকে দেখতে অবশ্য গণেশ বিশেষ বদলায়নি। আধ-ময়লা ফতুয়ার ঝুলটা একটু বেড়েছে। পুরো নয়, হাফ-পাঞ্জাবি; ধুতির বহরটাও হাঁটু ছাড়িয়ে খানিকটা নীচে নেমেছে! বৈঠকখানায় সাবেকি আমলের জোড়া তক্তপোষ, তার উপর শীতল পাটি; একদিকে খানকয়েক চেয়ার; তেমন তেমন কেউ এলে সেগুলো অধিকার করেন। সবচেয়ে জমকালো ঘরের কোণে একটি কাঁচের আলমারি, তার মধ্যে দাঁড় করানো একখানি রূপো বাঁধানো ঝাঁটা। রোজ সন্ধ্যায় গণেশ নিজের হাতে সেখানে ধূপ-ধূনো দেয়। আলমারির মধ্যে ঐ বস্তুটির সযত্ন অবস্থান এবং এতটা খাতির সমাদর সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করলে, কপালে হাত ঠেকিয়ে জবাব দেয়—'আজ্ঞে ঐরূপেই মা লক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছেন।'

ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে। বাপের কাণ্ড দেখে লজ্জা পায়। বড় ছেলে তো কথাই কয় না। মেয়ে মাঝে মাঝে বলে, 'বাবা, ঝাঁটাটা সরিয়ে ফেল; সবাই হাসাহাসি করে।' গণেশ জিভ কেটে বলে, সর্বনাশ! বলিস কি তোরা! যার দৌলতে দুটো খাচ্ছিস পরছিস, তাকে হেলাফেলা করলে ধর্মে সইবে না।

মেয়ে রাগ করে চলে যায়।

টাকা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বাড়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাড়ে উমেদার আর দাবিদার। প্রথম দল নিয়ে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নেই। হাত জোড় করে থাকে, নরম সুরে কথা বলে, আড়ালে যাই বলুক, সামান্য কিছু পেলেই কৃতার্থ হবার ভাব দেখায়। দাবিদারের সুর সব সময়েই চড়া। লম্বা চওড়া ফিরিস্তি নিয়ে যখন তখন বাড়ি চড়াও করবে।

সে সব মেটাতে গেলে দুদিনেই ফতুর; আর না মেটালে কিংবা হাতটা একটু টান করলে শুধু মান নয়, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

শহরে বারোয়ারী পূজার আয়োজন চলছে। রাস্তার মোড়ে বড় বড় বিজ্ঞাপন—মধ্যমপাড়া সার্বজনীন শারদোৎসব। সভা ডেকে

সাড়ম্বরে গঠিত হয়েছে কমিটি। সভাপতি, উপসভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, বিশিষ্ট ও সাধারণ সদস্য—ছাপানো বই-এর তিনপাতা জোড়া শুধু তাদেরই নাম। প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম নামটি—শ্রীগণেশচন্দ্র পাল, পৃষ্ঠপোষক। মনে মনে খুশী হল গণেশ। সভাপতি একজন নামকরা উকিল। সদলবলে স্বয়ং এসেছেন চাঁদার খাতা নিয়ে। অনেক আদর, আপ্যায়ন খাতির যত্নের পর গণেশ হাফ-পাঞ্জাবির ডান পকেট থেকে সবিনয়ে এগিয়ে ধরল একখানা দশ টাকার নোট। সভাপতির চোখ উঠল কপালে। গর্জে উঠলেন, ভিক্ষে দিচ্ছেন নাকি পাল মশাই ?

—আজ্ঞে, তাহলে কত দিতে হবে ?

—এই দেখুন—খাতাটা বাড়িয়ে ধরলেন সভাপতি। প্রস্তাবিত চাঁদার অঙ্ক দু'শ টাকা। পৃষ্ঠপোষকের পৃষ্ঠদেশে যেন একখণ্ড থান ইট এসে পড়ল। আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে আমি সামান্য ব্যবসাদার।' বলে, বাঁ পকেট থেকে বের করল আর একখানা পাঁচ-টাকার নোট। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বেরিয়ে গেলেন সভাপতি, এবং 'দেখে নেবো' গোছের ভঙ্গি করে তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গের দল।

এমনি করে আর একদিন ফিরে গেল কাত্যায়নী থিয়েট্রিকাল পার্টির ম্যানেজার মাধব কয়াল। গণেশ তাদের জন্য বরাদ্দ করেছিল পাঁচসিকে। 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকের মধ্যম পাণ্ডব কয়াল তার ভয়াল দন্ত প্রদর্শন করে যে ক'টি কথা বলেছিল, সেটা যে ঠিক রঙ্গমঞ্চের অভিনয় নয়, বুঝতে পেরে গণেশ আরো চার আনা যোগ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা আর দাঁড়ায়নি।

মেয়েদের মাইনর স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্ মোহিনী দেবী একদিন দুটি ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ওর বৈঠকখানায় এসে হাজির। গণেশ ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল। কী করবে, কোথায় বসাবে ভেবে পায় না। বিশেষ চিন্তা হল, এতবড় মান্য অতিথি, না জানি কী দাবী নিয়ে এসেছেন তার বাড়িতে। একথা সেকথার পর তিনি নিজেই

সেটা ব্যক্ত করলেন। স্কুলটাকে কয়েকটা ক্লাস বাড়িয়ে হাই স্কুলে দাঁড় করাতে হবে। পাল মহাশয়ের মত মহদ্ব্যক্তির আনুকুল্য না পেলে—ইত্যাদি। গণেশ ওঁদের বসতে বলে অপ্রসন্নমুখে ভিতরে চলে গেল। লোহার সিন্দুক খুলে একখানা একশ টাকার নোট পকেটে নিয়ে ফিরে এল। দুহাতে করে মোহিনী দেবীর দিকে এগিয়ে ধরতেই তিনিও দুহাত পিছিয়ে গেলেন। সবিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, একি করছেন গণেশবাবু। আমাদের এষ্টিমেট্ দশ হাজার টাকা। তার অর্ধেকটা অন্ততঃ আপনার কাছ থেকে নেবো বলে এসেছিলাম। এখখুনি হাতে হাতে দিতে না পারেন, লিখে দিন—বলে খাতাটা বাড়িয়ে ধরলেন। গণেশ লজ্জা ও বিনয়ে গলে গিয়ে আভূমি নত হয়ে হাত জোড় করে বলল, আজ্ঞে আমি নগণ্য মানুষ, আপনার মত সম্মানীয় ব্যক্তির পরিহাসের যোগ্য নই।

এর পর থেকে পাড়ার ছেলেরা গণেশ পালের নামের আগে, পেছনে যে সব বিশেষণ যোগ করে প্রকাশ্যে প্রচার করতে লাগল, সেগুলো ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলে মানহানির দায়ে পড়তে হয়। সুতরাং অনুক্ত রাখা ছাড়া উপায় নেই।

বাইরের দাবি যত, ঘরের দাবি তার চেয়ে কম নয়। গৃহিণীর হাল-চাল বিশেষ না বাড়লেও ছেলেমেয়েরা এক একটি ছোটখাট রাজপুত্তুর ও রাজকন্যা। তবু কেউ খুশী নয়, বাপের উপর সকলেই অপ্রসন্ন। যত পাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী পাওনা, এই তাদের মনোভাব, এবং সেটা না পাওয়াতে ক্ষোভের অন্ত নেই।

এই নির্বান্ধব সংসারে একটি মাত্র সুহৃৎ ছিল গণেশ পালের। তার পিষতুতো শ্যালক ভুজঙ্গভূষণ। এখানকার বাসিন্দা নয়, স্থায়ী আস্তানা জেলা শহরে। মাঝে মাঝে আসে। কোলকাতার এক নামজাদা কাগজের রিপোর্টার। সেই সূত্রে আসতে হয়। দুজনে খুব জমে। বয়সের অমিল অনেকখানি—ছাপ্পান্ন এবং ছাব্বিশ।

কিন্তু হৃদয়ের মিল আছে। একবার এলে গণেশ এক সপ্তাহের আগে ছাড়তে চায় না।

এবার অনেকদিন পরে এসেছে ভুজঙ্গভূষণ। বৈঠকখানায় বসে গল্পসল্প হচ্ছিল। গণেশের হাতে একখানা দুদিন আগেকার খবরের কাগজ। তাতে বেরিয়েছে, ফিলাডেলফিয়া না কোন্ দেশে একটি স্ত্রীলোক একসঙ্গে পাঁচটি সন্তান প্রসব করেছে; কোনটিই বেঁচে নেই। তার নিচেই আছে "এই মহকুমার কোন্ এক গ্রামে শিলাবৃষ্টির সহিত প্রচুর মৎস্যবৃষ্টি হইয়াছে। বহুলোক স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ধরিতে গেলেই কিন্তু মৎস্যগুলি তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিয়াছে।"

গণেশ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, দিনকাল কী রকম বদলে গেছে, দেখেছ? আগে স্বর্গ থেকে হত পুষ্পবৃষ্টি, এখন পড়ে মাছ। তাও ধরতে গেলে পালায়।

ভুজঙ্গ কথা বলল না, মুচকি হেসে মাথা নাড়াল। গণেশ সেদিক চেয়ে বলল, আচ্ছা, কাগজে যা বেরোয় সবই কি সত্যি ঘটনা?

—কেমন করে বলি? সবই কি আমাদের সুবিধে মত ঘটে দাদা? কোনো কোনোটা ঘটাতে হয়।

—তার মানে, তোমরা বানাও। বলে, রহস্যভেদ করার ভঙ্গিতে হাসল গণেশ পাল। ভুজঙ্গ গম্ভীরভাবে বলল, সাহিত্য মাত্রেই সৃষ্টি, অর্থাৎ খানিকটা বানানো।

—তোমরা তো আর সাহিত্যিক নও, রিপোর্টার। যা ঘটে তার হুবহু রিপোর্ট দেওয়াই তোমাদের কাজ।

.নিজের সম্বন্ধে 'রিপোর্টার' কথাটা ভুজঙ্গর বড়ই অপছন্দ। বলল, আমরা রিপোর্টার নই, বলতে পারেন সাংবাদিক। আমরা যা লিখি সেও সাহিত্য। সংবাদ-সাহিত্য।

আর একটু পরিস্কার করে বলল, অনেকে মনে করে নিছক ফ্যাক্ট্ নিয়ে আমাদের কারবার। ভুল ধারণা। আমাদের লক্ষ্য

ফ্যাক্ট্ নয়, ট্রুথ্; তথ্য নয়, সত্য। ঘটনা তো কতই ঘটে। তার সবটাই সত্য নয়। সত্য হচ্ছে তার সরস ও সুন্দর রূপ। Truth is beauty—বলেছেন Keats, পড়েননি? এক সময়ে তো মাস্টারি করতেন।

জীবনের ঐ মাস্টারি অধ্যায়ের উল্লেখটা গণেশর বিশেষ পছন্দ নয়। তাই অন্য কথা পাড়ল,—এবার কিছুদিন আছ তো?

—থাকতেই হবে। ভোটের ব্যাপারটা না মেটা পর্যন্ত যেতে পারছি কৈ? রোজ এক কলাম করে খবর পাঠাতে হচ্ছে।

কিছুদিন আগে থেকেই শহরে ভোটযুদ্ধ শুরু হয়েছে। রোজ সন্ধ্যায় একটা না একটা মাঠ এ-পক্ষের কিংবা ও-পক্ষের গরম গরম বক্তৃতায় সরগরম। এদের মুখে ওদের কুৎসা, ওদের মুখে এদের শ্রাদ্ধ। শুধু ভোট যুদ্ধ নয়, ভোটরঙ্গ। সাধারণ মানুষের দুদিকেই লাভ। বিনা পয়সার আমোদ। গণেশ এ সব ব্যাপারে উৎসাহী নয়। রাস্তার বড় বড় প্লাকার্ডগুলো নজরে না পড়ে পারে না। শোভাযাত্রীর ধাক্কাও এড়াবার উপায় নেই। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। সভাসমিতির গণ্ডগোলে গিয়ে দাঁড়ানো, কিংবা কার নামে কে কি বলচে, কান পাতা—ও-সব তার ধাতে নেই।

ভুজঙ্গ বলল, আজ মস্ত বড় মিটিং আছে কালীবাড়ির মাঠে। যাবেন নাকি?

—না বাপু, আমার দোকান আছে।

—আহা, দোকান তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। চলুন না, শুনে আসি কী বলে জগৎনারায়ণ।

আইনসভার নির্বাচনে একদিকে দাঁড়িয়েছেন জেলফেরত দেশ-সেবক জগৎনারায়ণ রায়। আর একদিকে জবরদস্ত জমিদার রায়-বাহাদুর শিবেশ চৌধুরী। দুজনেরই প্রায় সমান প্রভাব। কেউ বুঝতে পারছে না কে জিতবে, কে হারবে। তবে জগৎনারায়ণের

সমর্থক দলটাই বোধহয় কিছু বড়। হাজার হলেও দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার। তার একটা আলাদা মর্যাদা আছে। ভুজঙ্গ একরকম জোর করেই ভগ্নীপতিকে ধরে নিয়ে গেল।

বিরাট সভামণ্ডপ। একদিকের ধার ঘেঁষে মঞ্চ। তার মাঝখানে আপাদমস্তক খদ্দরশোভিত জগৎনারায়ণ বসে আছেন। দু'পাশে ঘিরে আছেন গণ্যমান্য ভক্তের দল। মঞ্চের সামনে কয়েক লাইন চেয়ার, বিশিষ্ট শ্রোতাদের জন্যে। আশেপাশে ও পিছনে সতরঞ্চি। ঠাসাঠাসি লোক ; কোথাও এক তিল জাযগা নেই। গণেশ বসেছে সামনের লাইনে, ঠিক পাশেই ভুজঙ্গ।

মঞ্চের দিকে চেয়ে প্রথম থেকেই গণেশের কী একটা সন্দেহ হচ্ছিল। এবারে আরো একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, ওহে ভুজঙ্গ, এ যে দেখছি আমাদের সেই জগা। ঐ নাকি তোমাদের জগৎনারায়ণ ?

অনেকেই কটমট করে তাকাল। ভুজঙ্গ ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ফিসফিস করে বলল, চুপ। গণেশ চাপা গলায অনেকটা নিজের মনেই গজরাতে লাগল, আরে রেখে দাও তোমার ইয়ে। ওর কীর্তি-কলাপ আমার তো আর অজানা নেই। থার্ড ক্লাসে দু' দু'বার ফেল করার পর স্কুলই ছেড়ে দিল। এদিকে বাড়িতে রোজ ঝগড়া। তারপর একদিন পিঠে পড়ল বাপের হাতের খড়ম। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া। শেষটায় নন্-কো-অপারেশনের হিড়িকে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে চলে গেল জেলে। পরের খবর আর জানতাম না। সেই হল তোমাদের নেতা !

ওদিক থেকে একটি ছোকরা বলে উঠল, 'গোলমাল করতে হলে উঠে যান এখানে থেকে।' অগত্যা চুপ করল গণেশ।

পর পর ভক্তদের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি-বন্দনার পর এক বোঝা ফুলের মালা গলা থেকে নামিয়ে জগৎনারায়ণ হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন।

হাততালিতে ফেটে পড়ল চারদিক। আধঘণ্টা জ্বালাময়ী বক্তৃতার আগুন ছড়িয়ে উপসংহারে এসে বললেন—

বন্ধুগণ, আমি একজন সামান্য দেশসেবক। শিবেশবাবুর মত না আছে অর্থ, না আছে খেতাব, না আছে সরকারী সার্টিফিকেটের জোর। আমার সম্বল শুধু একখানা ছোট্ট সার্টিফিকেট, যা আমি সর্বদা সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই। সেইটুকু আজ আপনাদের সামনে খুলে ধরছি। আপনারা দেখুন। দেখে যদি মনে করেন আমার যোগ্যতা আছে, অধিকার আছে দেশকে সেবা করবার, তাহলে ভোট দেবেন। আর যদি মনে করেন সে যোগ্যতা নেই, ভোট চাই না।

এই বলে জগৎনারায়ণ জনতার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। একজন ভক্ত এগিয়ে এসে জামাটা তুলে ধরল, অপর একজন টর্চ ফেলল পিঠের উপর। স্পষ্ট দেখা গেল একটা কাটা চিহ্ন। ভক্ত গম্ভীরস্বরে বলল, পুলিসের বুট, দেশসেবার পুরস্কার।

গণেশ আঁ্যাৎকে উঠল।—আঁ্যা, বলে কি? পুলিসের বুট! একেবারে রাতকে দিন! ওতো সেই লিচু গাছ থেকে—আমরাই ধরাধরি করে—

তুমুল হাততালিতে গণেশের বাকী কথাগুলো ডুবে গেল।

ভুজঙ্গ তার সাংবাদিক কর্তব্য শেষ করে যখন বাড়ি ফিরল, তখন রাত ন'টা। গণেশ বাইরের ঘরে বাতিটা কমিয়ে দিয়ে চুপচাপ তামাক টানছিল।

—'একি! অন্ধকারে বসে কি করছেন দাদা? তারপর মিটিং কেমন লাগল, বলুন।

হ্যারিকেনের আলোটা উস্‌কে দিয়ে ভুজঙ্গ বসল। গণেশ কোনো জবাব দিল না। আরো কিছুক্ষণ গড়গড়ার একটানা শব্দ। তারপর নলটা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল, কি ভাবছিলাম জানো? ভাবছিলাম, কী হল এইসব ব্যবসা বাণিজ্যের পেছনে ছুটে! কোন্ কাজে লাগল টাকা! শুধু ঘরে বাইরে শাপমুন্যি আর গালাগাল কুড়নোই সার।

তার চেয়ে জগার রাস্তা ধরলেই বোধহয় ভাল হত। কত নাম! কত মান! দেখলে একবার মালা আর হাততালির বহরটা?

ভুজঙ্গ চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে বলল, লোভ হচ্ছে নাকি আপনার? আহা! আগে বলেননি কেন? আপনাকেও নামিয়ে দেওয়া যেত ভোটযুদ্ধে।

—কী যে বল! আমি কী করতাম? কে চেনে আমাকে? কেই বা পুঁছতো? শুধু টাকা থাকলেই তো হয় না। আসল হল এই কপাল। তা না হলে সেই জগাটা—! বলতে বলতে নৈরাশ্য-ভারে ডুবে গেল বোধহয় সেই পুরনো দিনের স্মৃতির মধ্যে। ভুজঙ্গ আড়চোখে দেখল দু' একবার। তারপর একটু চিন্তিতমুখে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে ভিতরে চলে গেল।

দিন চার পাঁচ পরে সকাল বেলা যথারীতি ঝাঁটারূপিনী লক্ষ্মীর আলমারির সামনে ভক্তিভরে প্রণাম করে গণেশ কাজে বেরোবার উদ্যোগ করছে, বড় মেয়ে সবিতা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। হাতে একখানা খবরের কাগজ।

—বাবা! বাবা!

—কি রে!

—এ কী কাণ্ড করেছ তুমি!

গণেশ চমকে উঠল, কী কাণ্ড করলাম আবার!

—এত টাকা দিয়েছ, আর আমরা কিছু জানি না!

—কোথায়! কিসের টাকা?

—আবার লুকোনো হচ্ছে? এদিকে যে কাগজে বেরিয়ে গেছে! এই ছাখো না—বলে গড়গড় করে পড়ে গেল :—

"আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীগণেশ চন্দ্র পাল নিজ শহরে একটি মেয়েদের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।'

পড়া শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল একদল যুবক। সবিতা ভিতরে চলে গেল। যুবকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, গণেশ পাল কি—! বাকী সকলে গলা ফাটিয়ে যোগ করল—'জয়!' তারপর সবাই মিলে তাকে ঠেলে তুলল কাঁধের উপর। গণেশ চেঁচিয়ে উঠল—আরে, কর কি! কর কি! পড়ে মরবো যে।' সে কথা কানে তুলবার মত অবস্থা তাদের নয়।

আমেরিকান সৈন্যদের চলে যাবার সময় সস্তা দামে দু' একখানা জীপ কেউ কেউ কিনে রেখেছিল। বর্তমানে কোনোটাই চলে না। তারই একটা সংগ্রহ করে এনেছিল ছেলের দল। গণেশকে কাঁধে করে তার উপর নিয়ে তোলা হল। পাশে ও পিছনে রইলেন পাড়ার আরো ক'জন গণ্যমান্য ব্যাক্ত। তারপর শুরু হল প্রসেশন। বামপারে দড়ি বেঁধে সামনে থেকে একদল টানছে আর পিছন থেকে একদল ঠেলছে। লোকসংখ্যা বিজয়ার বিসর্জন শোভাযাত্রাকেও হার মানিয়েছে। মিছিল পরিচালনা করছে স্বয়ং মাধব কয়াল। সামনে থেকে দু'মিনিট অন্তর ভীম গর্জনে হাঁক দিচ্ছে—গণেশ পা··· ল কি···। পেছনের বিশাল জনতা তুমুল কণ্ঠে যোগ করছে—জয়!

গোটা শহরটা ঘুরিয়ে গণেশকে যখন তারা বাড়ীর সামনে এনে পৌছে দিল, তখন বেলা প্রায় চারটা। সমস্ত দিন স্নান নেই, পেটেও কিছু পড়েনি। মাথা দিয়ে আগুন উঠছে। তার উপরে ঘরে ঢুকেই চক্ষু স্থির। স্বয়ং এস. ডি. ও. বসে আছেন। সঙ্গে ক'জন বিশিষ্ট উকিল, মোক্তার এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারী। গণেশ ভাবল, নিশ্চয়ই কোনো ভয়ানক বিপদ দেখা দিয়েছে। আগন্তুকদের কথায় ও ব্যবহারে অবশ্য তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মহকুমার মালিক উঠে দাঁড়ালেন এবং হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন গণেশের দিকে। গণেশ কি করবে বুঝতে না পেরে শশব্যস্ত হয়ে প্রায় মাটির উপর নুয়ে পড়ে যুক্তকর কপালে ঠেকাল। এস. ডি. ও. বললেন, আপনাকে বড্ড ক্লান্ত

মনে হচ্ছে। এখন আর আটকাবো না। ভেতরে যান। চানটান সেরে কিছু মুখে দিয়ে নিন। তারপর আবার একটু বেরোতে হবে।

—কোথায় যেতে হবে? কোন রকমে বলে ফেলল গণেশ।

—এই তো কালীবাড়ির মাঠে। আমরা সবাই মিলে একটা সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছি।

—'তুমি আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছ।' যোগ করলেন প্রবীণ উকিল গুণধরবাবু, 'নাগবিকদের তরফ থেকে একখানা মানপত্র দিতে চাই।'

গণেশ মাথা চুলকে বলল, কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই মিস্টার পাল, বাধা দিলেন এস. ডি. ও.। এইটুকু কষ্ট স্বীকার আপনাকে করতেই হবে। আচ্ছা, আপনি রেডি হযে নিন। আমরা বরং ঘন্টাখানেক পরে এসে আপনাকে নিযে যাবো।

আর কোনো কথাবার্তার সুযোগ না দিযেই ওঁরা উঠে পড়লেন।

ভিতরে যেতেই ভুজঙ্গেব সঙ্গে দেখা। যেন মহা-সঙ্কটের দরিয়ায় একটা কূলের রেখা চোখে পড়েছে এমনি ভাবে গণেশ বলল, তুমি কখন এলে?

—বাঃ, আমি তো আগাগোড়া আপনার মিছিলেই ছিলাম। দেখতে পাননি?

—আমার কি আর মাথাব ঠিক ছিল যে দেখব? কিন্তু কী ব্যাপার বল তো?

—সব পরে হবে। আপনি চট কবে খেয়ে নিন।

শাঁন্তিপুরী কোঁচানো ধুতি স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন গৃহিণী। মেয়ে এনে দিল গরদের পাঞ্জাবি ও চাদর। ভুজঙ্গ এক শীট কাগজ হাতে দিয়ে বলল, এই নিন, আপনার ভাষণ। পকেটে রেখে দিন। সকলের বলা হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে উঠে পড়বেন। আমি ঠিক সামনেই থাকবো। কোনো ভয় নেই।

গণেশ আবার একটা কী বলতে যাচ্ছিল। ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—এস. ডি. ও. এসে গেছেন।

কালীবাড়ির অত বড় মাঠ। তিলধারণের জায়গা নেই। সুসজ্জিত মঞ্চের মাঝখানে শোভা পাচ্ছে গণেশ পাল। মালার ভারে ঘাড়ে গর্দানে একাকার। কোনো দিকে ফিরবার উপায় নেই। গলাটা যতদূর সম্ভব সোজা করে তুলে কোনো রকমে নাকটা বাঁচিয়ে রেখেছে। জগার উপর আর হিংসা নেই। তার চেয়েও বেশী মালা, বেশী হাততালি জুটেছে তার ভাগ্যে। কিন্তু আর ভাববার অবসর নেই। শুরু হল বক্তৃতা। এস. ডি. ও. বললেন দানবীর, গুণধরবাবু বললেন দাতাকর্ণ, শিবেশবাবু বললেন সবচেয়ে বড় দাতা হচ্ছেন তিনি, যাঁর ডান হাত দান করে কিন্তু বাঁ হাত জানতে পারে না। আমাদের গণেশ ভায়া আজ সেই আদর্শকে রূপ দিয়েছেন।

সকলের শেষে ভুজঙ্গের ইঙ্গিতে গণেশ জবাব দিতে উঠল, অর্থাৎ সেই কাগজের লেখাটা কোন রকমে পড়ে গেল। তার পর কান কাটানো হাততালি। সভার শেষে সেই এক বোঝা ফুলের মালা ছেলেরাই পৌঁছে দিল তার বাড়িতে।

দিন তিনেক পরে হেড্‌মিস্ট্রেস মোহিনী দেবী আরেকবার গণেশ পালের বৈঠকখানায় দেখা দিলেন। সঙ্গে স্কুল কমিটির সেক্রেটারী। কুশল প্রশ্নাদির পর সবিনয়ে জানালেন, এখন থেকে কাজ শুরু না করলে বর্ষার আগে শেষ করা যাবে না। সুতরাং চেক্‌টা পেলে সুবিধা হত।

ভুজঙ্গ বসে ছিল। গণেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে এগিয়ে এসে একটু কেশে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, মাপ করবেন। কোন্ চেকের কথা বলছেন আপনারা, জানতে পারি কি ?

—'কেন ?' কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন সেক্রেটারী, 'যে টাকাটা উনি স্কুলের জন্য দান করেছেন।'

—দান করেছেন।' চিঠিপত্র আছে কিছু ?

মোহিনী দেবী বললেন, চিঠিপত্রের কী দরকার? কে না জানে স্কুলকে উনি দশ হাজার টাকা দিয়েছেন? খবরের কাগজে বেরিয়েছে। মস্তবড় সভা করে ওঁকে আমরা মানপত্র দিয়েছি।

সবই ঠিক। সে সম্বন্ধে উনি কি বলেছেন, সেটা আপনারা শুনেছেন কি?

—শুনেছি বৈকি! ভাষণটি সুন্দর হয়েছিল।

—আচ্ছা, এক মিনিট। বলে, উঠে গিয়ে তার সাংবাদিক মার্কা ব্যাগের ভিতর থেকে একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে ভুজঙ্গ ফিরে এল তার আগেব জায়গায়, এবং কাগজটা হেড্‌মিস্ট্রেসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই আপনাদের সেই সভার রিপোর্ট। দেখুন, বক্তৃতাটা ঠিক আছে কিনা।

মোহিনী দেবী চিহ্নিত জায়গায় চোখ বুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ; এই কথাই তো বলেছিলেন, মনে হচ্ছে।

—আচ্ছা, তাহলে আব একবার শুনুন, আমি পড়ছি।

ভুজঙ্গ কাগজখানা নিয়ে বক্তৃতার রিপোর্টটা পড়ে গেল:—

"বন্ধুগণ, আপনাবা আজ আমাকে যে সম্মান দেখালেন, আমি তার একেবারেই যোগ্য নই। এমন কিছুই আমি করিনি, যার জন্যে আপনাদের এই সাধুবাদের ক্ষুদ্রতম অংশও আমি দাবি করতে পারি। আপনারা আমাকে দাতা বলে অভিনন্দিত করেছেন। শুনে লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়েছে। আপনারা প্রচার করেছেন, স্কুলের জন্য কত বড় দান, কত বড় ত্যাগস্বীকার করেছি আমি। আমি নগণ্য মানুষ। দান করি, সে সাধ্য কোথায়? সে সঙ্গতিও আমার নাই। আমার মত ক্ষুদ্রলোকের কি দানের স্পর্ধা সাজে? তবু নিতান্ত বিনা কারণে আপনারা আমাকে এই সভামঞ্চে ডেকে এনে বিপুল গৌরব দান করলেন, তার জন্য শতকোটী ধন্যবাদ।"

পড়া শেষ করে সেক্রেটারীর দিকে ফিরে ভুজঙ্গ বলল, আশা

করি এবার বুঝতে পেরেছেন যে আপনারা যা-ই বলে থাকুন, দানের কথা উনি বারবার অস্বীকার করে গেছেন।

"অস্বীকার করে গেছেন! বিহ্বল কণ্ঠে ভুজঙ্গের শেষের কথাগুলোই কেবল আউড়ে গেলেন সেক্রেটারী। হেড্‌মিস্ট্রেস্ বললেন, সে কী কথা! আমরা ভেবেছি, ও গুলো ওঁর বিনয়।

—আজ্ঞে না; কথাগুলো উনি 'লিটারেল সেন্‌স্'-এই বলেছেন। ব্যবসায়ী মানুষ; যা বলেন, স্পষ্টাপষ্টি।

ভুজঙ্গ যখন তার ভাষণের রিপোর্ট পড়ে শোনাচ্ছিল, সেই ফাঁকে গণেশ উঠে পড়েছিল। সেক্রেটারী বললেন, পাল মশাই কোথায় গেলেন? এসেছি যখন, ওঁর মুখ থেকেই শুনে যাই উনি কি বলেন।

—বেশ তো। তবে আমি যা বলছি, সব ওঁরই কথা। আমাকে জানাতে বলেছেন বলেই জানাচ্ছি।

হেড্‌মিস্ট্রেস, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনি ভাবে বললেন, কিন্তু খবরের কাগজে যে খবরটা বেরিয়েছিল, সেটাও কি মিথ্যা?

—'মিথ্যা বৈ কি?' হেসে বলল ভুজঙ্গ। 'কাগজে অমন কত কি বেরোয়। আজকের কাগজে ওর একটা প্রতিবাদ বেরিয়েছে, দেখেননি বুঝি?'

সেদিনকার কাগজটা খুলে দেখিয়ে দিল আগেকার খবরের কনট্রাডিকশন।

সেক্রেটারী এবং হেডমিস্ট্রেস্ চলে যেতেই গণেশ ঘরে ঢুকল। ভয়ে ভয়ে বলল, মামলা-টামলা করবে না তো হে?

—মামলা! হো হো করে হেসে উঠল ভুজঙ্গ। সে ফাঁক রাখলে তো?...এ আপনার বিজনেস নয়, দাদা, এর নাম জার্নালিজম্।

আমি

প্রাণতোষ ঘটক

আমি! কিন্তু আমি কে?

জ্ঞান হওযাব পর থেকে কতকাল আমি ছিলাম নেহাৎই একটা সামান্য মূল্যহীন চেতন-পদার্থ। অবশ্য কাল, সময, ক্ষণ, মুহূর্ত যে কি তাও আমি ঠিক জানিনা। এখন আমি বেশ বুঝতে পারি, আমি একটা কিছু অর্থাৎ আমি এমন একটা কিছু, যাব আকার আছে, সাড় আছে এবং সেইসঙ্গে কিঞ্চিৎ বোধশক্তিও আছে। এই শক্তিটুকু মাঝে মাঝে যেন মাথাব মধ্যে পাক খেতে থাকে। বাইরে বেরিযে আসতে চায। যেন এক বিস্ফোবক। তখন মনে হয, আমি যেন ফুরিয়ে গেলাম। ফাটা বেলুনেব মত অবস্থা হয আমাব।

চোখে আমার দৃষ্টি ছিল বটে, কিন্তু জানতাম না কি দেখতে হয। কাকে দেখা যায। কোথায আছে কোন্ দর্শনীয় বস্তু। যেমন আমার কান থাকতেও আমি জানি না শোনা কাকে বলে। পৃথিবীতে কত রকমেব শব্দ হয, ধ্বনি বাজে, আর্তনাদ ওঠে, স্বরগ্রাম সুর তোলে—কিছুই যেন আমার কর্ণকুহবে সাড়া জাগাতে পারে না। কখনও নিজেকে মনে হয় দৃষ্টিহীন অন্ধ। বদ্ধ বধির।

তবে বোধশক্তির সাহায্যে বুঝতে পারি, সকল কিছুর মধ্যেই আছে একটা ন্যাযসঙ্গত বোঝাপড়া। যুক্তির ভিত্তিতে তারা গড়ে উঠেছে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পাঁচিল টপকে উৎকর্ষতা পেয়েছে। ঈশপের গল্পের কয়েকটা সারার্থ আমার মনে রেখাপাত করে। কবে কোন্ জন্মে কার কাছে শুনেছি বা পাঠ্য বইয়ে পড়েছি, স্মৃতির ঝাঁপি হাতড়ে জানতে পারি না। সেই যে সেই ঈশপের উক্তি আজকে যেটা প্রবচনে রূপান্তরিত, সেই বাক্যটি বার বার মনে উদয়

হয়। ধীর এবং স্থির যারা শেষ পর্যন্ত তারাই দৌড়-প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। সেই কারণে আমি ধীরে ধীরে, স্থির মস্তিষ্কে, জ্ঞানসঞ্চয়ের চেষ্টা করছি। আমার বাইরে যে বহির্বিশ্ব রয়েছে, তাকে জানতে হবে, তার গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হবে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি যা যা শিখছি তা যেন আমার মনের খাতায় লিপিবদ্ধ থাকছে। যা শিখি তা আর ভুলি না। এখন আমার স্মরণশক্তি জন্ম নিয়েছে। শক্তিটা যেন বড় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাই এখন মাঝে-মিশেলে অনুভব করি, আমি এক চেতন-পদার্থ যে শ্বাস ফেলে, নিঃশ্বাস নেয়। যে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জল পান করে। যে ক্ষুধার উদ্রেকে খায় এটা সেটা। যে যুক্তির সন্ধান করে। কারণ খোজে। যে জানতে চায় একটা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে। দর্শনতত্ত্ব বলে প্রতি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হবেই হবে।

যদিও আজও আমি জানতে পারলাম না, আমি কে। অনেক জ্ঞাতব্য জানতে চাই বটে, শুধু জানতে পারি না, কে আমি? আমার অতি কষ্টে সঞ্চিত বাইরের জ্ঞান বলতে পারেনা আমার আসল পরিচয়টা।

আমি কে?

আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা বলে, বাইরের জগতে দু'টো মতবাদ প্রবলভাবে চলিত আছে। প্রথমটা নতুন। দ্বিতীয়টা পুরাতন। নতুন যেন পুরানোর পরে আধিপত্য চালিয়ে চলেছে। সবল, পুরুষোচিত, বীর্যবত্তা ও যৌবনসমৃদ্ধ যে, কালজীর্ণ, সিক্ত-শান্ত সশঙ্কিত ভীরুদের শাসিয়ে চলবে, এসব ত' জানা কথা।

যাদের কাছে আমি থাকি, তারা সংখ্যায় মাত্র দু'জন।

ওদের নাম আছে একেকটা। কিন্তু ওরা দু'জনেই বিপরীত প্রকৃতির। একজন বয়োবৃদ্ধ জবুথবু স্থানু। তার নাম বাবুজী। বলতে বাধা নেই, বাবুজীকে আমি ভীষণ পছন্দ করি। শ্রদ্ধা-ভক্তি

জানাই তাঁকে। কারণ ইনিই তিনি, যিনি আমাকে খেতে পরতে দেন। তাঁর করুণায় আমার ভরণপোষণ চলে.।

অন্যজনের নাম প্রেমসখী। সে যেন যৌবনের ভারে টলমল করছে। শুক্লাতিথির ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধবল রাতের উচ্ছ্বসিত সমুদ্র যেন ঐ নধর-গৌরবর্ণা প্রেমসখী। সে কথা বলে তীক্ষ্ণ স্বরে। তার কথা ধারালো, শানানো। কাটাকাটা কথা ক্ষণে ক্ষণে তার আয়ত কাজলকালো চোখ দু'টি থেকে হিংসার দৃষ্টি আগুন ছড়ায়। এত অসামান্য রূপ, তবুও তখন প্রেমসখীকে দেখায় যেন পাপী পাপী। তখন তাকে দেখলে ধারণা হবে, যা অন্যায় আর অসংযম তা যেন তার নখদর্পণে। প্রেমসখীর অধর সর্বক্ষণ তাম্বুল রঞ্জিত। হাতের সূক্ষ্ম নখরগুলি রাঙানো। পায়ে আলতার ঘনরেখা। কিন্তু প্রেমসখীর সিঁথিতে সিঁদুরের কোন চিহ্ন নেই। শুনেছি, সতী নারীদের কপালে সিঁথিতে সিঁদুরের আরক্ত রেখা থাকে।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি আমি, যখন বাবুজী আর প্রেমসখী কথা বলে পরস্পরে। আমি শুনতে পাই, ওদের দু'জনের মধ্যে যেন কলহ বিবাদ লেগেই আছে। ওদের সেইসব কটু বাক্যালাপ শুনতে বাধ্য হই আমি। কেন না, কানে কেউ কুলুপ এঁটে থাকতে পারে না। ওদের কথায় মনটা আমাব অতৃপ্তিতে যেন, বিষিয়ে ওঠে।

আমার ওপর বাবুজীর কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি আছে, এই যা রক্ষা। কাজে অকাজে বাবুজী কখনও কখনও ডাকে পাড়েন তাঁর কক্ষ থেকে। বাবুজী ডাকেন, কোন নামে নয়। আমার যেন একটা কোন নাম থাকতে নেই বা থাকতে পারে না। বাবুজী বলেন, —এই ছেলেটা, কোথায় গেলি?

যখন জোরালো সুরে ডাকেন, তখন অনুমানে বোঝা যায়, হয়তো এইবার কোন ফরমাস করবেন। যখন ডাকেন ধীর কণ্ঠে, তখন বুঝতে হবে প্রেমসখী নেই বাবুজীর কাছাকাছি। আমিও তখন পা টিপে টিপে গিয়ে দেখা দিই। বাবুজী প্রায় ফিসফিসিয়ে বলেন,

—এই ছেলেটা ! কোথায় ছিলি ? খাবারগুলো নিয়ে যা চুপিচুপি। চিলেকোঠায় চ'লে যা। খেয়ে আয়। দেখিস প্রেমসখী না দেখতে পায় ! রক্ষে থাকবে না দেখলে।

খাবারগুলো ! কথাটা শুনে আমার মনে মনে হাসি পায়। এই পৃথিবীতে এমন অনেক দরিদ্র দেশ আছে যেখানে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতিতে দেশের লোক অনাহারে অর্ধাহারে মরছে। আমাদের ভারতবর্ষেই আছে এমন কয়েকটা এলাকা যেখানে অনাবৃষ্টিতে ফসল ফলে না। ফাট-ধরা মাটিই সেখানে সার। যেন মরুভূমির সামিল।

রেকাবীটা চুপিসারে তুলে নিযে পালিয়ে আসি আমি। চিলেকোঠায উঠে যাই। রেকাবীতে থাকে ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য কিছু কিছু। কখনও পাই নানা ফলের টুকরো। কখনও মিষ্টান্ন। কখনও কখনও মাছের অংশ। কখনও খানিকটা মাংসের কোর্মা, কিম্বা খাবার। কখনও রুটি আর তরকারী। মিষ্টি আচার। দুধের সরভাজা।

খাইয়ে দাইযে বাবুজীকে যেন সোজা শক্ত রাখতে চায় প্রেমসখী। বাবুজীর মুখে রোচে না, তবুও নানা উপচারে রেকাবী সাজিয়ে দেয় সে। আহারে বিহারে মানুষের যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে, নিছক মিথ্যাটা বিশ্বাস করে প্রেমসখী।

যাই হোক, আমি এখন জানতে পেরেছি, সময় কাকে বলে। একটা সময আছে যখন আমি অনুভব করি আলো আর উত্তাপে। আর একটা সময আছে, যখন আমি স্রেফ একা থাকি, তখন চতুর্দিকে অন্ধকার দেখতে পাই। সময়ের কাজ এক থেকে আর একে উত্তীর্ণ হওয়া। সময় এগিয়ে নেয দিনকে। সময এনে দেয় রাত্রি।

আগেই বলেছি, প্রেমসখী দেখতে সুন্দরী হ'লে কি হবে, সে ভারী নিষ্ঠুর, নির্দয়। অনাস্বাদিত খাদ্য ফেলে দেবে জঞ্জালের স্তূপে, তবু আমাকে দেবে না। নিত্যদিন সে আমাকে খেতে দেবে বাসি রুটি, ঠাণ্ডা তরকারী, মাছের কাঁটা, মাংসের হাড়। ভয় পাই,

প্রতিবাদ জানাতে পারি না। হয়তো প্রেমসখী আমাকে তাড়িয়ে দেবে। তখন কোথায় মিলবে একটা আশ্রয়? নামহীন গোত্রহীন, অপরিচিতকে কে ঠাঁই দেয়!

এ বাড়ীতে আমি থাকি সিঁড়ির তলায় প্রায়ান্ধকার এক ফালি জায়গায়। সেখান থেকে শুনতে পাই ওদের কথা কাটাকাটি। শুনতে আমি চাই না, আমার কানে আসে দু'জনের সংলাপ। ভালবাসার কথা চুপি চুপি বলা যায়, কিন্তু ক্রোধের মুহূর্তে কেউ না চেঁচিয়ে পারে না। শুনতে পাই—

প্রেমসখী বলছে,—তুমি বুড়িয়ে গেলে আমার কি গতি হবে? আমার কি কোন সখ সাধ থাকতে নেই।

বাবুজী বলে,—গানের শেষ থাকে, নাটকের যবনিকা পড়ে, কাহিনীকার ইতি টানে, শুধু তোমারই ভোগের কোন শেষ নেই। তুমি জানো না কোথায় কখন থামতে হয়। শেষ আছে ব'লেই গান এত মধুর শোনায়। মৃত্যু আছে, তাইত জীবন এত মধুময়।

প্রেমসখী সুর তোলে পঞ্চমে,—বক্তৃতা থামাও, মধু কি আছে ছাই। মধু যে উবে গেছে।

বাবুজী বলেন,—মিথ্যা কথা কেন বল' প্রেমসখী? প্রতি মাসের শেষে যখন আমার ভূসম্পত্তির টাকাটা হাত পেতে নাও, তখন তোমাকে দেখলে কে বলবে যে মধু উবে গেছে।

ব্যঙ্গভরা তাচ্ছিলের হাসি ধরে প্রেমসখী। হাসতে হাসতে বলে, '—আমার ভাত-কাপড়ের ভার নিয়েছিলে তুমি। তবে টাকাটা কি অন্য কারও হাতে যাবে বলতে চাও?

বাবুজী বলে,—না। আমি তা বলতে চাই না। তবে কিনা দিবা-রাত্রি শুনতে আর ভাল লাগে না তোমার কাটা কাটা কথা। বার্ধক্য আসবে না, কেউ বলতে পারে? শরীরে বয়সের ছাপ পড়বেই।

প্রেমসখী বলে, সেদিন উকিলবাবুর কাছে শুনলাম তুমি নাকি উইল করছো ?

বাবুজি বলে,—ঠিকই শুনেছো। একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা না করলে সব যে ভেসে যাবে।

প্রেমসখী কাতর কণ্ঠে বলে,—উইলে আমার জন্যে কি থাকছে, কলা, না লবডঙ্কা ?

বাবুজী ক্ষোভের সুরে বলে,—তোমার জন্য রেখেছি জীবনস্বত্ব। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সবই তোমার থাকবে।

প্রেমসখীর কথায় অধৈর্য ফোটে। বলে,—তারপর ?

তারপর সেই আয়ে অনাথ গরীব ছেলেরা মানুষ হবে। ভরণপোষণ পাবে। লেখাপড়ার খরচ পাবে।

খিঁচিয়ে ওঠে প্রেমসখী। অধৈর্য প্রকাশ করে। বলে,—গরীব ছেলেরা ! ভরণপোষণ ! লেখাপড়ার খরচ ! টাকাগুলো বরবাদ হবে। তার মানে, জলে যাবে।

বাবুজী বলে,—বরবাদ হবে কেন ? জলেই বা যাবে কেন ? ছেলেরা যদি মানুষ হয়, দেশের কাজে লাগবে।

হতাশায় যেন ভেঙ্গে পড়ে প্রেমসখী। সুর নামিয়ে বলে,—আর আমার বোনের ছেলেগুলো পথে পথে ঘুরবে ? অদ্ভুত বিচার তোমার !

দুঃখের হাসি হাসে বাবুজী। বলে,—আর যাই হোক, তারা অনাথ নয়। তাদের অভিভাবক আছে। তাদের—

কথায় আর কর্ণপাত করে না প্রেমসখী। সশব্দ পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ির নীচের থেকে শুনতে পাই তার পদশব্দ। যেন গুম গুম মেঘ ডাকছে।

বুঝতে পারি, এবার আমার ডাক পড়বে।

নিজের কামরা থেকে সরবে ডাক দেয় প্রেমসখী। বলে,—এই পোড়ারমুখো ! হতচ্ছাড়া ! হতভাগা !

ভয়ে ভয়ে আমি গিয়ে দেখা দিই। দেখতে পাই প্রেমসখীর সুন্দর মুখখানিতে ঘৃণা ফুটে আছে। আমি ইতিপূর্বে জানতাম না, ঘৃণা কাকে বলে। আজকাল আমিও শিখেছি ঘৃণা করতে। পেমসখীকে দেখলে আমি ঘৃণা বোধ করি।

আমাকে দেখেই প্রেমসখী বললে,—কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ, লক্ষ্মীছাড়া ? খেয়ে ঘুমিয়ে বেশ দিন কাটছে তোর।

আমি আমতা আমতা করতে থাকি। বলি,—না। ঘুম নয়। আমি চেষ্টা করছি, যদি পড়তে পাবি। বর্ণপরিচয় পড়তে চেষ্টা করছি।

—যা যা। বিদেয় হয়ে যা আমার সম্মুখ থেকে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা এক্ষুনি। প্রেমসখীর কথাগুলো যেন ভর্ৎসনার মত শোনায়। আমি ঠাওবাতে পারি না, আমার অপরাধ কি। কোন্ দোষে দোষী আমি।

—বাইরে যে বৃষ্টি পড়ছে। আমি বললাম বিনম্র স্বরে। শুনে যদি দয়া হয় প্রেমসখীব।

—দু'চার ফোঁটা বৃষ্টিতে তুই এমন কিছু ম'রে যাবি না। জলে ভিজলে কেউ মরে না। যা, বেরো এক্ষুনি। কথা বলতে বলতে একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে প্রেমসখী। ফলভারে নত একটা গাছ, যেন ঝড়ে উপড়ে পড়ে।

বাইরে তখন অঝোরে জল ঝরছে। আমি ধীরে ধীরে চিলে-কোঠায় উঠে যাই। কেমন যেন কান্না আসে। বর্ষার ছোঁয়াচ লাগে হয়তো। বেদনার অশ্রু ঝরে আমার চোখ থেকে। তপ্ত জলের বিন্দু, গড়িয়ে পড়ে মুখে।

অন্ধকার লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোর উদয় হয়। রাত্রির পরেই আসে দিন। কিন্তু আজও আমি জানতে পারলাম না, আমি কে? আমি এখানে কোথা থেকে এসেছি। তবে আমি বেশ বুঝতে পারি, আমি দিন দিন যেন বল সঞ্চয় করছি। বাবুজী লুকিয়ে

আমাকে ভাল মন্দ খাবার দেয়। ফল, শব্জী, মাছ, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য। বলবৃদ্ধির সঙ্গে আমার বোধশক্তিও ক্রমে যেন বর্ধিত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ আমার বুদ্ধি খুলছে। প্রেমসখীকে প্রথম প্রথম যতটা ভয় করতাম, অধুনা ঠিক ততটা করি না। তবুও আমি সাবধানে থাকি। প্রেমসখীর কাছে ঘেষি না। দূরে দূরে থাকি। তার চোখের আড়ালে। দিনটা কেটে যায লুকিয়ে চুরিয়ে। রাতের বেলায় বুদ্ধি খোলে। সকল কিছুর অর্থ স্পষ্ট হয তখন। আমি আঁধার-কোণে নিজেকে গোপন রেখে দেখতে পাই, একটি হৃষ্টপুষ্ট জোযান খিড়কির পথ ধ'বে এসে নিঃশব্দ পাযে প্রেমসখীর ঘরে সেঁদিয়ে যায। প্রেমসখী তখন সাজেব শেষে, বাহাব-বিন্যাস সেরে মুখে তাম্বুল দিয়ে হাসি হাসি মুখে দেহ এলিয়ে শুযে থাকে আপন শয্যায। প্রেমসখীর আযত কাজলকালো চোখে ফুটে থাকে অধীর প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা। কি যাদুতে কে জানে, নিঠুর প্রেমসখী মুখে ফুটিয়ে তোলে মিষ্টি মিষ্টি মদালস চাহনি। দেখতে দেখতে ঘরের কপাট বন্ধ হয়ে যায়! ভেতর থেকে দুযারে অর্গল পড়ে।

কতক্ষণ সময় অতীত হয জানতে পারি না। বাবুজী ডাক পাড়েন, বলেন,—এই ছেলেটা! কোথায থাকিস? শীঘ্রী শুনে যা।

ডাক শুনে কেটে যায আমার তন্দ্রাচ্ছন্নতা। আমি গিয়ে দেখা দিই। বাবুজী ফিস ফিস সুরে বলে,—হ্যাঁরে, প্রেমসখী কোথায় রে? ঘরে না বাইরে?

কে যেন অদৃশ্য থেকে আমাকে মিথ্যা বলায়। জানি, সত্য ঘটনা বললে আবার একটা কলহ বিবাদের সৃষ্টি হবে। হয়তো খণ্ডযুদ্ধ লেগে যাবে। মিথ্যা কথা বলতে আমি ঠিক অভ্যস্থ নই। আড়ষ্ট সুরে বলি,—ঘরেই আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলেন বাবুজী। বলেন,—খাবারের রেকাবীটা তুলে নিয়ে যা। কয়েক টুকরো মাংস আছে, খেয়ে ফেলবি। আমার

তো দাঁত নেই যে মাংস চিবিয়ে খাবো। দেখিস, প্রেমসখীর যেন ঘুমের কোন ব্যাঘাত না হয়।

মনে মনে হাসি আমি। বুড়ো বাবুজির জন্যে বুকে যেন ব্যথা পাই। পেমসখীর রুদ্ধদ্বারে কান পেতে শুনি, ঘরে তখন কথার গুঞ্জন, হাসির কুজন চলছে। কোনদিন হয়তো পেমসখী চাপা সুরে গান ধরে, আমায় দোলা দিয়ে যায় গো সে কোন্ ক্ষেপা হাওয়া। আমায় ছুলিয়ে দিয়ে যায়—

সেদিন তখন ভরা ছুপুর। আমি যেন অনুভব করলাম, আমি এখন অমিত শক্তির অধিকারী। আমার হাত ছু'টি যেন ভীষণ বলবান হয়ে উঠেছে। আজকাল আমি আর প্রেমসখীকে ততটা ডরাই না। বাবুজীর জন্যে আমার কষ্ট হয়। বৃদ্ধ লোকটাকে কেমন রাতের পর রাত ঠকিয়ে চলেছে পেমসখী! সারাক্ষণ আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে প্রেমসখী। আমাকে সে যেন পোষা কুকুর ঠাওরায়। দেখলেই দূর দূর করে।

ঘরে পালঙ্কে তখন সত্যিই ঘুমিয়ে আছে প্রেমসখী। হযতো সেই জোয়ানটার সঙ্গে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে।

আমার অজ্ঞাতে আমার শক্ত সমর্থ হাত ছুটো ধীরে ধীরে এগোতে থাকে ঘুমে অচেতন প্রেমসখীর দিকে। আমার ছুই বজ্রমুষ্টি। একবার মাত্র, একবার সজোরে আর্তনাদ তোলে প্রেমসখী। নারীদেহের কোমলতা যে কি এতদিনে জানতে পারি আমি।

জানতে পারি আরও ছু'টো কথা। একটার নাম 'মৃত্যু', অন্যটা 'শ্বাসরোধ'।

আমি শুধু জানতে পারি না, আমি কে?

বাংলার বাঘ ও আমি

কুমারেশ ঘোষ

অন্ধকার। রাত্রিও হইয়াছে।

এবং গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। কাজেই চারিদিকে বেশ নির্জন।

কলেজ স্কোয়ার দিয়া শর্টকাট করিতেছিলাম, হঠাৎ পেছন হইতে গর্জন শুনিলাম, হা-লু-ম!

বাঘের গর্জন!

কলিকাতার সহরে বাঘের গর্জন! চারিদিকে সভয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াও ঠিক মালুম হইল না—'হালুম' শব্দটা আসিল কোথা হইতে!

তবে নজর পড়িল একজন লম্বা-চওড়া পুরুষ, বিরাট গোঁফ, ধপধপ করিয়া আমারই দিকে আগাইয়া আসিতেছেন। সামনে আসিয়া মেঘ-গম্ভীর গলায় বলিলেন,

হ্যালো! তুমি কে?

যাক! 'হ্যালো'কে তবে ভুল করিয়া 'হালুম' শুনিয়াছিলাম।

নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলাম, আজ্ঞে এডিটার!

নাম?

নাম-ধাম সবই বলিলাম। এবং ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি?

আমি? সেই আশুতোষ মুখুজ্জে।

মানে? স্যার আশুতোষ? বাংলার বাঘ!

আশুতোষ সে কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, বহুক্ষণ ধরে সেনেট হলটা খুঁজে বেড়াচ্ছি, দেখছি না তো! ওটা তো এই স্কোয়ারের পশ্চিম দিকেই ছিল! আমার দিক-ভুল হয়ে গেল নাকি?

ভঁয়ে ভয়ে বলিলাম, আজ্ঞে না স্যার। সেনেট হল ভেঙে ফেলে ঐ দেখুন কত বড় বাড়ি হয়েছে।

শুনিয়া বাংলার বাঘ ফাটিয়া পড়িলেন: কী? আমার মন্দির ভেঙে ঐ দেয়াশালাই বাক্স তৈরী হয়েছে! এত দূর স্পর্ধা! আবার আমার জন্মশতবার্ষিকী ক'বে 'হায় আশুতোষ, হৈ আশুতোষ' করাও হ'লো।

আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম, তবে ভারত সরকার আপনার ছবি দিয়ে যে ডাক-টিকিট বার করেছেন, তাতে কিন্তু সেনেট হলের ছবি ছিল।

আশুতোষ আবার গর্জন করিলেন, বলি, ন্যাকামো হচ্ছে ছোকরা! জুতো মেরে গরু দান!—হঠাৎ ঘুসি বাগাইয়া বলিলেন, মারবো নাকে এক ঘুসি, নাক ফাটিয়ে দেবো। ভীম নাগের সন্দেশ-খাওয়া ভীম-হাতের ঘুসি খেতে চাও?—অন্ধকারেও দেখিলাম, রাগে তাঁহার গোঁফ জোড়া ফুলিতেছে।

তাড়াতাড়ি পৈতৃক নাক সরাইয়া ভাবিলাম, কী গেরো!

কী ভাবিয়া বলিলেন, স্কুল কলেজগুলো তো ঘুরে দেখলাম, সকাল বিকেল-রাত্রে বিদ্যের ব্যবসা চালানো হচ্ছে। সব ইউনাইটেড এডুকেশন কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। যত সব গোয়াল! শুধু বড় বড় বাড়ি তৈরী করলেই হ'লো। না? ও সব মুখোস। তাছাড়া আমি যে ইংরেজ আমলে জোর করে বাংলা ভাষার মান-সম্মান বাড়িয়ে গেলাম, তার কি করলে? স্বাধীন হ'য়েও আজ পর্যন্ত ভাষাটাকে ষ্টেট-ল্যাংগোয়েজ ক'রে চালু করতে পারলে না।.. তুমি না, কী বললে?

আজ্ঞে, এডিটার।

এডিটার, না, বাটার। ননীর পুতুল।—আশুতোষ গোঁফের ফাঁকে দাঁত খিঁচাইলেন: এক-এক কলমের খোঁচায় আমি কী না

করেছি। আর তোমরা? তোমরা বুক পকেটে দামী কলম গুঁজেই খুশি—

আমার কলমটির দিকে কটমট করিয়া তাকাইতেই সেটি বাঁ হাতে ঢাকিয়া ফেলিয়া বলিলাম, আচ্ছা স্যার। আমি এখন—

না। দাঁড়াও।—আবার বজ্র নির্ঘোষ: বলি, চৌরঙ্গীর মোড়ে তো আমার একটা মূর্তি দাঁড় করিয়েছো, সেটার মাথায় তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন—না, তিনশো চৌষট্টি দিন কাক এসে নোংরামি করে যায়—আর একদিন ফুল দিয়ে সাজিয়ে খুব বক্তৃতা করে ভাবো, আমি সব ভুলে যাবো। না?

আজ্ঞে—

থামো।—ধমক দিলেন আশুতোষ: আর জেনে রেখো, আমার জন্মদিনে যেন নাচ-গান দিয়ে আমার শ্রাদ্ধ না করা হয়।

এবার সাহস পাইলাম। বলিলাম: না, স্যার। আপনার ক্ষেত্রে সে রকম কোন স্কোপ নেই। সেটা রবিঠাকুরের বেলায়—

তোমাদের কোন বিশ্বাস নেই। বুঝলে ছোকরা? তোমরা সব পারো।—একটু ভাবিয়া বলিলেন: হুঁ, হয়তো আমার লেকচার বা প্রবন্ধগুলোকেই গীতিনাট্য ক'রে ষ্টেজে ধেই-ধেই ক'রে নাচতে থাকবে। কিন্তু খবর্দার।—হঠাৎ যেন চিন্তিত হইলেন: আর তোমাদেরই বা কী দোষ। সবতো মেরুদণ্ডহীন। হাইকোর্টের বাঘা বাঘা ব্যক্তিরাও যখন আজকাল জুজুর ভয়ে খাবি খাচ্ছেন, তখন তোমরা তো কোন ছার!

তা যা বলেছেন স্যার। আচ্ছা স্যার।—সরিয়া পড়িতেছিলাম।

শোনো।—আবার থামাইলেন: যদি দেখি আমার জন্মদিনের নাম ক'রে গীতি-নাট্য বা নাকি সুরে গান হ'চ্ছে, তবে কিন্তু সবায়ের চুলের মুঠি ধরে চরকি ঘুরিয়ে দেবো।—হঠাৎ বলিয়া বসিলেন: দেখি বিদ্যের দৌড়। ট্রানশ্লেট ইনটু ইংলিশ—'চুলের মুঠি ধরে চরকি ঘুরিয়ে দেবো'।

মাথা নীচু করিয়া ইংরাজীটা কি বলিব ভাবিতে গিয়া দেখি, স্যার আশুতোষের নিম্নাঙ্গটা নাই! বগলে ক্রাচার দিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া বলিলাম, একি স্যার। আপনি কোমর পর্যন্ত?

হ্যাঁরে।—আশুতোষের গলার স্বর যেন ভিজা। আমার কোমর ভেঙে দিয়েছিস তোরা। যা কার্জন পারেনি, তাই তোরা করলি। তবু হৃদয়টুকু আছে বুঝি এখনো তোদেরই জন্যে।

বলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কই দেখি তোদের বিদ্যের দৌড়। ট্রানস্লেট ইনটু—

বলচি স্যার।—বলিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে এক দৌড়।

এবং দৌড়াইতে গিয়া কলমটা পকেট হইতে ছিটকাইয়া আমারই জুতার তলায় পড়িয়া পটাস করিয়া থেৎলাইয়া গেল।

স্যার আশুতোষ ভীষণ শব্দে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাঘের হাসি!

হয়তো তাঁহার দুই চোখে জলও গড়াইতেছিল।

শাপে বর

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শারদ সন্ধ্যার শুক্লা সপ্তমীর সেদিন রবিবাসর। সান্ধ্য বৈঠকের পুরোধা হরিধন খুড়ো সকলের শ্রুতি আকর্ষণ ক'রে বললেন আজ আদি মহাকাব্য থেকে গল্প বলব। আমসত্ত্বের মত পাতলা তোষকের উপর শেতলপাটী মোড়া তক্তপোষের এক পাশে তাকিয়ায় হেলান দেওয়া পত্রাঞ্জনা পাত্রনবিশ বিস্ফারিত নেত্রে উৎসুখ হয়ে জিগ্যেস করলেন—ঋগ্বেদ থেকে বলবেন নাকি খুড়ো?'

খুড়ো বললেন "ঋগ্বেদ মহাকাব্য নয়, ওটি হিন্দু ধর্মের আদি গ্রন্থ। সর্বধর্মের তরজমা এর জালায় নিহিত। এ গল্পে শ্রীমন্ মহর্ষি কবি শ্রীশ্রীবাল্মীকি বিরচিত শ্রীশ্রীমহারামায়ণের কাহিনীর ছায়া পড়েছে। গল্পে ক্যাপশন্ হ'ল 'শাপে বর' বা 'বরে শাপ'।"

কুমার কদলীকান্ত কাঁড়ার এক হাতল-খসা পালিস-ওঠা ময়লা ছোপ ধরা কাঠের চেয়ার থেকে খাড়া হ'য়ে বলে উঠলেন 'বরে সাপ' না 'বরের ঘরে সাপ' মধ্য দিনেপাপী কমলালয়। অর্থাৎ বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী।'

খুড়ো একটু ধমকের বেশে বললেন—'কাত্যায়ন! তোমার পাণিনি ছাড়। ব্যাস-বাক্য রাখো। মহাভারত পুরাণের কথা নয়। এ কবিগুরু অর্থাৎ ভারতের কবিকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীমহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত মহারামায়ণের ছায়া অবলম্বনে প্রস্তুত।' এবার শোন—

—'বরে শাপের কাহিনী শোনা আছে সাবিত্রীর উপাখ্যানে। শাপবদ্ধ সত্যবানের আত্মা হস্তে মর্যাদাপূর্ণ চালে চলমান মহাকাল মহিষবাহন যমরাজের পশ্চাতে আলুলায়িতা-অলকা, রোদনশীলা, অনুসৃতা শ্রীমতি সাবিত্রী দেবীকে (ওরফে সাবি) প্রতিনিবৃত্ত করার

জন্য শ্রীশ্রীযমদেব শেষ বর দিলেন 'তুমি শত সন্তানের জননী হও।' জানি না সাবিত্রীর মনে শতবার গর্ভধারণ ও গর্ভযন্ত্রণার কথা, যমজ হ'লে পঞ্চাশবার, তেমুজ হ'লে চৌত্রিশবার, গর্ভিণী হ'বার কথা মনে হয়েছিল কিনা?

তখন অতি বুদ্ধিমতী সাবিত্রী দেবী মহিষারূঢ় যমরাজকে বুঝিয়ে অতি আকুতি জানিয়ে বললেন, 'প্রভু! আপনি তো আমায় শতপুত্রের মাতা হবার বর দিলেন। কিন্তু হে কালদেব! আমি স্বামীবিহনে কেমন ক'রে শত সন্তানবতী হ'ব? এতো আপনি আমাকে বরের বদলে শাপ দিলেন, প্রভু! অন্তত আপনার বরের বদলে আমার বরকে ফিরিয়ে দিন।'

যমরাজ পাল্টা প্রশ্ন ফেলছিলেন আর কি—'তোমার কি ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু জননী অম্বা অম্বিকা অম্বালিকার কাহিনী জানা নেই? স্থির-যৌবনা, দজ্জাল শাশুড়ী সত্যবতীর আদেশে কৃষ্ণকায় বেদজ্ঞ বেদব্যাস ভাসুরের সঙ্গে দুই ভাদ্রবধূর শুধু পুত্রার্থে সঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মোষের মত কালো ভাসুর ঠাকুরকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে একজন হ'লেন ফ্যাকাসে পাণ্ডুর, ফলে এক সন্তান হ'ল পাণ্ডুবর্ণ, নাম পাণ্ডু। আর একজন সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে দুচোখ বুজে ছিলেন ব'লে সন্তান হ'ল জন্মান্ধ,—ধৃতরাষ্ট্র।' মনে পড়ে গেল সত্যবানের কোন অগ্রজ অথবা অনুজ নেই। মনে হ'ল বলেন, 'আবার স্বয়ম্বর সভা ডাকো. আবার এক বীর্যবান সুন্দর রাজপুত্রের পানিগ্রহণ কর।' (কিন্তু ভাল বরের প্রাচীনকাল থেকেই আকাল, বর্তমানে চাল চিনির মতই।) আবার নতুন ক'রে সংসার পাতো। শত কেন, আরও দু-একটি বেশী সন্তানও জন্মাতে পারে, পরস্পরের কৃতিত্বের জোরে। যাই হোক, হঠাৎ যমিনীর কথা মনে পড়ায় কি আর করেন, সত্যবানের বুড়ো আঙ্গুলের ডগার মত আত্মা, সত্যবানের দেহে ফেরৎ দিতে হ'ল। সত্যবান ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন—'সাবিত্রী, সাবিত্রী, প্রিয়তমে! আমি কি নিদ্রিত ছিলাম?'

মুখ বেঁকিয়ে—'নিদ্রিত নও, চিরনিদ্রিত ছিলে।'—বলে, সাবিত্রী ছোট-রঙিন রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে গর্বথলি থেকে আরও ছোট আয়নাটি অধর সাধনের জন্য বার করতে ব্যস্ত হলেন।

কিন্তু মহারাজ দশরথ যখন রাডারের (Radar) সাহায্যে মৃগভ্রমে শব্দভেদী বাণ ছুঁড়লেন, সেই বাণ আঘাত করল মৃগকে নয়, কূপ থেকে জল উত্তোলনরত অন্ধমুনির একমাত্র পুত্র শ্রীমান সিন্ধুদেবকে। ভীত, সন্ত্রস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় সম্রাট দশরথ ঋষির মৃত পুত্রকে ঋষির সম্মুখে রেখে নিজ অপরাধ ও ত্রুটির কথা বিবৃত করে বিনয়াবনত শিরে শোকবিহ্বল কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ঋষি দম্পতিকে মোটা মাসোহারা দেবার প্রস্তাব করলেন। একটা বাচ্চা চাকরও পাঠিয়ে দেবেন, এরূপ ইঙ্গিতও করলেন।

পুত্রহারা অন্ধ ঋষি ক্রোধে অগ্নিশর্মা—কি মর্মান্তিক বেদনা! কি নিদারুণ অপমান! আমাকে রজতমুদ্রার লোভ দেখানো! উৎকোচে সর্ব কার্যসিদ্ধি করবেন দেশের রাজা! ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন—'যে নিদারুণ অন্তর্বেদনা পুত্রশোকে আমি ভোগ করছি, রাজা দশরথ! তুমি যেন সেই রকম পুত্রশোক পাও।'

"আচ্ছা খুড়ো, এটা ঠিক চণ্ডীদাসের রাধার মত কথা নয়—'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমনি হউক সে।"

গল্পের মাঝে শান্তিস্বরূপ শাসমল যেমনি যতি ফেলার চেষ্টা করেছে, তখনই খুড়ো দাবড়ি দিয়ে বলে উঠলেন—'এ চণ্ডে-রামীর নট-ঘট, কেলেঙ্কারি কেচ্ছা নয়। এ হ'ল 'শাপে বর'।'

খুড়ো আবার বলে চললেন—'মহারাজ দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষি সমীপে শাপের অসারত্ব বিবৃত করায় অন্ধ মুনি তিন রাজমহিষীর গর্ভে চারটি সন্তান হবার বিধি বর্ণনা করেন। এই হল 'শাপে বর' সিরিজের মূল সূত্রপাত। তার পরের ঘটনা সবারই জানা। অতএব বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

তৃণধ্বজ তালুকদার বলল—এ যে হিতোপদেশের বুলি·······

এ সব চণ্ডে-স্বামীর নটঘট, কেলেঙ্কারি, কেচ্ছা নয়

যাই হোক, দশরথকে পুত্রশোক ভোগ করতে হয়নি। হয়েছিল দুই পুত্রের বিরহ-বেদনা। আজকালকার দিনে এ এমন কিছু নয়, বিয়ে হলেই আজকালকার ছেলেরা অনেকেই স্ত্রী নিয়ে পৃথক-হয়ে থাকে ও বিদেশে কাজের বদলি চায়। আর হামেশাই তো বিদেশে ডাক্তারি, মাষ্টারি, ইঞ্জিনিযারিং-এর কাজে ছেলেমেয়েরা চলে যাচ্ছে।

কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় যখন রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস হ'ল সেটিও রামের পক্ষে 'শাপে বর'।

শিবদাস সমাদ্দার গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে ড্যাব্‌রা-ড্যাবরা চোখ বের ক'রে বলল—সে কি রকম খুড়ো?

সেই কথাই তো বলব। আসল গল্পই তো সেখানে। বলি শোন—

অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ। কোথাও তাল-তমাল-পিয়াল রসাল-হিন্তাল-কেতকী-কদম্ব-কুবগ-করবী-কপিত্থ - কাকেন্দু - কৌশিক বন। পাশে দেবদারু দ্রুমকে আলিঙ্গিত করে উঠেছে আইভি ও স্বর্ণলতিকা। মাঝে মাঝে এলা, গিরি কর্ণিকা, তুণ্ডুলী, তুম্বী ও তাম্বুলী ত্রিদর্শমযী লতামণ্ডপ। কোথাও মল্লিকা, মাধবী, মালতী লতা মালঞ্চ, কোথাও 'বন-বিভোলা, (বেগন ভেলিয়া) শাল্মলী শিরে সহযুক্তা। নির্ভযে ঘুরে বেড়ায় করভী, কোবাই, কালডার। কত বিচিত্রবর্ণী খগকুলের মধু কাকলী কূজনে দিগন্তের আকাশ বাতাস নিত্যমুখরিত। শিলাবকে সিক্ত বিস্তৃত সরোবর জলায়ুকা ও জলব্রহ্মী অধ্যুসিত। শৈলস্রোতস্বিনী অস্মর পথে কুলু-কুলু নাদে ধীরে বাহিতা! মলয় সমিরে সমৃদ্ধ নীপ-নামেরু-লোধ্র ফুল-রেণুর শীকরসিঞ্চিত সৌরভ। সেই সৌরভে লুব্ধ হয়ে উড়ে আসছে শিলীমুখ, মধুমারক ও দ্বিরেফ সংহতি।

এই হল তরুণ তরুণী মিলনের অতি সুপ্রশস্ত, সুন্দর মহাপুণ্যস্থান, যা অযোধ্যায় জনবহুল, কর্মব্যস্ত, কোলাহল-মুখর রাজপ্রাসাদে সম্ভব

নয়। যখন প্রধান দেহরক্ষক এসে ডাক্‌বে তখনই যেতে পারেন যুবরাজ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র অন্দরমহলে। অন্দরমহলের দরজা থেকে পাটুরাণী শ্রীশ্রীসীতাদেবীর খাস সহচরী এসে যখন নিয়ে যাবেন মাতৃমহল পার ক'রে বধূমহলের মধ্যে জানকীর আপন মহলে, তখনই সীতার সঙ্গে রামের মিলনের সম্ভাবনা। তার উপর মিলনের ক্ষণও স্বল্পস্থায়ী এবং রাজপ্রাসাদের প্রচলিত আইন-কানুন অনুযায়ী নিত্য নিয়মে বাঁধা। এর এক চুলও এধার ওধার হবার উপায় নেই। বর-কনেকে এমনি করে কঠোর লৌকিক বাঁধাধরা নিয়মের বশবর্তী হ'য়ে চলতে হ'লে অন্তর থেকে অন্তরে বিদ্রোহ জাগে। 'মদতি প্রচণ্ড ভূজদানন্দ'। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি এই বনবাসের আদেশ যেন প্রিয়ামিলনের সুবর্ণ সুযোগ, মধুযামিনী যাপনের অনবিচ্ছিন্ন অবকাশ, স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের সুপচুর সুযোগ। তাই একে 'শাপে-বর' বলেই মনে হয়।

অন্যভাবে বিচার করলেও দেখা যাবে, কৈকেয়ী ষড়যন্ত্র করে রামের বনবাস যদি না দিতেন, তা হ'লে যুবরাজ শ্রীমান ভরত দেখাতে পারতেন না, কত নিবিড় শ্রদ্ধা ও গভীর ভক্তি তাঁর অগ্রজের প্রতি। রামচন্দ্র পিতার সিংহাসন পেলে হতেন কেবল অযোধ্যার রাজা। আর্যাবর্তের কিয়দংশ মাত্র হত তাঁর অধীন। আসমুদ্র হিমাচল প্রশস্ত বিশাল জম্বুদ্বীপের মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র 'হিজ ম্যাজেষ্টি' হতেন না, বড় জোর 'হিজ এক্‌সলটেড হাইনেস' হতেন। তা' না হলে দাক্ষিণাত্যের বানর (বাহবা কি নর) সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় ও সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং বিজয় সম্ভব হ'ত না। দেখাতে পারতেন না দীর্ঘ পাথরের সেতু নির্মানের কৌশল। লঙ্কাদ্বীপ নিবাসী সুবর্ণ-খণির রক্ষকুলের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হত না, আর হত না সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতি তাঁর সুহৃদ; এই বৃহত্তর আর্যাবর্তের আর্যসভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় সভ্যতার এবং শবর সভ্যতার সংঘর্ষ ও সম্মিলিত সভ্যতার নবতম বৈজয়ন্তী রূপ।

তখন তৃণধ্বজ তালুকদার আর স্থির রাখতে না পেরে গম্ভীরভাবে বলল—'এ যে হিতোপদেশের কপচানো বুলি আউড়ে যাচ্ছে খুড়ো! গল্প কই?

'সবুরে মেওয়া ফলে। সব আছে। সবঁ আছে। 'শনৈঃ পন্থা'। তিনি আবার শুরু করলেন—

রামচন্দ্র চৌদ্দ বছর বনবাসের সময় নানা সৎ অসৎ বৃহৎ কার্য, নানা যুদ্ধ বিগ্রহ, কীর্তি-কলাপ, বীরত্ব-মহত্ব-দেবত্ব দেখাবার পর অযোধ্যার রাজা হবার জন্য পুষ্পক প্লেনে তাড়াতাড়ি ফিরছেন অযোধ্যায় (সাজাহানের মৃত্যু সংবাদে ভাব আওরংজীব-প্রমুখ পুত্র সকল দ্রুতগতিতে আগ্রার দিকে ধেয়ে আসার মত নয়?) ভরতের অতিভাতৃভক্তির সংবাদ শুনে।

পুষ্পক প্লেনে চড়ার আগে সমস্ত নাগ-খোক্কস, বাঁদর-বাঁদরী, হনুমান-জাম্ববান নানা শ্রেণীর বন্ধু-বান্ধব, সহচর, ইয়ার বক্সী, মিত্র, সখা, সুহৃদ, সাক্ষাৎ সকলকে অযোধ্যায় যাবার নিমন্ত্রণ করলেন রাম। সীতা—মেয়েদের জনে জনে বিশেষ করে 'সরমা' আর 'তারার' চিবুক ধ'রে, এমন কি পতিবিরাগিনী সদ্য-বিধবা মন্দোদরীর পিঠে হাত দিয়ে অযোধ্যায় যাবার কথা বারবার বললেন—'দিদি, —ভীষণদাকে বলেছি আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনি কিন্তু যাবেন।' [বিভীষণকে একটু নাম করে ভীষণ]

'তোর ভীষণদা-টা কে?'

ঐ তো আপনার উনি, ভীষণ-দা।'

'পাগলী! আমাকে কি তুই অশোক বনের বদলে অযোধ্যার আমবাগানে বন্দী করে রাখবি? আমাকে কেউ নেবে না, নিশ্চিন্তি থাক্। বললেন আসল সোনার (১৪ ক্যারেট-এর নয়) বহু স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা মোটা ভারী গলায় শ্রীমত্যা মন্দোদরী রাক্ষস্যা।

......রাজসিংহাসনে যখন শ্রীশ্রী১০০৮ শ্রীরামচন্দ্র বসবেন, তখন কোন্ ভাই কোন্ পোজে কি রকম বিরাট রঙিন পাখা, লঙ্কা থেকে

লুটে আনা সস্তা সোনার বাঁট দেওয়া চামরী গাইয়ের ল্যাজের বিশাল চামর নিয়ে দাঁড়াবেন, কেমন করে মুক্তোর ঝালর আঁটা ও সোনার বাঁটটি কোন্ এ্যাংগেল্ ক'রে ধরবেন, তারই মহড়া বেশ কিছুদিন চল্লো। মহাসমারোহে রাম রাজা হলেন (ঠিক রামরাজাতলার বৃহৎ প্রতিমার মত)।

পরে রাজকার্যের নেশা রামচন্দ্রকে এমন পেয়ে বসেছিল যে একান্ত পতিঅনুরাগিনী, সবদুঃখ-ভাগিনী সীতাকেও তার পছন্দ হচ্ছিল না। তাই সীতাকে দূরে সরাবার ফিকির আঁটছিলেন।

সুযোগও মিলে গেল। লোকে বলছে, রাক্ষসের অশোক-তরু ঘেরা বাগানবাড়ীতে জনকনন্দিনী বন্দী ছিলেন। তাঁকে কেমন ক'রে রঘুবংশের মহারাজাধিরানী করা যায় তাই নিয়ে নানা কানা-ঘুষো চলতে লাগলো। সখিদের প্ররোচনায় একদিন মেঝেতে খড়ি দিয়ে আঁকা রাবণের সমুদ্র সলিলে প্রতিবিম্বিত মূর্তির মত একটা অঙ্কনও রামের নয়নগোচর হ'ল। যাই হোক, প্রজানুরঞ্জনে সীতার বনবাস হ'ল এ তো সবারই জানা আছে। অতএব বিস্তরণ নিষ্প্রয়োজন।

এদিকে রামকে যশের নেশায় পেয়ে বসেছে। 'মহারাজ' আখ্যায় রামের মন পরিতৃপ্ত হচ্ছিল না। হবেন তিনি সম্রাট, সম্রাট হতে হ'লে অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়তে হবে ও সেই অশ্ব সমগ্র পৃথিবী ঘুরে আসার পর তাকে বলি দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হবে। সারা দুনিয়া ঘুরে অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বাল্মীকি বিরচিত মূল রামায়ণে নাই, তবে পরের রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত। যাই হোক ঘোড়া ফিরে এসেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত করে ঘোষণা করা হবে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের অশেষ গুণাবলীর ফিরিস্তি ও সারা বিশ্বের একচ্ছত্রপতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট বলে বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা। বলা হবে ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যসন্ধ, করুণাময়, বিপ্রপ্রিয় ধার্মিক ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বিশেষণ। দস্যু-কবি বাল্মীকি লব-কুশকে রামায়ণ গান শিখিয়েছেন, তাল

পেলেই সুরু করবেন। একটি রামের বন্দনার মোক্ষম শ্লোকও লিখে এনেছেন ডাকাতে কবি—

রামং লক্ষ্মণং পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্।

এই মহতী সভায় এর মহত্তর সাধু প্রস্তাব গ্রহণ করা হবো-হবো, এমন সময় অবগুণ্ঠনে আবরিতা হয়ে অর্ধ ডজন নারীর সুরম্য বাহিনী শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণ সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে সভাস্থ সজ্জন ও চিকের আড়ালে-বসা পুরনারীগণের উদ্দেশ্যে বিনম্র অভিবাদন জানিয়ে লাউড-স্পীকারের পরিবর্তে মহাবংশাবতংসের চোঙ্গায় মুখ দিয়ে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে ভাষণ দেবার জন্য প্রস্তুত।

সভা মণ্ডপে মহা কলগুঞ্জন। রামরাজ্যে সবাই সমান; তাম্রকূট লম্বোদর প্রস্তুতকারক (অর্থাৎ বিড়িওলা) পার্শ্বে আসীন সাথীকে বলছে 'বেড়ে মাইরিছে, মাইরি' পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে বলাবলি চলছে 'কে তুমি নিঃশঙ্কিনী রাজবর, এই মায়াবিনী রূপ ধরে গুরুত্বপূর্ণ সভা পণ্ড করতে এলে, জননী! দক্ষযজ্ঞের সতী নবরূপ ধ'রে আসেনি তো মা ঐ শোন কি বলছেন, জননী'—

—'হে স্বর্ণ সিংহাসনারূঢ়, প্রবল প্রতাপান্বিত, বিশ্ববিজেতা, রঘুকুল গৌরব-রবি, সুমহান সম্রাট ১০৮ শ্রীরামচন্দ্র! (স্বগতে—ছিঃ ভাসুরের নাম ক'রে ফেললাম্) সমবেত মানব, জননী, ভগিনী ও কন্যা বৃন্দ! হে কিস্কিন্ধ্যাদগুক, নীলগিরি, রামগিরি, (থুড়ি) স্বর্ণ-গিরি, উদয়গিরি, অস্তগিরি নিবাসিনী শাখামৃগীকুল ও তাঁদের পুরুষগণ! সভাস্থ আহুত অনাহুত, রবাহুত ও রূপাহুত, জ্ঞানী-গুণী মানী সুভদ্র অভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা আমার অন্তরের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আজ এই শুভ বাসরে এই বিবুধ বিজ্ঞানী -অলঙ্কৃত মহতী সভায় আমার ভাষণ শোনার জন্য এত উৎকণ্ঠিত ও

শান্ত দেখে জানাই, আবার জানাই আমার অন্তরের ধন্যবাদ। আজ আমি নিপীড়িতা, নির্যাতিতা, নিষ্ঠুর আঘাতে-জর্জরিতা সমগ্র নারী জাতির মুখপাত্রী হয়ে নারী হৃদয়ের নিদারুণ মর্মবেদনার অরুন্তুদ করুণ কাহিনী সমবেত জনতার সম্মুখে যৎসামান্য বিবৃত করতে চাই।—

'আমি শ্রীমতী উর্মিলা, যাকে একবার কবিগুরু বাল্মীকি অযোধ্যা থেকে বিদায় নেবার সময় রামের অনুগামী লক্ষ্মণের পথ চেয়ে দণ্ডায়মান দেখিয়েছিলেন প্রাসাদ-বাতায়নে। আমি সেই ইন্দ্রজিৎ-জিৎ লক্ষ্মণের ধর্মপত্নী, দুষ্টে বলে সূর্পনখার সতীন। আমি বৃহত্তর নারী সমাজের হয়ে এই প্রশ্নের উত্তর চাই যে এই রামরাজ্যে সীতা কিম্বা স্বর্ণসীতা ছাড়া আর কোন নারীর স্থান আছে কি নেই? অযোধ্যার অন্য কোন রাজবধূর বা কোন রাজমাতার কি কোন আত্মমর্যাদা নাই? তাদের স্বামীরা কি শুধু রামের সাক্রেদি আর দাসত্ব করবেন? তাদের স্ত্রীর প্রতি কি কোন কর্তব্য নেই? কে তাদের এই নিরবিচ্ছিন্ন অবহেলার ও, জি, এল (O. G. L) দিয়েছে? শুনেছি আসপুত্র লক্ষ্মণ (থুড়ি, নাম করে ফেললাম) চৌদ্দটি বছর অনিদ্রা, অনাহারে বরবপুটি সুস্থ ও পুষ্ট রেখে রাম-সীতার ঘরের দাওয়ায় বসে সারারাত পাহারা দিয়েছেন; আপনারা বলবেন অপরাজেয় বীরবর মেঘনাদকে বধ করার গৌরবের এই তো তপস্যা। আপনারা বলবেন এই তো পুরুষকার। মানলাম্। কিন্তু আজ, (রামের দিকে চেয়ে) আজও কেন সে আপনার ঘরের বাইরে? দেখতে পান না কেন লক্ষ্মণ ওখানে? বলতে পারেন না স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের কথা? মানা করতে পারেন না তাকে আপনাদের ঘরের এধার ও ধারে উঁকি ঝুঁকি মারতে? বাঁদরের সঙ্গে থেকে থেকে যত সব বাঁদুরে বুদ্ধি! বাঁদরের মত বেঁকে ঝালর ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন। কি শোভাই না হয়েছে! [এদিকে লক্ষ্মণ রেগে দাঁতে দাঁত ঘস্‌ছে............দেখবি হারাম.......রাত্রে তোর কি করি!] রাজসভা-,তাই। নইলে

কর্ণটি ধারণ ক'রে সামনে এনে দেখাতাম, সম্রাট রামচন্দ্রের গুণধর ভাইকে। ও কি শুধু শুধুই আপনার পাছে পাছে ঘুরে বেড়িয়েছে? কিছু কি আশা রাখব না? আমার মনেও কি বড় হবার কোন আশা নেই? আমি কি চিরজীবন ব্রহ্মচারিনী হয়ে জীবন কাটাব? [অস্টম এডওয়ার্ড যখন রাজা, মধ্যম ভ্রাতা জর্জের স্ত্রী রাণী হবার কি কোন আশা রাখতেন না?] যাক সে কথা, কিন্তু আমি নারী, আমার নারীত্বের সার্থকতা কোথায়? কেন আমি জননী হ'ব না? আমি নারীত্বের পূর্ণ দাবী চাই—আমি উর্ব্বশী নই। আমি রাজবধূ, আমি নারী, আমি স্ত্রী ....

যখন ভাষণ প্রায় রুচির মার্গ পর্যন্ত ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত হতে চলেছে তখন বালির প্রাক্তন মহিষী শ্রীমতী তারা দেবী, (বর্তমানে সুগ্রীবের ঘরনী) উর্মিলাকে একটু সরিয়ে বললেন—'বোন! আর এমন নগ্নভাবে নিজের কথা বলিসনে। ভদ্দর নোকেরা কি ভাববেন? দেখুন প্রজাগণ! এ কি মজার রাম-রাজত্ব! তুমি, একটু পাশে সরো, সম্রাটের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।'

এই বলে তু-হাতে কুর্ণিশ ক'রে বলতে শুরু করলেন। পেছনে লেজটী মেরুদণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধা, লেজের ডগার কেশগুচ্ছ খিঙ্গি ফিরিঙ্গি মেয়েদের সদ্য শাম্পু করা রুক্ষ চুলের গোছা পিগ্‌টেলের মত ঝুল ঝুল্ করছে।

—'আপনি মহান সম্রাট রামচন্দ্র, আপনি কি বলতে পারেন, কোন্ অপরাধে আমার প্রবল প্রতাপান্বিত স্বামী, যে-স্বামীর বীর্যের হুঙ্কারে শত রাবণ রসাতলে যায়, সেই মহাবলী বালিকে বৃক্ষের অন্তরাল থেকে অন্যায় যুদ্ধে সুগ্রীবের সঙ্গে মিতালী স্থাপনের জন্য হত্যা করেছেন? এ কোন্ ধর্ম, এ কোন্ নব্য ন্যায় আপনাকে এরূপ অতি বর্বরোচিত, ঘৃণিত, জঘন্য, নিন্দনীয় কার্যের অধিকার দিয়েছিল? আর লাউডস্পীকারের বদলে মহাবংশের চোঙ্গায় মুখ দিয়ে দিগমণ্ডল বিধূনিত ক'রে বলাচ্ছেন,—সত্য ও ন্যায়ের রামরাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হল, যার মূল ভিত্তি হল অন্যায়ের উপর, নির্বুদ্ধিতার উপর, আত্মস্বার্থের উপর। বালিকে সীতা হরণের কথা বললে সীতাকে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হতনা, না হ'ত লক্ষণকে এক রাত অজ্ঞান হয়ে বুকে শক্তিশেল সইতে, হনুমানকে গন্ধমাদন মাথায় বইতে, সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে। আপনাকে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে, হনুমান, জাম্বুবান এমন কি কাঠবেড়ালীকে খোসামোদ করতে। বালি একদিন রাবণের কানটি ধ'রে আপনার সামনে হাজির করতো, সীতাশুদ্ধ। আপনি এত ভীরু, এতই কাপুরুষ ও এত মিনমিনে যে আপনার নীতিতে বাঁধলো না যে অন্তরাল থেকে যুদ্ধ করা বীরোচিত নয়। বালির সঙ্গে আপনার কোন দ্বন্দ ছিলনা। আপনার হবু মিত্রের সঙ্গে দ্বন্দ ব'লে ছলে - বলে - কলে - কৌশলে তাকে হত্যা করতে হবে, এ কোন বিধি? আমি আপনাকে সাবধান করে দিলাম— আপনার জীবদ্দশায় আপনার এই রামরাজ্যের অবসান হবে, শুধু ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের স্বার্থের সিদ্ধিতে। এখনও সাবধান হবার সময় আছে, সাবধান হন।

'তারা দেবী, আপনি একটু সরে দাঁড়ান,' ব'লে পশ্চাতে অবগুণ্ঠিতা, বিশাল বপু, প্রশান্ত ললাট, মেদোন্নত পযোধরা, লঙ্কার সুলভ স্বর্ণের নানা অলঙ্কারাবৃত—মোটা রুলি, অনন্ত, বাহুটি, মানতাসা, কানে কুণ্ডল, গলায় হার, মফচেন, মুক্তোর শেলি, নিতম্বে মেখলা, চরণে সুবর্ণ শিঞ্জিণি, রাবণ-মহিষী রাক্ষসী মন্দোদরী বলতে শুরু করতে তারা দেবী চুপ, ক'রে লাফিয়ে ঊর্মিলার পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'মহারাজ রামচন্দ্র! এই কি রাম রাজত্বের ধর্ম ও ন্যায়ের বিধান ও ভব্যতা যে সদ্য পতিহীনাকে পতি-পুত্রহন্তার আনন্দ ও গৌরব দেখাতে নিমন্ত্রণ করা? তবে কেন বিভীষণ আমাকে ভুলিয়ে অযোধ্যায় নিয়ে এল, সতীনকে সঙ্গে নিয়ে, যদিও, রক্ষোকুল রমণীরা বৈধব্য মানে না, তাই আমি বিভীষণকে বরণ করেছি, সেও তো আপনারই

নির্দেশে। আপনি যে স্ত্রীর জন্য আমার কর্ব্বুর-গৌরব রবি স্বর্ণ লঙ্কাধিপতি দশানন রাবণকে বধ করলেন, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে তাকেই বনবাসে দিলেন। এই নারী জাতির উপর রামের ও রামরাজ্যের সুবিচার! অন্ততঃ এমন ব্যবস্থা নেই লঙ্কা-দ্বীপে, নেই আপনার বান্ধবপুরীতে অর্থাৎ হনুমানের দেশে। অনার্য, দ্রাবিড়, কর্ণাটি, কেরল, মর্দন, মালয় ও লঙ্কাদ্বীপের অসভ্য রাক্ষসদের সঙ্গে আপনার মিতালি। আর আপনি কিনা অসময়ে ব্রাহ্মণ সন্তানের অকাল মৃত্যুর জন্য শূদ্র শম্বুকের শিরচ্ছেদ করলেন। এ কি রকম রামরাজ্যের সুবিচার? এই যদি ব্যবস্থা হয মানবজাতির জীবের উপর, তাহ'লে এ রাজ্যের ভিত্তি জানবেন বালির উপর। টিক্‌বে না। টিক্‌তে পারে না। এ পাপপুরী থেকে আমায় নিয়ে চল বিভীষণ!' —ব'লে মন্দোদরী বাতাহতা ছিন্নমূল কদলীকাণ্ডের ন্যায় পতনোন্মুখ হলে সরমা এসে ধ'রে ফেললো আসন্ন সংজ্ঞাহীনা সতীনকে। বিভীষণ বিশেষ চঞ্চল।

'রক্ষোকুল রাজলক্ষ্মী মন্দোদরী রেখা হিতৈষিণী সীতার পরমা,' বিভীষণ-ঘরণী সরমা বলতে সুরু করলেন 'দিদি একটু শান্ত হ'ন। আমি কিছু নিবেদন করতে চাই মহামান্য রঘুকুল গৌরব-রবি-অনিন্দ্য সুন্দর সম্রাটের সম্মুখে—

'জয়তু শ্রীরামচন্দ্র, জয়তু শ্রীজানকীবল্লভ রাম!
রাবণে পাঠায়ে যবে কৃতান্ত পুরীতে; উদ্ধারিলা
পরম প্রাণের সখি জনক নন্দিনী বৈদেহীরে,
রঘুকুল চূড়ামণি রাঘবেন্দ্র, উদ্বেলিত তবে
সমুদ্র তরঙ্গোপম নবোচ্ছ্বাস। কিন্তু সুপ্ত ব্যথা
গুপ্ত ছিল বক্ষোতলে, সখিরে যে হেরিব না আর।
তব নিমন্ত্রণে উপস্থিত মোরা, মহান সম্রাট।

তোমারে হেরিতে নয়, দেখিবারে প্রাণসখি মোর
—অশোক কাননে যাঁর ছিনু মুই নিত্য সহচরী
অক্ষিভরা দৃষ্টি দিয়ে, অশ্রুভরা নেত্রে ক্ষণকাল।
কিন্তু হায়, একি বাদ সাধিলেন বিধি মোর ভালে।
কোথা সখি মোর কাঞ্চন-প্রতিমা সমা। এবে দেখি
হৈম মূর্তি তার। এ কোন বিচিত্র বিধি বিধাতার!
পত্নী বর্তমানে, ধাতু-মূর্তি দিয়ে ধর্ম যদি চলে
গলিত করুন তবে স্বর্ণ-মূর্তি জানকী সতীর.
বণ্টন করিয়া দিন লোভাতুর দ্বিজদল মাঝে।
হৃদয় কন্দর হতে অভ্যুদিত স্বতঃস্ফূর্ত বিধি
জানাবে বিবেক তারে অনুসরি' হ'ক ধর্মরাজ্য।
জননী জাতির প্রতি ঘোর অবিচার ন্যস্ত যদি
রামরাজ্য স্থাপনের ভিতে; অচিরে পড়িবে ধ্বসে
হেরো অই প্রাচীরের গায়ে অদৃষ্ট লিখন জ্বলে—
সময়ের অক্ষরেখা পরে শাশ্বত নহেকো কিছু
—'কোনো রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কিবা রামরাজ্য সেথা?'

দেখা গেল, ভাববিহ্বলা, সেন্টিমেন্টাল সাশ্রুলোচনা সরমা অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'অষ্টাদশ অক্ষরী' শেষ করতে না করতে কাছা-দেওয়া পাছাপেড়ে রক্তজবার মতো লাল টকটকে শাড়ীর বায়সাঙ্গের মতো কালো কুচকুচে পাড় খোঁপার ডগায় তুলে শ্রুতকীর্তি ও মাণ্ডবী এগিয়ে আসছেন, তাঁদের বিনতি পেশ করতে। দেখা গেল সভা মধ্যে অতি গুঞ্জন কোলাহলের আকার ধরতে চলেছে। একটা প্যাণ্ডেমোনিয়াম্ শুরু।

রামের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। সকলেই হতচকিত। কারো কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার যুক্তি বা শক্তি তাঁর আজ নেই। সব কথাই সত্য ও যথার্থ। এতে অসত্যের বিন্দু বিসর্গও নেই। রাম আজ অসহায়। বুদ্ধির দিক দিয়ে গুণ্ডা ভাইগুলোর ঘটে কিছু নেই।

তিনি গুরুকুলের হস্তে নর্মক্রীড়নক মাত্র। কোন শক্তি, কোন বল বা কোন ব্যক্তিত্ব নাই। ব্লাডপ্রেসারের বেগ শিরায় শিরায় বেড়ে চলেছে চড়-চড় ক'রে। হাই, কি লো-ব্লাডপ্রেসারে অশ্বিনীকুমার লিখে যান নি—তবে থ্রম্বসিসের সব লক্ষণ সুস্পষ্ট। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে দেখে রাম আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। মাথায় সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বাঁই বাঁই ক'রে ঘুরতে লাগলো। মনে মনে ভাবতে লাগলেন,—একি গৃহ-বিদ্রোহ! রামরাজ্যের হর্ম্যের ভিৎ নড়ছে। গোড়ায় গলদ কোথায় যেন র'য়ে গেছে। রাম সম্বিৎহারা হ'য়ে স্বর্ণ সিংহাসনে কাৎ হ'যে পড়ে গেলেন। পড়ার সময় অস্ফুট কণ্ঠে জড়িত স্বরে বললেন—

'রাজবধূরা, রাক্ষসী ও বাঁদরীদের সঙ্গে জোট পাকিয়েছেন, হা রাম! হা রাম! হা সীতা—।

রাজছত্র পাখা-চামর ফেলে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বিভীষণ এসে অচেতন রামকে পাতালি কোলে ক'রে আর হনুমান হামাগুড়ি দিয়ে সংজ্ঞাহীন রামতনুর তলায় চলতে চলতে অন্তঃপুরে নিয়ে এল। দস্যু কবি বাল্মীকির প্ররোচনায় লব-কুশের সঙ্গে কৌষেয়বসনা আশ্রম-তপস্বিনী দেবী সীতাও রাজসভায় গোপনে এসেছিলেন, আর চোখ মুছছিলেন। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। কমণ্ডলু হাতে সন্ন্যাসিনী বেশে কাষায় বস্ত্র পরিহিতা সীতা দেবী বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে কমণ্ডলু হ'তে জলের আছড়া আর্যপুত্রের মুখেচোখে দিতে দিতে বললেন্—

'ভিড় করবেন না। রাস্তা বন্ধ করবেন না। আপনারা দয়া ক'রে বাইরে অপেক্ষা করুন। আমিই আর্যপুত্রের শুশ্রূষার ভার নিচ্ছি। সরমা আর উর্মিলা সঙ্গে থাক্। অশ্বিনীকুমারদের স্মরণ করেছি, তাঁরা এলেন ব'লে।' তাঁরা এলে সম্রাট রাঘবের শারীরিক কুশলের বুলেটিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাজসভার বিজ্ঞাপন ফলকে সেঁটে দেওয়া হবে।

লক্ষণ তো হক্‌চকিয়ে, বেঁকে, কি বল্‌বে খুঁজে পাচ্ছে না,—এমন সময় সীতা দেবী একটু মুচকি হেসে বললেন—

'ঠাকুরপো, ভালো আছ? ঊর্মিকে একটুও শায়েস্তা করতে পারলে না? সময়ই বা কই? দুজনে আমার পিছনে লেগে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলে। তোমাদের বিপদের সময় কিন্তু হাজির আছি। ওঁর অজিনের লেপটা পাঠিয়ে দাওনা, ভাই।'

এমন পরিস্থিতিতে যে সীতা সীমন্তিনীর সঙ্গে মিলন হ'ল রামচন্দ্রের, এওকি 'শাপে বর' নয়?

—ঃ বিষয় নির্দেশিকা ঃ—

১।	রামায়ণ	—	মহর্ষি বাল্মীকি
২।	মহাভারত	—	কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
৩।	প্রাচীন সাহিত্য	—	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
৪।	মেঘনাদবধ কাব্য	—	মাইকেল মধুসূদন
৫।	সীতার বনবাস	—	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পূর্ব রেলওয়ের প্রথম যাত্রীবাহী এঞ্জিন "এক্সপ্রেস"

প্রথম যুগে বার্ন কোম্পানির প্রধান কারবার ছিল গৃহ-নির্মাণ এবং আসবাবপত্র তৈরি। ১৮২৯ সালে জন গ্রে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার পর থেকেই এঞ্জিনীয়ারিং, লোহাঢালাই, ঠিকাদারি ইত্যাদি নানা শাখায় প্রসারিত হয়ে বার্ন কোম্পানির কারবার বেশ ফলাও হয়ে ওঠে।
জন গ্রে-ই ভারতের প্রথম রেলওয়ে ঠিকাদার। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জন্য গ্রে একশো মাইল রেলপথ স্থাপন করেন। গ্রে-র এই কৃতিত্বে বার্ন কোম্পানির প্রচুর সুখ্যাতি এবং আর্থিক লাভ হয়। এই লভ্যাংশ দিয়েই হাওড়ায় একখণ্ড জমি কিনে একটি ঢালাই কারখানা স্থাপিত হয়। হাওড়ায় বার্ন কোম্পানির বর্তমান বিরাট কারখানার এই হল গোড়াপত্তন।
মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বার্ন কোম্পানির হাওড়ার এই কারখানায় তৈরী নানা জিনিসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ভারতীয় রেলওয়ের জন্য নির্মিত বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং সরঞ্জাম। ১৯০৪ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বার্ন কোম্পানি থেকে ৫৮০০০-এরও বেশী শতাধিক বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং ১১২০০০-এরও বেশী ক্রসিং ও সুইচ, দ্রুত প্রসারমান ভারতীয় রেলওয়েকে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, বড় বড় নদীর উপরে রেলওয়ে ব্রিজ তৈরি করার জন্য হাজার হাজার টন ইস্পাতের কাঠামো বার্ন কোম্পানির স্ট্রাকচারাল বিভাগ সরবরাহ করেছে।

শাখা: নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

"দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর
অভাব আরোগ্যের, আধমরা মানুষ
নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের
পত্তন সম্ভব নয়, তারা
কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর
সেই কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হ'য়ে
ওঠে। আমরা অনেক সময় দোষ
দেই বাহ্য কারণকে—কিন্তু
রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে
আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস ক'রে
গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের
ফাটল দিয়ে পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে
থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌছায়—"

—রবীন্দ্রনাথ